স্বাধীনতা

পঞ্চম খণ্ড

সম্মুখ সমরের যোদ্ধাদের অভিজ্ঞতা

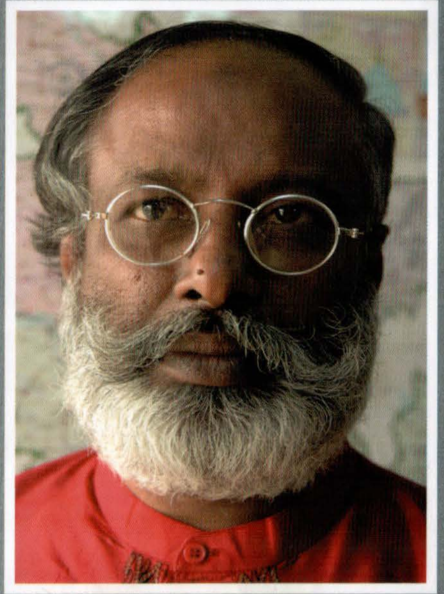
মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া
সম্পাদিত



স্বাধীনতা নামের ক্রমিক বইটি স্বাধীনতার লেখায় অর্থাৎ একাত্তরের রণাঙ্গনের লেখা নিয়ে সংকলিত। ভালো যোদ্ধারা, সাহসী সৈনিকরা যে ভালো লিখবেন তেমন কোনো কথা নেই। তবুও প্রয়াস অব্যাহত থাক, যদিও কাজটি মোটেও সহজ নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের আজ যে বয়স তাতে ভবিষ্যতে যে সৃজনশীলতা নিয়ে কলম চলবে তা হবার কথা না, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই। ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন সাধের লেখা ভিন্ন ভিন্ন মুক্তিযোদ্ধারা লিখছেন একই মোড়কে তারওতো স্বাদ ভিন্ন।

আমি নিজে মরণকে স্মরণ করে কষ্ট পাই না। কেউ চিরজীবী নয়। তবে বাংলাদেশে একদিন একজনও মুক্তিযোদ্ধা থাকবে না—কথাটা মনে আসলে মনটা কেমন করে। সে জন্যই মুক্তিযুদ্ধটা থেকে যাক সেটাই বাসনা।

জীবনে সব আশা সত্যি হয় না। স্বাধীনতা প্রকাশও হয়তো বেশিদিন স্থায়ী হবে না। তবুও স্বপ্ন দেখি।



জন্ম : ২৪ জুলাই ১৯৫২। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে যখন তিনি এইচএসসি পরীক্ষার্থী, তখনই ডাক এল মুক্তি সংগ্রামে। যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধের ২ নম্বর সেক্টরে এক তরুণ গণযোদ্ধা হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের দুই কিংবদন্তি মেজর খালেদ মোশাররফ ও ক্যাপ্টেন হায়দারের সহযোদ্ধা হিসেবে তাদের পাশে পাশে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের হিরন্ময় দিনগুলিতে। একাত্তরের বীরযোদ্ধাদের পাশাপাশি নিজেকে শাণিত করেছেন স্বদেশপ্রেমের এক প্রগাঢ় চেতনায়। বাহাত্তরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নির্বাচিত হলেও বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠায় বিলম্বের কারণে চুয়াত্তরের ৯ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং পচাত্তরের ১১ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এ কমিশনপ্রাপ্ত হন। ১৯৮৩ সালে বেইজিং ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার ইউনিভার্সিটি থেকে চীনা ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর ১২ জুলাই ১৯৯৬ সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়ার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন-এ যেমন উচ্চ শাঘার, একমাত্র পুত্র শিশু সাবিতের মৃত্যু তেমনি তার হৃদয়ের গভীরতম ক্ষত। তবুও এ ক্ষত নিয়ে, এই বিক্ষত সময়ে তিনি সবুজআদৃত এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন।

প্রথম প্রকাশ :
ফেব্রুয়ারি ২০১২

স্বাধীনতা (পঞ্চম খণ্ড)
মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রকাশক



সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ
এপার্টমেন্ট # ৪ বি, বাড়ি # ৪৪৮/এ
রোড # ৭ (পূর্ব), বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা ১২০৬
ফোন #০১৫৫২ ৪৪৯৪০৪, ০১৭১১ ৫৩৬৫০০
ই-মেইল : cblws1971 @ yahoo. com

কম্পোজ
তন্বী কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

একমাত্র পরিবেশক
অনন্যা
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
E-mail : anannyadhaka@gmail.com

U.K Distributor ❑ **Sangeeta Limited**, 22, Brick Lane, London
U.S.A Distributor ❑ **Muktadhara**, 37-69, 74 St., 2nd floor, Jackson Heights, N.Y 11372
Canada Distributor ❑ **Anyamela**, 300 Danforth Ave., Toronto (1st floor), Suite-202
Canada Distributor ❑ **ATN Mega Store**, 2970 Danforth Ave. Toronto

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

Shadhinata (volume-3) edited by Major Qamrul Hassan Bhuiyan and also Published by him on behalf of Centre for Bangladesh Liberation War Studies, (Ground Floor) House # 448/A, Road # 7 (East), Baridhara DOHS, Dhaka 1206. Cover Design by Dhrubo Ensh. Price Taka : 150.00 Only US # 8

ISBN 984 70008 0021 3

উৎসর্গ

সকল শহীদ এবং একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে
যাঁরা দেশপ্রেমের প্রদীপ্ত শিখা অম্লান রেখেছেন



সম্পাদকের কথা

সার্বিক অর্থে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখি যতটা বেশি হয়েছে ততটাই কম লেখালেখি হয়েছে আমাদের সম্মুখ সমর নিয়ে। এর কারণ নিয়ে আলোচনা করছি না। আমি শুধু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের ছেলেদের মাঠের অর্জনের কথা বলছি। স্বাধীনতার জন্য এ দেশের মানুষের সীমাহীন ত্যাগ ও প্রাণোৎসর্গের কথা বলছি। একাত্তরপূর্ব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এবং একাত্তরের রণাঙ্গনে এই মাটিবর্তী মানুষরাই ছিল প্রধান নিয়ামক। রণাঙ্গনে নিয়মিত বাহিনীর ব্যাটালিয়ানগুলিও ছিল নিম্নবর্তী সৈনিক নির্ভর এবং সে ইউনিটগুলির বৃহদাংশই ছিল ছ'সপ্তাহের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একাত্তরের ছাত্র, কৃষক, খেটেখাওয়া মানুষ। তারা অধিকাংশই তখনো কৈশোর পেরোয়নি। স্বাধীনতা ওদের কাছে একটি বাস্তব বিভাজক। বিভাজনের এই প্রক্রিয়া এবং ক্রমাগত সামাজিক শ্রেণীভেদ বৃদ্ধি তাদেরকে প্রান্তবর্তী করে ফেলেছে। লেখা আর কথায় মুক্তিযুদ্ধের এই ব্রাত্যজনদের উচ্চকিত প্রশংসা করা হলেও তার সঙ্গে শ্রদ্ধাবোধের দূরবর্তী কোনো সম্পর্ক নেই। 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান' আখ্যায়িত হয়ে তাদের তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধারা আগামী পনেরো বা বিশ বছরের মধ্যে এ পৃথিবী থেকে চলে যাবেন। যারা থাকবেন তারা বয়সের ভার কাঁধে নিয়ে বাঁচবেন বার্ধক্যজনিত রোগ বালাই নিয়ে। লেখালেখির সময় তখন আর তাদের থাকার সম্ভাবনা না থাকারই কথা।

প্রথাগত শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা যোদ্ধাদের সংখ্যাই ছিল অধিক। তারা লিখতে পারেননি। যারা হয়তো চেষ্টা করলে লিখতে পারতেন সেই সংখ্যালঘু শিক্ষিত যোদ্ধারা উদ্যোগী হননি। ফলে লেখা হয়েছে অতি সামান্য। ইতিহাসবেত্তা বা যাদের লিখিত উপস্থাপনা ভালো তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সেই অহংকারের কাহিনী 'কথ্য ইতিহাস' আকারে লিপিবদ্ধ করেননি। এ বিষয়ে সাহিত্য অঙ্গনের লোক যুদ্ধের মাঠে না থাকায় উঠে আসেনি আমাদের 'যুদ্ধ সাহিত্য'। ঢাকার পত্রিকা এবং ছাপা মাধ্যমগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের খ্যাতিমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেনি বলে তাদের যুদ্ধকাহিনীগুলো ছাপেনি। অথচ এই যুদ্ধকথা লিপিবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য।

'সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ' মুক্তিযোদ্ধাদের লেখা ছাপাবে— এই প্রত্যয় নিয়ে তাদের লেখা সংগ্রহ করছে। মুক্তিযোদ্ধারা যেন পরবর্তী প্রজন্ম দ্বারা এই দোষে দুষ্ট আখ্যায়িত না হন যে তারা তাদের যুদ্ধকথা রেখে যাননি। এই বই সেই প্রয়াসে প্রথম প্রকাশ। আশা করি *স্বাধীনতা* পর্যায়ক্রমিক প্রকাশ আমরা অব্যাহত রাখতে পারব।

ঢাকা
জানুয়ারি ২০০৭

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

দ্বিতীয় খণ্ডের কথা

যৌক্তিক কৈফিয়ত থাকলেও *স্বাধীনতার* (দ্বিতীয় খণ্ড) বের হবার বিলম্বের জন্য আমিই দায়ী। যে যোদ্ধাদের লেখার চল নেই তাদেরকে দিয়ে লেখানো কষ্টকর। লেখাগুলি সাহিত্যের বিচারকের দৃষ্টি দিয়ে না দেখতে অনুরোধ রইল। তবুও অব্যাহত থাক *স্বাধীনতার* প্রকাশ।

ঢাকা **মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া**
ফেব্রুয়ারি ২০১০

তৃতীয় খণ্ডের কথা

প্রচণ্ড অসুস্থতা নিয়ে প্রচণ্ড কষ্ট করে *স্বাধীনতা* (তৃতীয় খণ্ড) প্রকাশ করা হল। সে কারণেই কলেবর ছোট হয়ে গেছে। তবুও বের করা গেল সেখানেই স্বস্তি।
এ বইয়ে যে সকল সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নাম এসেছে তারা সবাই অবসরপ্রাপ্ত।

ঢাকা **মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া**
ফেব্রুয়ারি ২০১১

চতুর্থ খণ্ডের কথা

স্বাধীনতা চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ কেবলই ধারাবাহিকতা। তারপরও আনন্দদায়ক। মুক্তিযোদ্ধাদের কলম থেকে লেখা উঠে আসছে এও কম তুষ্টির কথা নয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বিনম্র অনুরোধ— আপনারা আপনাদের যুদ্ধের কাহিনী লিখে পাঠান, সহযোদ্ধাদেরও বলুন। পাঠকদের প্রতিও অনুরোধ পরিচিত মুক্তিযোদ্ধাদের এ বার্তাটুকু পৌঁছে দিতে

একাত্তরের ভারতীয় BSF এর Inspector General, West Bengal ছিলেন গোলক মজুমদার। তিনি মুক্তিযোদ্ধা নন, এ খণ্ডে তার লেখাটিও সমুখ সমর বিষয়ক নয়— প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকে নিয়ে। এ লেখাটি ছেপে যে অন্যায় করেছি আমার দৃঢ় বিশ্বাস পাঠক লেখাটি পড়ে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০১২

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

পঞ্চম খণ্ডের কথা

পঞ্চম খণ্ডের বিষয়বস্তুর ঢং একটু ব্যতিক্রমী। ১৯৮৫ সালের মধ্য এপ্রিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র মো. আলী নকী এবং মো. ইমামউদ্দিন এক মহৎ কাজ হাতে নেয় মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচিতি ও কীর্তি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে লিখিত আকারে রেখে যাওয়ার। তাদের সহযোগী হিসেবে যোগ দেয় আরো কিছু তরুণ। তাদের প্রতি সাহায্য ও সর্বাত্মক সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আসেন অনেক মুক্তিযোদ্ধা এবং সমাজকর্মী। 'অপারজেয় সংঘ'-র ব্যানারে কার্যক্রম শুরু হল। প্রশ্নমালা তৈরি করে বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধার কাছে পাঠান হল। এক দুইজন ব্যতিক্রম ছাড়া জবাব আসে না। হতোদ্যম অবস্থা। ক্রমেই বিপত্তির সংখ্যা ও পরিমাপ বাড়তে লাগল। এই দুই তরুণ সম্পাদক তারপরও হাল ছাড়ল না। *আমাদের সংগ্রাম চলবেই*- নামের বইটির প্রথম খণ্ড প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ সালে। প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয় ২৪শে জানুয়ারি ১৯৮৯ সালে। প্রথম পর্বটি প্রকাশক না পেয়ে তারা নিজেরাই প্রকাশ করে। দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশ করে জুয়েল ইন্টারন্যাশনাল লাইব্রেরি, ৩৪ বাংলাবাজার (দ্বিতীয় তলা), ঢাকা-১১০০। বর্তমানে বইগুলির প্রকাশ বন্ধ।

একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের বইয়ের প্রকাশক এবং সর্বপোরি একজন গবেষক হিসেবে বুঝতে পারি এ কত হতাশার। আমি হৃদয়ের সমস্ত আন্তরিকতা দিয়ে দুই সম্পাদক, সংগ্রাহক ও অন্যান্য সহযোগিদের অভিবাদন জানাতে চাই। কোনো দেশে মহৎ কাজ এবং ভাল উদ্যোগ যখন গতি হারিয়ে ফেলে তখন বুঝতে হবে জাতি লক্ষচ্যুত হচ্ছে।

'আমাদের সংগ্রাম চলবেই' এবং 'গ্রন্থ প্রসঙ্গে' শিরোনামে দুটি লেখা আছে বইয়ের শুরুতেই। লেখা দুটি ছেপে দিলাম এ বইয়ের শেষে যথাক্রমে পরিশিষ্ট ক ও খ হিসেবে। প্রশ্নোত্তর কাঠামোতে না রেখে

আমি মুক্তিযোদ্ধাদের বক্তব্য আকারে সম্পাদনা করেছি। তবে মূল ভাষ্য একই রইল। ক্রোড়পত্র দুটি মূল বই পড়ার পূর্বে পড়তে অনুরোধ রইল।

দুই সম্পাদক মো. আলী নকী এবং মো. ইমাদউদ্দিনকে এই অসামান্য কাজের জন্য আবারো ধন্যবাদ।

স্বাধীনতা সিরিজে গ্রন্থসমূহে সশস্ত্র বাহিনীর বাংলাদেশ এবং ভারতের যত অফিসার ও সৈনিকদের নাম এসেছে ও ভবিষ্যতে আসবে তারা সবাই অবসরপ্রাপ্ত।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০১২

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া



মোহাম্মাদ আব্দুল আজিজ, বীর প্রতীক

আমার জন্ম হয় চট্টগ্রামের দেওয়ানবাজার ১৯৫০ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর, রোজ শনিবার। পিতা আলহাজ্ব এম এ মজিদ একজন সরকারি চাকুরে ছিলেন (তখন Asst. Director, Directorate of Suppy and Inspection পদে ছিলেন ও ১৯৭৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন)। মাতা মরহুমা সুফিয়া মজিদ গৃহিণী এবং সমাজ সেবিকা ছিলেন। তিনি আপওয়ার (Apwa-All Pakistan Women's Association) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা, ধানমণ্ডী মহিলা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (যার কার্যক্রম ছিল ধর্মীয় বিকাশের গবেষণা, সেবামূলক কাজ পরিচালনা করা এবং শিলাই প্রশিক্ষণ দান)। ১৯৭৫ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন। আমরা ৫ ভাই, ২ বোন। এদের মধ্যে আমার স্থান চতুর্থ।

শুরুতে চট্টগ্রাম এম. ই. স্কুলের ছাত্র ছিলাম। পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী ঢাকার গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের ছাত্র। নবম/দশম শ্রেণী ধানমণ্ডী সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং স্কুল ক্যাপ্টেন। (ফুটবল, ক্রিকেট, হকিতে ইন্টারস্কুল প্রতিযোগিতায় স্কুলের ক্যাপ্টেন ছিলাম। স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত শান্তিনগর ক্লাবের নিয়মিত ক্রিকেটার)। ১৯৬৭ সনে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিক (আর্টস) পাশ করি। এবং ১৯৬৯ সালে ঢাকা কলেজ হতে ২য় বিভাগে এইচএসসি (আর্টস) পাশ করি। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ঢাকা কলেজে বিএ ক্লাশে পড়ার সময় ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হই এবং গণ-আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ি। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হই সত্তরে।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে আমি ঢাকা কলেজের বিএ (পাশ) ক্লাসের ২য় পর্বের ছাত্র ছিলাম।

ছাত্রবস্থায় সরাসরি রাজনীতির সাথে কোনো অবস্থাতেই জড়িত হওয়া যায় না, তবুও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় সমর্থক এবং ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি হিসাবে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দাবিকে বাঙালি জাতীয় সত্ত্বার সনদপত্র ধরে নিয়ে আন্দোলনের একজন সক্রিয় এবং একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছি। ছাত্র আন্দোলনে প্রথমদিকের সারিতেই ছিলাম।

আমার প্রথম ভাই মো. আব্দুস সালাম আমারই গ্রুপের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে ব্যবসায় জড়িত।

আমার তৃতীয় ভাই মো. আব্দুর রউফ ২ নম্বর সেক্টরের মেলাঘরে ট্রেনিং গ্রহণ করে আমারই গ্রুপে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে অংশগ্রহণ করে। পরে '৭৩-এ বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুলিশ সার্ভিসে যোগ দেয় এবং বর্তমানে সে পুলিশের এস. পি. হিসাবে কর্মরত আছে।

আমার চার জন চাচাত ভাই এবং দুই জন ভ্রাতুষ্পুত্রও মুক্তিযুদ্ধে কসবা-বুড়িচং-এ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

সত্তরের মাঝামাঝি এক্সকার্শন প্রোগ্রামে স্টুডেন্ট ডেলিগেট হিসাবে ৮ জন স্টুডেন্ট পাকিস্তানে গেলাম। প্রফেসর মহসীন (ঢাকা কলেজের Political Science এর লেকচারার ছিলেন, বর্তমানে Foreign Service-এ চাকুরিরত) leader হিসাবে ছিলেন।

আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা সফর করি। সে সময় আমাদের রাওয়ালপিণ্ডিতে কেন্দ্রের রাজধানী দেখানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ইসলামাবাদ থেকে কয়েক মাইল দূরে শাক্কারপাড়িয়া বলে একটা পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ে সন্ধ্যার পর নিয়ে যাওয়া হয় ইসলামাবাদ দেখানোর জন্য।

সেখান থেকে ইসলামাবাদ এত সুন্দর দেখা যাচ্ছিল যাতে মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গের কোনো উদ্যান। সাথে সাথে আমার ঢাকার সেকেণ্ড ক্যাপিটেলের (বর্তমানে শের-ই-বাংলা নগর-সম্পাদক– কথা মনে পড়ে এবং তখন অনুভব করি আমাদের মাঝে ব্যবধান। পরিষ্কার অনুধাবন করতে পারি আমাদের কিভাবে শোষণ করা হচ্ছে। এ অনুভূতিটা আসার পরে ওদের আর আমাদের প্রভেদ দেখে চোখের পানি সম্বরণ করতে পারিনি, কেঁদে ফেলি।

আমার অবস্থা দেখে পশ্চিম পাকিস্তানি যে গাইড ছিল সে অবাক হয়ে আমাকে প্রশ্ন করে আমি কেন কাঁদছি? আমি তাকে ওদের আর আমাদের প্রভেদটা বুঝাতেই সে আমাকে ইংরেজিতে উত্তর দিয়েছে, As a student nobody must have a ill feelings for their country's capital, rather a student must be proud of his capital. আমার উত্তর ছিল, 'May be its yours, not mine.'

সেই সফরকালেই দেখতে পাই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব বা প্রভেদ কতটুকু, আর আমরা বাঙালিরা কীভাবে শোষিত হচ্ছি। Statistics দিয়ে প্রভেদ বুঝতে পারিনি। যতটুকু প্রভেদ বুঝতে পেরেছি তা ছিল তাদের ও আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভেদ, তাদের এবং আমাদের জীবনযাত্রার মানের প্রভেদ।

সত্তরের নির্বাচন ছিল বাঙালি জাতির একাত্মবোধের আর চৈতন্যদয়ের নির্বাচন। এরপর আলোচনার প্রহসন যখন চলছিল, তখনই আমরা ইকবাল হলে (বর্তমান জহুরুল হক হল) গঠন করি পূর্ব পাকিস্তান কলেজ ছাত্র সংসদ সহ-সভাপতি পরিষদ। যার কার্যক্রম ছিল সমগ্র বাংলাদেশে একসাথে ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। আমি উক্ত সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হই।

একাত্তরের ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস উদযাপন ছিল সমগ্র বাঙালি জাতির ইতিহাসে একাত্মতা ঘোষণার এক ঐতিহাসিক দিন। শহীদ দিবস এত জাঁকজমক আর কোনোদিন হয়নি। এরপর ইকবাল হলে সকাল বিকাল U.O.T.C ক্যাডেটদের কাঠের রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ। সেই উদ্দীপনা, সেই জাতীয়তাবাদের উন্মাদনা আজ আমাদের জাতির ভিতর দেখি না।

৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার দিন থেকেই আরম্ভ হয় একটা রণউন্মাদনা। আরম্ভ হয় প্রশিক্ষণ U.O.T.C. রাইফেল দিয়ে। V.P. কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত হল ছাত্রদের প্রশিক্ষণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সেই অনুযায়ী আরম্ভ হল কাজ।

২৪শে মার্চ ক্রিকেট খেলতে গিয়ে আহত হই। এল ২৫শে মার্চ। বিকালে অনেক কেন্দ্রীয় নেতারা আমার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে দেখতে এলেন। রাত্রি ১১টার সময় বঙ্গবন্ধুর ফুপাত ভাই ধানমন্ডি ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য শাখাওয়াৎ ভাই এসে বললেন আলোচনা ভেঙে গেছে, তাই সংগ্রাম করেই অধিকার আদায় করতে হবে। রাস্তায় আর্মি নেমেছে, ব্যারিকেড দাও। অসুস্থাবস্থা সত্ত্বেও মা আমায় ধরে ধরে বাইরে নিয়ে এলেন। ফারুক (যার পরিচিতি ছিল, চিকা ফারুক নামে) সবাইকে ডেকে নিয়ে এল। আমি গ্রীনরোড স্টাফ কোয়ার্টারের সিঁড়িতে আমার মায়ের সাথে বসে আছি। আমার নির্দেশে গ্রীনরোডের ছেলেরা ব্যারিকেড তৈরিতে ব্যস্ত। তিনটা ব্যারিকেড তৈরি হওয়ার পর আরম্ভ হল সেই কালো রাত্রির ভীষণ গোলাগুলি। সবাইকে চলে যেতে বললাম। তারপর অপেক্ষার পালা। শেষ রাত্রিতে আর্মি এল গ্রীন রোডে। ঠেলাগাড়িওয়ালা, রিক্সাওয়ালা দিন মজুর ধরে ধরে ব্যারিকেড সরালো ওরা, যাবার সময় ৪ জনকে সেই ব্যারিকেডের আবর্জনার স্তুপের উপর গুলি করে মেরে রেখে গেল। ২৭শে মার্চ সকাল পর্যন্ত ছিল কারফিউ। সকালবেলা কারফিউ কয়েক ঘণ্টার জন্য তুলে নেওয়ার পর আরম্ভ হল আমার জীবনের নতুন এক অধ্যায়ের।

২৭শে মার্চ সকালে কারফিউ তুলে নেয়া হলে আমার মা, আমি, আমার ছোট দুই বোন আর এক ভাইকে নিয়ে শহীদ লেফটেনেন্ট খন্দকার আজিজুল ইসলাম (বাবুল), বীর বিক্রম-দের গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানার বানিয়ারা গ্রামে পালিয়ে চলে যাই। বাবুল আমার স্কুল বন্ধু তাছাড়া ওদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাবুলদের পরিবার/মন্টুদের পরিবারও সেই সাথে আমাদের সঙ্গী হয়েছিল। সেই অবস্থায় আমরা ১লা এপ্রিল পর্যন্ত বানিয়ারা থাকি। ২রা এপ্রিল শুধু আমি আমার মা ও ভাইবোনদের নিয়ে একটা ছোট গাড়িতে করে ঢাকা রওয়ানা হই। মির্জাপুরে আসার পর আর্মি কনভয়ের সামনাসামনি হই। আমার মা অনর্গল পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলতে পারতেন। আর্মির এক ক্যাপ্টেনের সাথে আম্মা কথা বলায় তারা আমাদের ছেড়ে দেয়, সেই সাথে একটা পাস দিয়ে দেয় যাতে রাস্তায় কোনো অসুবিধা না হয়। সেই পাসের সুবাদে অবশ্য রাস্তায় ২/৩ বার আর্মি চেক পোস্ট-এর থামানো সত্ত্বেও কোনো অসুবিধায় পড়তে হয় নাই। অবশ্য এই নিরাপদে আমাদের ঢাকায় আসতে পারার মূল কৃতিত্বটাই ছিল আমার মায়ের পাঞ্জাবি ভাষায় কথাবার্তা বলার পারদর্শিতা।

যাই হোক, সেই রাত্রিটা ঢাকাতে অন্য বাসায় অতিবাহিত করে পরের দিন ৩রা এপ্রিল নরসিংদী হয়ে কুমিল্লা জেলার নবীনগর থানার বিটগড় গ্রামে মামার বাড়িতে চলে যাই। আমার এভাবে পালিয়ে বেড়ানোর কারণ ছিল, যে কোনো সময় আমার এন্টি পাকিস্তান একটিভিটির কারণে আর্মির হাতে গ্রেফতার হবার ভয়।

গ্রামের বাড়ি যাওয়ার পথে দেখেছি হাজারো জনতার শহর ছেড়ে পালানোর হিড়িক। আর পথে পথে দেখেছি শত শত শবের স্তুপ আর শবদেহ নিয়ে শকুনের কাড়াকাড়ি। পাশাপাশি মানুষের প্রাণ বাঁচানোর সেকি আর্তি। আবার বিস্ময়চিত্তে দেখেছি গ্রামের মানুষ কীভাবে অসহায় ভিটেছাড়া মানুষকে যথাসর্বস্ব দিয়ে সাহায্য করেছে। বাঁচবার আর বাঁচাবার সেই ছবি বাঙালি জাতির জীবনে দেশাত্মবোধের এক নজীরবিহীন অবিস্মরণীয় ঘটনা। জায়গায় জায়গায় মানুষের জন্য শেল্টার তৈরি করে ক্ষুধার্তকে অন্ন, তৃষিতকে জল আর আশ্রয়হীনের জন্য রাতের আশ্রয়- সে ছিল আমাদের জাতির ক্রান্তিলগ্নে এক একাত্মবোধের চরম দৃষ্টান্ত।

৩রা এপ্রিল গ্রামে পৌছানোর সংবাদ পেয়ে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন সকলেই এলেন দেখা করতে। সবার মুখে একটাই কথা ঢাকার খবর কী? অনেক রাত্রি পর্যন্ত সবার সাথে আলাপ-আলোচনা হল। স্থির হল আগামী দিন থেকে আমরা কাজে নামব। কাজটা হল গ্রামে গ্রামে যুবক/এক্স-সার্ভিস মেন সমন্বয়ে সংগ্রাম কমিটি গঠন করা এবং সবার মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ববন্ধনের সেতু গড়ে তোলা। সেই সাথে সবাই প্রস্তুত থাকা, যাতে কোনো সময় কোন নির্দেশ এলে সেই মোতাবেক কাজে লেগে যাওয়া। আরো কর্মসূচি হল প্রতি বিকালে কিছু কিছু শরীরচর্চা সেই সাথে সিভিল ডিফেন্স, আর শহর থেকে পালানো মানুষদের সাহায্য করা।

সেই সময়টা ছিল অবিরাম পরিশ্রম আর উন্মাদনার সময়। সারা এপ্রিল মাসটাই একইভাবে কাজ করে গেছি। সেই সময় আমার সাথে যারা কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে আজো মনে পড়ে রুপন মাস্টার, মানিক ডাক্তার, খুরশীদ ভাই, নসু ভাই এদের কথা।

পরবর্তীতে এরা সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই রুপন মাস্টার যদি না থাকত, তবে অনেক অনেক মুক্তিযোদ্ধারই হয়তবা ভারতের মাটিতে যাওয়া হত না বা মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার সাধটাই মিটত না। রুপন মাস্টারের লোকরাই নৌকা করে মুক্তিযোদ্ধাদের সিএন্ডবি রোড পার করে দিত। আবার রাজাকারদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে সিএণ্ডবি-র ওপাড় থেকে আরেক গ্রুপ রাতের আঁধারে একেবারে ভারতে পৌছে দিত। এভাবেই তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের চাইতেও অনেক বড় আর মহৎ কাজ করেছেন। বিনিময়ে চান নাই বিন্দুমাত্র প্রতিদান। অথচ আজ তাই ত্যাগী কর্মীরাই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন। এই সব, কিছু নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর কারণেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এত সাফল্য পেয়েছে। অনেক বীর যোদ্ধা নিয়ে গড়া হয় ইতিহাস আর রচনা হয় পালাগান; কিন্তু এদের কথা, যাদের জন্য বীরেরা তাদের সাফল্য পায়, তাদের ত্যাগ থেকে যায় সবার অগোচরে। এটাই নির্মম বাস্তবতা।

যাই হোক, গ্রামে গ্রামে সংগঠনের কাজ যখন করে চলেছি, তখন শরনার্থীরা জীবন বাঁচানোর জন্য পার্শ্ববর্তী রাজ্যের আগরতলার দিকে ছুটে চলেছে। আমার মামাবাড়ি

বিটগড় থেকে আগরতলার দূরত্ব প্রায় ১০/১২ মাইল। এই পথটুকু শরনার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে যেতে পারে, আর রাস্তা চেনার যাতে ভুল না হয় তার সমস্ত আয়োজন আমাদেরকেই সংগঠনের পাশাপাশি করতে হত। এরই মাঝে ঢাকা কলেজের ছাত্র হাসান মাহ্‌মুদের সাথে গ্রামের বাজারে দেখা। সময়টা বোধকরি এপ্রিলের শেষ ভাগ। ও আমাকে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক মাখন ভাইয়ের একটা চিঠি দিল। চিঠিটা আমার উদ্দেশ্যে আগরতলার কলেজ টিলা ছাত্রাবাস থেকে লেখা। আমাকে ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। যাই হোক, হাসানকে নিয়ে বাড়ি এলাম। রাত্রিবেলা সব কথা মাকে খুলে বলতেই উনি নির্দেশ দিলেন যাওয়ার জন্য।

পরদিন কসবার মনিঅন্দ গ্রামের ছেলে নাসিমকে নিয়ে চারগাছ-রাওথাট-মনিঅন্দ কসবা হয়ে আখাউড়া চেকপোস্টে গেলাম। ওখানে দেখা হল এমএনএ দেওয়ান আবুল আব্বাসের সাথে। তিনি আমাকে খাওয়া-দাওয়া করিয়ে একজন লোকসহ পাঠালেন আগরতলার শ্রীধর ভিলায়। ওখান থেকে চলে এলাম কলেজ টিলার ছাত্রাবাসে আব্দুল কুদ্দুস মাখন ভাইয়ের কাছে। রাত্রিবেলা মাখন ভাইয়ের সাথে দেখা হলে কলেজ টিলার ছাত্রাবাসে আমাদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত হল।

৮/১০ দিন সেই ছাত্রাবাসে থাকাকালীন সময়ে অনেকের সাথেই দেখা সাক্ষাত হয়েছে এবং অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি। একদিকে দেখেছি সাধারণ গ্রামের অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ছেলেদের মুখে নিরন্তর একটাই প্রশ্ন এখন আমাদের কী করণীয়, আমাদের দেশের কী হবে, আবার পাশিাপাশি দেখেছি একদল ছেলে যারা শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, পারফিউম মেখে, দামী জামা কাপড় পরে ছবি পাড়ায় গিয়ে ছবি দেখে গল্প গুজবে নিরুদ্বিগ্ন সময় কাটাতে। দেখে মনে হত যেন তারা আনন্দ ভ্রমণে এসেছে। অবাক হতাম এদের দেখে। মজা লাগত মাখন ভাইকে দেখে, উনি না তাদের ঠিকমত সামাল দিতে পারছেন, না সাধারণ ছেলেদের জন্য কিছু করতে পারছেন।

৮/১০ দিন পর মেজর খালেদ মোশাররফ এলেন লে. কবিরকে সাথে করে কলেজ টিলায় মাখন ভাইয়ের রুমে। মাখন ভাই আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি তাদের সব আলাপ আলোচনা শুনলাম। তখনই জানতে পারলাম ছাত্র/যুবকদের সমন্বয়ে মুক্তিযোদ্ধা/গেরিলা দল গঠন করা হবে। আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যোগ দেবার আগ্রহ দেখানোতে, খালেদ মোশাররফ সাহেব মাখন ভাইকে বলে গেলেন আমাদের পাঠিয়ে দেবার জন্য।

পরদিন (দিন তারিখ ক্ষণ মনে নাই, আনুমানিক মে মাসের মাঝামাঝি) সকালবেলা কলেজ টিলায় অবস্থানরত সবাইকে ডেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যোগ দেওয়ার জন্য আহবান জানানো হল। তখন কলেজ টিলায় আশ্রয়গ্রহণকারী আমাদের সংখ্যা প্রায় ৮০/৯০ জন। তার মধ্যে ৪০/৪৫ জন তাদের আগ্রহ ব্যক্ত করল মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ নিতে। অবাক হলাম, এরা সবাই অরাজনৈতিক গ্রাম্য অর্ধশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ছেলে। যারা যেতে চাইলনা তারা সবাই শহুরে, শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন ও রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। পরে এদের কেউ কেউ মুজিব বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল বলে জানতে পারি।

যাই হোক মাখন ভাই আমার সাথে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর সেদিন সন্ধ্যার পর একটা ট্রাকে করে আমরা মতিনগর বিএসএফ ক্যাম্প-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে রাত্রি প্রায় ১০টায় পৌঁছাই। রাত্রি বিধায় আমাদেরকে পরদিন যাবার কথা বলে বিদায় দেয়া হল। চলে এলাম সোনামূড়া। সারারাত সোনামূড়া হাইস্কুল মাঠে শুয়ে বসে সময় কাটিয়ে পরদিন ৬ মাইল পথ হেঁটে আমরা সবাই মতিনগর বিএসএফ ক্যাম্পে পৌঁছালে ওখান থেকে পথনির্দেশক নিয়ে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে হেঁটে বাংলাদেশ আর্মির ক্যাম্পের আউট পোস্টে এলাম। বেলা প্রায় ৩টার দিকে লে. দিদারুল আলম এলেন, এবং সবার সাথে আলোচনা শেষে বাছাই পর্ব সমাপ্ত করলেন। আমার নিয়ে যাওয়া ছেলেদের মাঝ থেকে ৬/৭ জন বাদ পড়ল। ওদের আহাজারিতে অনুরোধ করতে গিয়েও কোনো কাজ হল না। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার সময় পাহাড়ের মাঝ দিয়ে উপর দিয়ে হেঁটে ক্যাম্পে পৌঁছলাম। সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল আরেক বিস্ময়। আমার ছোটবেলার খেলার সাথী নজরুল, হেলাল, মন্টু, হায়াৎ এরা সবাই সেই ক্যাম্পে আগে থেকেই আছে। ঠিক তখনকার সেই ত্যক্ত বিরক্ত পরিস্থিতিতে ওদেরকে পেয়ে আমি আত্মহারা। ওরাই তখনকার মতো নিজ থেকেই আমার থাকা আর খাওয়ার দায়িত্ব নিয়ে নেয়, ফলে আমার দিশেহারা অবস্থায় পড়তে হয় নাই।

পরদিন সকাল থেকেই আরম্ভ হল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণকালীন জীবনের। সকালবেলা চা আর পুরী খাওয়া শেষ হতে না হতেই ফল ইন (লাইন করে কাতারে দাঁড়ানো) এর ডাক। সবাই গিয়ে দাঁড়াতেই আরম্ভ হল মাথা গোনা। এর মধ্যে এলেন মেজর শাফায়াত জামিল। এক এক করে আমাদের সাথে পরিচিত হয়ে সবাইকে সংক্ষিপ্তভাবে বুঝিয়ে দিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের দায়িত্ব, প্রশিক্ষণ ও কর্তব্য সম্বন্ধে। তারপর এল গ্রুপ ভাগের পালা। তখন আমাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০ জন (নন রেগুলার ফোর্স/সিভিলিয়ন)। মেজর শাফায়ত জামিল জানতে চাইলেন, আমাদের মাঝ থেকে কে কে কমাণ্ডার হতে ইচ্ছুক। এটা শুনে কয়েকজন হাত উঠাল। উনি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন। আমি হাত উঠাইনি, কিন্তু আমার বন্ধুরা, আর যাদের আমি সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেই ছেলেরা সবাই সমস্বরে আমার নাম বলে আমাকে ধাক্কায় লাইনের সামনে ঠেলে দেয়। মেজর শাফায়াত আমার সমস্ত পরিচয় জেনে নিয়ে আমায় কোম্পানি কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ করেন। আমার টুআইসি নিযুক্ত করেন ক্যান্টনমেন্টের সালাউদ্দিনকে আর এ্যাডজুটেন্ট নিযুক্ত হয় মঞ্জুর মওলা। এছাড়া সমস্ত ছেলেদের চার ভাগে ভাগ করে গঠন করা হল ৪টা প্লাটুন এবং সেই সাথে চারটা প্লাটুনের ৪জন কমাণ্ডার নির্বাচন করা হল। এরপর আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল মনির উস্তাদের সাথে যিনি প্রাথমিকভাবে আমাদের প্রশিক্ষণ দেবেন।

পরদিন থেকে শুরু হল আমাদের গ্রেনেড আর এক্সপ্লোসিভ নিয়ে প্রশিক্ষণ। এভাবে ১০/১২ দিন কেটে যাওয়ার পর আমাদের গ্রেনেড আর এক্সপ্লোসিভ ট্রেনিং শেষ হবার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু কর্মকান্ড আরম্ভ হওয়ার প্রয়োজন আছে দেশের অভ্যন্তরে। কেননা মোটামুটি পাক বাহিনী তখন বর্ডার এলাকাগুলোতেই কিছু কিছু কর্মকান্ডের সম্মুখীন হচ্ছে। ঢাকা শহর বা এর আশে পাশে তখনো পর্যন্ত কোনো

প্রতিরোধ কার্য্যক্রম গড়ে ওঠেনি। সেই সাথে মুক্তিযোদ্ধা যারা প্রশিক্ষণ শেষে দেশের অভ্যন্তরে ফিরে যাবে, তাদের আশ্রয়, আহার যোগান, অগ্রীম তথ্য সরবরাহের জন্য দেশের অভ্যন্তরে পকেট সৃষ্টি করবার চিন্তার ফলে জন্ম হল ভিত্তি ফৌজ। এদেরকে সরবরাহ করা হল গ্রেনেড, কিছু এক্সপ্লোসিভ আর প্রত্যেকের জন্য দেয়া হল কমান্ডো নাইফ (ছুরি)। মতিনগর থেকে যে দলটা বাংলাদেশে গেল সেই দলে ছিল নজরুল, হায়াৎ জলিল, হেলাল, মন্টু আরো প্রায় ২০/২২ জন। এদের সবাইকে এদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে পাঠান হল। পরবর্তীতে এরা আমাদের অনেক কাজে আসে।

এর মাঝে এলেন আমাদের (ছাত্রদের) সার্বক্ষণিক দায়িত্ব নিয়ে ক্যাপ্টেন হায়দার, পরবর্তীতে যুদ্ধ চলাকালীন শেষ পর্যায়ে মেজর পদে উন্নীত হন। উনি আসার পর আমাদের ট্রেনিং আরো সুসংগঠিত ও আরো গতিবেগ অর্জন করে। উনার সাহায্যে কাজে হাত দেন পিডিবি-র ইঞ্জিনিয়ার মমিনুল হক ভূঁইয়া। এর মাঝে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে খবর এল, আমাদের ঢাকায় কিছু অপারেশন করতে হবে কেননা জাতিসংঘ থেকে ৭ই জুন পর্যবেক্ষণ দল ঢাকায় আসবে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য। ওদের সামনে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধীকার আদায়ের জন্য লড়ছি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে এদেশের মাটিতে, এটা বিশ্ববিবেকের কাছে আমাদের প্রমাণ করতে হবে। সেই মোতাবেক ৪ জন করে একেকটি দল মোট ১০টি দল গঠিত হল। ভূঁইয়া সাহেব, হায়দার সাহেবের প্ল্যান অনুযায়ী ঢাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে। আমাদের প্রত্যেক গ্রুপকে ৪টা গ্রেনেড, ৩০ পাউন্ড প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ আর একটি করে স্টেনগান দেয়া হল।

আমরা ৪২ জনের দল ৬ তারিখ (জুন) মনতলি ক্যাম্প হয়ে আমার মামাবাড়ি হয়ে আড়াই হাজার থানার গোপালদিতে এম.পি সফর আলী সাহেবের বাসায় খাওয়া-দাওয়ার পর ১০টা দলে বিভক্ত হয়ে যার যার অপারেশন স্থলের দিকে রওয়ানা হলাম। অপারেশনের সময় নির্ধারণ করা হল রাত্রি ২টা। প্রত্যেককে ১টা করে টার্গেট আবার একটা বিকল্প টার্গেট দেওয়া হয়েছিল। আমার দলে এল মাতুয়াইলের অলি, ঢাকার বাবুল (আজিজুল ইসলাম বাবুল পরবর্তীতে লেফটেনেন্ট পদে যোগ দেন এবং কসবায় শহীদ হন) আরো একজন, যার নামটা ঠিক এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছেনা। আমাদের উপর নির্দিষ্ট করা ছিল যাত্রাবাড়ির ইলেট্রিক সাব-স্টেশন ধ্বংস করা।

রাত্রি ১২টার দিকে যাত্রাবাড়ি সাব-স্টেশনে পৌঁছে দেখতে পেলাম আর্মির ক্যাম্পে প্রায় ২০ জন আর্মি আছে। আরো আছে দুইটা মেশিনগান পোস্ট। আমাদের কাছে মাত্র ১টা স্টেন গান। বাধ্য হয়েই যেতে হল বিকল্প টার্গেট সায়েদাবাদ ব্রীজের নীচ দিয়ে নিয়ে যাওয়া মেইন ইলেট্রিক ক্যাবল লাইন ধ্বংস করতে। টার্গেট-এ গিয়ে পৌঁছতে আমাদের সময় ঘনিয়ে গেল। ব্রীজের নীচে যখন আমরা এক্সপ্লোসিভ ক্যাবল-এ লাগাতে ব্যস্ত তখনই প্রথম আওয়াজ (বিস্ময়কর বিস্ফোরণ) শুনতে পেলাম। যাই হোক অভিজ্ঞতার অভাবে সমস্ত এক্সপ্লোসিভ (৩০ পাউণ্ড) লাগিয়ে দিয়ে সেফটি ফিউজে আগুন দিয়ে ছুট। অনেকদূর ছুটে এলাম, তবুও বিস্ফোরণ হচ্ছে না। ফিরে যাব কিনা ভাবছি, এমনি সময়

বিদ্যুৎ চমকের আলো দিয়ে ঘটল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ যার ধাক্কায় আমরা ৪ জনই প্রপাত ধরণীতল। ৫ পাউণ্ড হলেই কাজ হত অথচ দিলাম ৩০ পাউণ্ড। অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সায়দাবাদ ব্রীজে মারাত্মক ফাটল ধরে যায় ঐ এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ হল বিচ্ছিন্ন। এরপর আমরা পালিয়ে যাই। পরদিন ঢাকায় ঢুকতে গিয়ে দেখতে পাই, ব্রীজের উপর দিয়ে যান চলাচল বন্ধ। ব্রীজ ফেটে গিয়েছে আর ৩টা মারাত্মক ছিদ্র হয়ে গেছে। ঢাকায় দুই দিন থেকে ফিরে যেতে হল আবার ক্যাম্পে।

ক্যাম্পে আসার পর থেকে আমাদের অবস্থার উন্নতি হতে থাকল। এর মাঝে আমাদের জন্য ভারত সরকার অস্ত্র গোলাবারুদ সরবরাহ করল। মাঝখানে আমাদের এক রাতের মধ্যে পাক বাহিনীর হামলার ভয়ে এবং ২ নম্বর সেক্টরের পার্মানেন্ট হেডকোয়ার্টার গঠন করবার জন্য মতিনগর থেকে রুদ্রসাগরের কাছে মেলাঘরে ক্যাম্প স্থানান্তর করতে হল। অনেক খাটাখাটুনির পর জঙ্গল পরিষ্কার করে (জঙ্গল আমরা পরিষ্কার করেছিলাম) ভারতীয় ঠিকাদারের সহায়তায় নির্মিত হল মেলাঘর ক্যাম্প।

এই ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর হতেই সমস্ত পরিস্থিতি সুশৃঙ্খল হয়ে উঠল। অস্ত্র সরবরাহ, খাওয়ার মান, এডমিনিস্ট্রেশন সব কিছুতেই বিশৃঙ্খল ভাব কেটে গিয়ে একটা সুশৃঙ্খল অবস্থা ফিরে এল। ছেলেদের থাকার জন্য ব্যারাক তৈরি হল (ভারতীয় ঠিকাদারের সহায়তায়)। ট্রেনিং প্রোগ্রামেও অনেক পরিবর্তন এল। ট্রেনিং তখন পুরাদমে এগিয়ে যাচ্ছে। রাত্রি বেলায়ও আমাদের ট্রেনিং চলছিল। এর মধ্যে অবশ্য কিছু বৈসাদৃশ্যেরও অবতারনা যে হয় নাই তাও নয়। ক্যাম্পে অনেক নতুন ছেলে যোগ দেয়াতে আমাদের প্লাটুন সংখ্যা বাড়িয়ে ১৬তে উন্নীত করা হল। এর মধ্যে ৭নং প্লাটুন, যেটার কমাণ্ডার ছিল মায়া (বীর বিক্রম), যার মধ্যে সবই ছিল ঢাকা শহরের ছেলে, আর কিছুটা অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে; এছাড়াও ছিল স্পীকার জাব্বার খান সাহেবের ছেলে বাদল ভাই, রুমী, মুনীর চৌধুরীর ছেলে ভাষণ, সাহিত্যিক খন্দকার ইলিয়াসের ছেলে সানি, আলম, সাইদ, গাজী দস্তগীর, মাশুক, বকুল, নজীব এবং আরো অনেকে। এদের পোশাক-আশাক, চালচলনে ছিল কিছুটা অহংবোধ, আর তাদের আমিত্ব আর আভিজাত্যের সামনে অন্য সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থা ছিল ম্লান। ফলশ্রুতিতে ছিল তাদের প্রতি সেক্টরের অফিসারদের কিছুটা পক্ষপাদুষ্টতা। শ্রদ্ধেয় হায়দার ভাইও এর বাইরে আসতে পারেননি। এককথায় They were the priviledged class freedom fighters. পরবর্তীতেও দেখা গেছে তারাই সবচাইতে উন্নতমানের অস্ত্র এবং অন্যান্য সুবিধা সবচাইতে বেশি ভোগ করত। সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই ভাবি, এই বৈষম্য কী লাভ দিতে পেরেছে আমাদের জন্য-জাতিগতভাবে, আমি জানিনা। পরবর্তীতে দেখেছি এই priviledged class-টার প্রচার অত্যন্ত প্রকট।

আমি সবসময়ই একটু বিচলিত, কেননা আমি বোধহয় ছাত্রলীগের ছেলে হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম, মুজিব বাহিনীতে না গিয়ে। এজন্য হয়তবা কিছুটা উপেক্ষিতও ছিলাম। তবে সমস্ত সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আমি ছিলাম সবচাইতে আদরনীয় আর গ্রহণযোগ্য। কেননা যখনই খাবার জন্য পানি আনা বা লাকড়ি আনতে যেতে লোক পাওয়া যেত না, তখন হয়ত আমি একাই বেরিয়ে গেছি কাজ করতে, ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে

(কাজগুলো ছিল ভীষণ কঠিন আর কষ্টসাধ্য) তখন লজ্জায় পড়ে ৫০/৬০ জন ছেলে সব উপেক্ষা করেই কাজে লাগত, দরকার ১০/১৫ জন, কিন্তু হয়ত ৫০/৬০ জনই কাজে হাত লাগাত, আমি হাত লাগিয়েছি বলে। এভাবেই আমাদের ট্রেনিংএর পাশাপাশি বিভিন্ন কাজে ফেটিগ (সাহায্যকারী) হিসাবে কাজ করতে হয়েছে।

আমি আমার এই সাধারণ ট্রেনিংএর পাশাপাশি নৌ কমান্ডো (মেলাঘরে ২০ জন ট্রেনিং নিয়েছিলাম) ট্রেনিং চালিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রতিদিন মেলাঘর হতে সোনামুড়া দৌড়ে যেতে হত আর দৌড়ে ফিরে আসতে হত প্রায় ১৪ মাইল পথ। রোদ গলা পীচের রাস্তায় মাঝে মাঝে খালি গায়ে শুয়ে বিভিন্ন প্রকার ব্যায়াম।

তারপর রুদ্রসায়রে মাঝখানে ছিল আগরতলা রাজার (জরাজীর্ণ বাগানবাড়ি) সাঁতার/ডুব সাঁতার সেই সাথে এক্সপ্লোসিভ আর মাইন নিয়ে ট্রেনিং। অবশ্য ওস্তাদদের কাছ থেকে চুরি করে এক্সপ্লোসিভ ফাটাতাম রুদ্রসায়রে। অনেক ছোট ছোট মাছ পেতাম। গামছা দিয়ে ছেঁকে সব ধরে নিয়ে ফিরতাম ক্যাম্পে। কেননা ক্যাম্প থেকে কোনোদিন মাছ খেতে পেতাম না। রাতের বেলা চুরি করে সেই মাছ রান্না করা-এর মাঝে ছিল অবৈধ কাজ করবার একটা রোমাঞ্চকর সুখানুভূতি। তারপর সবাই মিলে খাওয়া। এই আনন্দময় অভিজ্ঞতা আজ শুরু স্মৃতি রোমন্থন করবার মতই ঘটনা আমার জীবনে।

এইভাবেই একদিন আমাদের ট্রেনিং-পর্ব সমাধা হল। এবার সত্যিকার ভাবে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমাদের পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক যুদ্ধের জন্য দেশে ফেরার পালা। অনেকদিন জানা অজানা অনেক মুক্তিকামী ছেলের সাথে সুখে দুঃখে নানা অভিজ্ঞতায় সময় কাটিয়ে অলিখিত আর সম্বন্ধহীন সম্পর্ক স্থাপন করে অবশেষে আমাদের দেশমাতৃকার স্বাধীকার আদায়ের জন্য নিজ জীবনকে দেশের জন্য উৎসর্গ করতে দেশে ফেরার সময় হল। মুক্তিযোদ্ধা (প্রশিক্ষণ) জীবনের হাসি, আনন্দ, কান্নার সময়ের ইতি ঘটিয়ে এখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে আমরা হলাম প্রস্তুত। আমাদের জীবনের প্রধান অধ্যায় শুরু করবার সময় এসে গেছে। আমরাও সর্বতোভাবে প্রস্তুত।

ট্রেনিং শেষে এবার দেশে ফেরার বা ক্যাম্প থেকে বিদায় নেবার পালা। একদিন রাত্রিবেলা (আমার আজ আর তারিখগুলো সঠিক মনে নেই। সম্ভবত জুলাই মাসের শেষ দিকে) ভারতের ওম্পিনগর থেকে ৩০০/৪০০ ছেলে তাদের ট্রেনিং শেষে বাংলাদেশে ঢুকবার জন্য এবং আর্মস নেবার জন্য মেলাঘরে এল। ওদের থাকা এবং খাবার বন্দোবস্ত হঠাৎ করতে গিয়ে বেশ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। যাই হোক, ওম্পিনগর ছেলেদেরসহ আমাদের ছেলেদের দিয়ে ১৫/২০ জনের একেকটা গ্রুপ তৈরি করে, ঢাকা জেলা, নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা জেলা এবং ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন থানায় থানায় পাঠানো শুরু হল।

আমাদের ট্রেনিং চলাকালীন সময়ে যেই ছেলেগুলো আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিল, তারা সবসময় ভাবত যে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও তারা আমার সাথে থাকবে। এদের মাঝে কিছু বাচ্চা ছেলেও (ফোর ফাইভের ছাত্র, যাদেরকে 'Y' প্লাটুনের ছেলে বা হায়দার ভাইয়ের আদর করে দেয়া নাম Walkie Talkie বলা হত, তারা আমার সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে থেকেই ট্রেনিং নিয়েছে এবং এরা এত ছোট ছেলে ছিল যে এদের প্রতি সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়েছে।

সবার পাশাপাশি আমার স্নেহ পেয়েছে প্রচুর বিধায় ওরা ছিল প্রচণ্ডভাবে আমার ভক্ত (এদের মধ্যে গ্রীনরোডের হাসান, প্রদীপ, শাহজাহান, বিচ্ছু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য)। ভাবতো যুদ্ধকালীন সময়ে তারা আমার সাথে থাকবে আর যুদ্ধ করবে। ক্যাম্পের সবাই জানতো কারা কারা আমার সাথে দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করতে যাবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল এক এক করে সবাইকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্যান্য গ্রুপের সাথে জড়িয়ে দেয়া হল। বিদায় নেবার সময় সবার সেই কান্নার কোনো উত্তর ছিল না। একমাত্র ইণ্ডিয়ান ফারুক (আমাদের ক্যাম্পে তিন জন ফারুক ছিল। তাই নাম ডাকার সুবিধার্থে এই ব্যবস্থা। পরবর্তীতে ঐ নামেই পরিচিত হয়) আমার সাথে থেকে যায়।

একে একে সবাই বিদায় নিল। মায়া, কাজী ভাই, আলম, পিনু, লতীফ, আব্বাস, সালাহ্উদ্দিন, গিয়াস, জয়নাল, রাজা সবাই যার যার দল নিয়ে বিদায় নিল। কিন্তু আমারতো আর ডাক আসেনা। শেষ পর্যন্ত কর্নেল ওসমানী, আবদুল মালেক উকীল, শেখ ফজলুল হক মনি আর ইণ্ডিয়ান আর্মির একজন লে. জেনারেল (নাম মনে নেই) মেলাঘর পরিদর্শনে এলেন। ততদিনে আমি ত্যক্ত বিরক্ত, কেননা সবাই যাওয়া সত্ত্বেও আমাকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না বা কোনো সদুত্তরও পাচ্ছি না। এমতাবস্থায় তাদেরকে আমার অবস্থা জানানো ছাড়া কোনো গত্যান্তর ছিল না। (অবশ্য আমাকে ভিতরে না পাঠানোর কারণটা পরে অনুমান করতে পারি যে, হয়তবা আমি ছাত্রলীগের ছেলে বলেই এই উপেক্ষা)। উনারা সব শুনে নির্দেশ দিলেন, সেদিনই আমাকে ঢাকায় Dhaka city Commander of Freedom Fighters হিসাবে নিযুক্ত করে পাঠাতে।

যাই হোক ওম্পিনগরের ট্রেনিংপ্রাপ্ত দশজন—যাদেরকে আমি আগে দেখিনি তাদেরসহ ফারুক আর আমি মোট ১২ জনকে দিয়ে একটা দল তৈরি করে সন্ধ্যাবেলা মনতলীতে ক্যাপ্টেন আইনুদ্দীনের ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়া হল দেশে ঢুকবার জন্য! ক্যাপ্টেন আইনুদ্দীন সেদিন আমার দলের অস্ত্র দেখে একটু অবাকই হয়েছিলেন কেননা আর যারা ওখান দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে গিয়েছিলেন তাদের কাছে আমার চাইতে অনেক উন্নতমানের অস্ত্র ছিল। আমার সেদিনকার অস্ত্র ছিল ১টা Repeat Shot SLR, ৩টা SLR, ৪টা ইণ্ডিয়ান SMC, ৪টা 303 Rifle, কিছু মাইন, গ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভ Phosphorus bomb অথচ সবার কাছেই ১/২টা করে LMG আর অন্যান্য ভাল ভাল weapon ছিল। গিয়াস ৫৬ মি.মি. বেন্ডেসাইড, কাজী ভাই Rocket Launcher, 2´´ Mortar, LMG, আলম Chinese SMG (যেটা একজন মুক্তিযোদ্ধার পরম কামনা বা স্বপ্নে পাওয়া ধনের মতই অস্ত্র ছিল) পেয়েছিল। অথচ আমাকে দেয়া হয়েছিল সবচাইতে কম ক্ষমতাশীল অস্ত্র। (অনেকে ১/২টা পিস্তলও পেয়েছিল)। কারণটা আজও আমার কাছে অস্পষ্ট।

যাই হোক ক্যাপ্টেন আইনুদ্দীন অনুগ্রহ করে আমার দলকে সিএণ্ডবি রোড (তৎকালে এটাই ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার বলে পরিচিত) পার করে দিবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। উনার কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ কেননা উনি সাহায্য না করলে হয়তবা আমার মতো আরো অনেকেরই নিরাপদে বাংলাদেশে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হত। সময়টা সম্ভবত আগস্ট মাসের প্রথম ভাগ। নৌকায় করে দুই দিন দুই রাত্রি চলে অবশেষে তৎকালীন রূপগঞ্জ

থানা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বশীরের তত্ত্বাবধানে আমাদের থাকা আর খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হল। আমরা যখন বাংলাদেশে প্রবেশ করতে রওয়ানা হচ্ছিলাম, তখন কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের একটা ব্রিফিং দেওয়া হয়েছিল। তাতে বিশেষভাবে বলা হয়েছিল যে অনেক ছেলেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রয়ে গিয়েছে, তারা হয়তো সুযোগের অভাবে ভারতে আসতে পারছেনা বা মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং নিতে পারছেনা, সেই সাথে এলাকায় এলাকায় সংবাদ পাওয়া এবং চলাচলের সাহায্য করতে পারবে এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চায় এমন সব ছেলেকে যেন আমরা ট্রেনিং দিয়ে আমাদের সার্বিক স্বার্থে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ব্যবহার করি। আমাদের করণীয় ছিল, যুদ্ধকালীন সময়ে, এমন রিক্রুট ছেলেদের নামের তালিকা তৈরি করে মেলাঘরে সেক্টর হেডকোয়ার্টার-এ হায়দার ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিব। তারাও পরে মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিগণিত হবে।

যাই হোক থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত হবার পর, একজন দুইজন করে ঢাকায় পাঠান আরম্ভ হল। ওদের কাজ ছিল হাইড আউট তৈরি করা, এবং সংবাদ সংগ্রহ করা। ৮/১০ দিন পর আমার জন্য হাইড আউট নির্ধারণ করা হল ঢাকার (ধানমণ্ডি) ভূতের গলি মসজিদের কাছে একটা বাড়িতে। নিরিবিলি জায়গা। ওখানে চলে আসলাম (আমার ধারণা, আশেপাশের ৮/১০টা বাড়ির লোকজন আমাদের কথা জানত। কিন্তু ওরা পাকিস্তানিদের বলেনি। আরম্ভ হল যোগাযোগ। আমার ৮ জন ছেলেকে পূর্বগ্রামে রেখে মাত্র চারজন নিয়ে ঢাকার হাইড আউটে এ আসলাম। ওখানে আসার পর যোগাযোগ হল প্লাটুন-এর হাসানের সাথে। নতুন যোগ দিল মেহমুদ, মান্নান, দুলাল, খালেদ, চিকা ফারুক।

ওখানে ৫/৭ দিন হাইড আউটে থাকবার পর একদিন সংবাদ পেলাম যে প্রতিদিন পাক আর্মির একটা জীপ গ্রীন রোড দিয়ে রাত্রি ১২টা ১টার দিকে ফার্ম গেট-এর দিকে যায়। আমরা বুঝতে পারলাম যে ঐ জীপে সম্ভবত ২/১ জন অফিসার থাকে যাদের কাজ হল জায়গায় জায়গায় যে চেকপোস্ট আছে তার ডিউটি তদারক করা। যেহেতু অফিসার আছে সেহেতু চাইনীজ স্টেনগান থাকবেই। আমার জীবনের একটা স্বপ্ন একটা চাইনীজ স্টেনগানের গর্বিত মালিক হওয়া। অতএব, ঐ জীপটাকে মারতে পারলে হয়ত আমার জীবনের একটা স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। তাই সমস্ত দ্বিধা সংকোচ দূর করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, ঐ রাতেই আমরা action-এ যাব।

সেই মোতাবেক রাত্রি ১১টার সময় আমি, আবদুল্লাহ্, মেহমুদ, মান্নান, দুলাল, ইণ্ডিয়ান ফারুক, খালেদ বেরুলাম। অস্ত্র বলতে ৪টা ইণ্ডিয়ান স্টেন, ১টা Repeat fire SLR, ২টা SLR, আর 'AP 8' মাইন ও কয়েকটা গ্রেনেড। তখন সারা ঢাকায় রাত ৮/৯টা থেকেই কার্ফিউ থাকত। অতএব, আমরা যখন বেরুলাম তখন চারিদিক নীরব নিথর সুমসাম। ২/১টা কুকুর শুধু জেগে আছে। আমরা এসে স্থান নিলাম গ্রীন রোডের মাঝামাঝি জায়গায় যেখানে বর্তমানে একটি হোটেল (তখন সেটা মাত্র ১ তলার ছাদ ঢালাই হয়ে লিন্টেল লেভেল অর্থাৎ দুইতলা পর্যন্ত ইটের গাঁথুনী ছিল) বর্তমান চায়না গার্ডেন চাইনিজ রেস্টুরেন্টের উল্টাদিকে ঐ একতলা বিল্ডিং এর ছাদে পজিশন নিলাম।

একতলা ছাদ হতে নীচের ফুটপাথ মাত্র কয়েক হাত নীচে অবস্থিত। সবার পজিশন নেওয়া হলে আমি ডব্লিউ শেপ আকারে ১৬টি 'AP 8' মাইন গ্রীন রোডে পেতে রাখলাম। তাড়াহুড়ায় পিন খোলার কথা মনে ছিল না। W আকারের booby trap তৈরি করে ছুটে ছাদে এলাম। মেহমুদের দায়িত্ব ছিল আমার ইঙ্গিত পাওয়ার পর গ্রেনেড ছোড়ার।

কিছুক্ষণ পর দেখলাম সাইন্স ল্যাবরেটরীর দিক থেকে দুটো হেড লাইনের আলো দ্রুত এগিয়ে আসছে। রাস্তা ফাঁকা। ওটা ছিল জীপ। ঝড়ের গতিতে, ৬০/৭০ মাইল বেগে আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। আমরা সবাই হতবাক। এমনি সময় হঠাৎ মনে হল মাইনগুলোর পিন খোলা হয়নি। আবার অন্ধকারের মধ্যে মান্নানকে সাথে নিয়ে দৌড়ে গেলাম পিন খুলতে। তখনকার সেই উত্তেজনা আর বুকের ভেতর ধুকপুক আওয়াজ আজো মনে হয় শুনতে পাই। যাইহোক পিন খোলার কাজ প্রায় শেষ করে এসেছি, এমন সময় দূরে আবারো দুটো হেড লাইটের আলো। (এদিকে, আমরা পজিশন নেবার আগে গ্রীনরোডের ২ জন বিহারী নাইটগার্ডকে হাত পা বেঁধে ঐ ছাদের উপর আটকে রেখেছিলাম)। যাইহোক আলো দেখে পড়িমরি ছুটে এসে আবার পজিশন নিলাম। গাড়ি এসে পড়ল। অন্ধকারে ঠাওর করতে পারিনি কী গাড়ি ওটা। এসেই সামনের একটা চাকা মাইনের উপর পড়তেই গাড়ি ঘুরে গিয়ে সোজা আমাদের বরাবর এগিয়ে আসতে লাগল। এদিকে আমি কিছু বলার আগেই মেহমুদ গ্রেনেড ছুড়ে দিয়েছে। আমাদের ভাগ্য অত্যন্ত ভাল, গাড়িটা ছিল বেডফোর্ড ট্রাক। যার ড্রাইভারের কেবিনের উপর দিয়ে ছিদ্র থাকে। ওখানে মাথা বের করে একজন আর্মি এলএমজি নিয়ে দাঁড়াতে পারে। গ্রেনেডটা পড়বিতো পর, একদম ঐ ছিদ্র দিয়ে ড্রাইভারের কেবিনে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। একদিকে মাইন, অপরদিকে গ্রেনেড।

গাড়িটা ঘুরে গিয়ে আমাদের দিককার ফুটপাত টপকে বিল্ডিংএর একটা দেয়াল ভেঙে থেমে যায়। আমাদের সাথে আর্মিদের আক্ষরিক অর্থে দূরত্ব মোটে ৩/৪ হাতের। স্টেনের ব্রাশ। শুধু একটা আর্তনাদ কানে এল দারোয়ানের। এটা শেষ করতে না করতেই আরেকটা আলো অসম্ভব গতিতে এগিয়ে আসছে। ওরা পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছিল। মাইনের উপর পড়ে ৮/১০ বার উল্টে পাল্টে আমাদের দিক থেকে দূরে গিয়ে পড়ল। ওটার এমনিতেই পঞ্চত্ব লাভ হয়েছিল। এর পর পরই আরেকটা ট্রাক। কিন্তু ওটা না এসে আমাদের থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে থেমে রাস্তার উল্টাদিকের ড্রেন আর ট্রাকের আড়ালে মিলিটারীরা পজিশন নিল। সমস্ত ঘটনাটা ঘটতে আমার মনে হয় ১ মিনিট সময়ও লাগেনি। যাই হোক এবার প্রতিরোধ শুরু হল। আমাদের গুলির ভাণ্ডার নিঃশেষিত প্রায়। পালানোর অর্ডার দিতেই, আগেই ঠিক করে রাখা রাস্তায় পিঠটান।

সেই গোলাগুলি আর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সমস্ত এলাকাই জেগে গিয়েছিল। আমরা যখন ভূতের গলির ভিতর দিয়ে পালাচ্ছি ২/৪ জন লোক আমাদের দেখে ফেলে আর পালানোর রাস্তা দেখিয়ে দেয়। হাইড আউটে পৌছেই সবাইকে পালানোর জন্য তৈরি হতে বলে আর্মসগুলো লুকানোর জন্য গেলাম। কেননা এই এলাকা থেকে এগুলো নিয়ে এখন বের হওয়া সম্ভব নয়। আমার হাইড আউটের পিছনে কচুরীপানায় ভর্তি একটা

ডোবা ছিল। তাতে পলিথিনে জড়িয়ে একটা চিহ্ন রেখে আর্মসগুলো dump করে দিলাম। এরপর সবাইকে যার যার রাস্তায় পালাতে বললাম আর ২/৩ দিনের মধ্যে পূর্বগ্রামে বশীরের কাছ থেকে আমার ঠিকানা নেবার জন্য বলে দিলাম।

তারপর নানান লোকের বাড়ির দেয়াল টপকে, গলিঘুপচি হয়ে শাহবাগ চলে এলাম। তখন আজকের শাহবাগ বিপনী কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলছিল। শেষ রাতটুকু লেবারদের সাথে কাটিয়ে সকালবেলা অফিসযাত্রী লোকজন চলাচল আরম্ভ হতেই ওদের ভিড়ে মিশে বাসে করে ডেমরা ওখান থেকে নৌকায় পূর্বগ্রাম। কী করেছি, কতজন মেরেছি কিছুই জানিনা। শুধু জানি আমার কাঙ্ক্ষিত স্টেনগানটা পেলামনা। যাইহোক ঐ দিন রাত্রিবেলা বিবিসির বাংলা সংবাদে জানতে পারি যে, ২ জন কর্নেল, ২ জন মেজর, ১ জন ক্যাপ্টেনসহ ২৩ জন নিহত, ৪২ জন আহত। ২টা ট্রাক আর ১টা জীপ ধ্বংস। আমার নিজের করা অপারেশন। বিশ্বাস হচ্ছিল না ফলাফল শুনে। সেদিনই ধারণা হল বিবিসি কত prompt. পরে লোকমুখে জানতে পাই যে, পরদিন সমস্ত দিন গ্রীন রোডে কারফিউ ছিল।

Fire Brigade-এর লোকজন রাস্তা ধোয়া মোছার কাজ করেছে আর ক্রেন দিয়ে গাড়ি তুলে trailor করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই অপারেশনটা আমাদের ভুলক্রমিক চিন্তাধারার মধ্যেও ছিল না। গেলাম কেন, হলটা কী!

পূর্বগ্রামে ফিরে আসবার ২/৩ দিনের মধ্যে আমার গ্রুপের সবাই ফিরে এল। ঢাকায় আর্মস ফেলে আসাতে আমার আর্মস সর্টেজ দেখা দিল। ইতোমধ্যে কাজী ভাইয়ের গ্রুপের জুয়েল, বদি এরা মারা যাওয়াতে, আর আমার কৃতকার্য্যতার সংবাদে কাজী গ্রুপের বাকি সদস্য যারা গ্রামে ছিল তাদের উপর নির্দেশ এল আমার গ্রুপে যোগ দেবার জন্য। তখন রশীদ তৈয়ব আলী (বীর প্রতীক) সবাইকে নিয়ে এবং তাদের বাকি অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আমার গ্রুপে যোগ দেয়। ফলে আমার লোকবল এবং অস্ত্রবল বেশ কিছুটা বেড়ে গেল। তবুও আবার ভারতে যাওয়ার প্রয়োজন হওয়াতে ফিরে গেলাম।

আমার কৃতকার্য্যতায় (গ্রীনরোড অপারেশন) তখন সবাই খুশি। এবার আমার সাথে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর এক সেকশন (১০ জন) সিপাহীসহ ৮১ মি.মি. মর্টার ও ১০০টি শেল, ২টা এলএমজি, ও প্রচুর এ্যামুনিশন দেয়া হল। যেদিন দেশে ফিরব সেদিন ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিনের ক্যাম্পে গিয়ে দেখি ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার মহকুমাতে যাওয়ার জন্য ৫০০/৬০০ ছেলে উপস্থিত। ওদের সাথে আমাকেও একই সাথে সিএন্ডবি ক্রস করতে হবে। তখন খুবই কড়াকড়ি। অবস্থা বেগতিক দেখে আইনুদ্দিনকে অনুরোধ জানালাম আমাদের সবাইকে অন্তত ২ ঘণ্টা আগে একা গাইড দিয়ে পাঠিয়ে দিতে। উনাকে সমস্ত অবস্থা পর্যলোচনা করে বুঝানোর পর উনি আমার যুক্তিতে আমার সাথে একমত হন এবং আমাকে বাকি সবার আগে রওয়ানা করিয়ে দেন। আমরা যখন প্রায় সিএণ্ডবির কাছাকাছি তখন ফরিদপুর এবং ঢাকার ৫০০/৬০০ ছেলে নৌকায় যাত্রা করেছে।

নীরব নিঝুম রাত্রিতে ৫০/৬০টা নৌকা একত্রে সিএণ্ডবির দিকে রওয়ানা হয়েছে। ওদের ফিসফিস কথা আর দাঁড় বাওয়ার আওয়াজ অনেক দূর থেকেই আমরা শুনতে

পাচ্ছিলাম। ঠিক এমনি সময় আমরা দেখলাম কয়েকটাক গাড়ি কুমিল্লার দিক থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছে। পিছনের ওরা খেয়াল করেনি। কিন্তু পাক আর্মি ঠিকই বুঝতে পেরে তাদের হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে অগ্রসর হতে থাকে। আমাদের তখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে আমরা ১৫ জন নিঃশব্দে নৌকা থেকে নেমে সাঁতরে নৌকা টেনে ব্রীজের নিচে নিয়ে পার হয়ে প্রায় ১০০ গজ দূরের পাটক্ষেতের মধ্যে ঢুকে যাই। পাক বাহিনীর কোনো দিকেই মনযোগ ছিল না। ওরা এসে ব্রীজের উপর পজিশন নিল। কয়েকটা গাড়ি ব্যাক করিয়ে ঘুরিয়ে ফরিদপুরের ছেলেরা যেদিক থেকে আসছিল, সেদিকে মুখ করে একসাথে সব হেড লাইন অন করে ফায়ার ওপেন করল। সাথে সাথেই নরক গুলজার। কর্ডাইটের গন্ধ, ছেলেদের আর্ত চিৎকার সমস্ত রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দেয়। এই এম্বুশে আমাদের ২০/৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়। প্রায় ১০০-এর মত আর্মস আমাদের নষ্ট হয়। তারপর অনেকদিনের জন্য সিএণ্ডবি বর্ডার বন্ধ হয়ে যায়। মেলাঘরে সবার জন্য গায়েবানা জানাজা পড়ান হয়েছিল। সবাই মনে করেছিল আমার গ্রুপও ঐ এম্বুশে শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই আমাদের নামেও গায়েবানা জানাজা পড়া হয়। অবশ্য সেদিন ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিন যদি আমায় সাহায্য না করতেন বা আমাদের আলাদাভাবে পাঠানোর বন্দোবস্ত না করতেন তবে পরিস্থিতির চেহারা হয়তবা অন্যরূপ হতে পারত। সেজন্য উনার কাছে আমি আজো কৃতজ্ঞ।

দেশে ফিরে আসবার পর ইছাপুরার গড়ে আমার ক্যাম্প বানালাম। এরপর থেকে ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হতে থাকল। হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ এল আব্বাস, লতিফ, সালাহউদ্দিন, ডেমরার আউয়াল, রূপগঞ্জের পিনু, জয়নাল এরা আমার সাথে পরামর্শ করে সব কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এরপর মেলাঘর গিয়ে তৈয়ব আলী এক সেকশন ছেলে নিয়ে এল। ওকে আলাদা ক্যাম্প করে থাকবার নির্দেশ দিলাম। এল বাবলা, কাইউম। ওদেরকেও আলাদা করে দিলাম। যাই হোক, তবুও নিজস্ব chain of command প্রতিষ্ঠিত করলাম। ফলে ইছাপুরা আর গুলশানের মাঝখানে একটা বড় বিল পাক আর্মি আর মুক্তিবাহিনীর বর্ডারে পরিণত হল।

ইতিমধ্যে আমার ৪র্থ বেঙ্গলের ছেলেরা (ল্যান্স নায়েক হেফজুল বারী সেকশন কমাণ্ডার ছিলেন) তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল :

১. বাড্ডা থেকে ৮১ মি.মি. মর্টার দিয়ে ঢাকায় তেঁজগা এয়ারপোর্ট-কে লক্ষ করে ১৬টা শেল মারা হয়, কিন্তু শেলগুলো এয়ারপোর্ট-এ না পড়ে কলেরা হসপিটাল আর মহাখালীর আশে পাশে পড়ে।
২. ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট-এ ঐ মর্টার থেকে একদিন শেলিং করা হয়। শেলগুলো ক্যান্টনমেন্ট মসজিদের আশে পাশে পড়ে। এতে পাক আর্মির উপর মানসিক ভাবে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়।
৩. ঈদের দিন সকালবেলা রামপুরা টেলিভিশন টাওয়ার লক্ষ করে ২০টা শেল নিক্ষেপ করা হয়। এতে রামপুরা টেলিভিশন মসজিদের ইমাম সাহেবসহ ৩ জন লোক মারা যায়।

৪. মুরাপাড়ায় গাউসিয়া জুট মিলের আর্মি ক্যাম্প ধ্বংস হয়।
৫. কাঞ্চনের এলিট জুট মিলের আর্মি ক্যাম্প ধ্বংস করা হয়।

ফলশ্রুতি ছিল, ঠিক ঢাকার ২/১ মাইল এলাকার মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অবস্থান সুসংহত করতে পেরেছে, আর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে এখন মোটামুটি মানের মাঝারী ভারী অস্ত্র আছে— এই প্রচারণা পাক আর্মিকে দেশে এবং বিদেশে বেশ বেকায়দায় ফেলে দেয়।

একদিন গুলশান থেকে এক ভদ্রলোক ইছাপুরা বাজারে এসে আমাকে জানায় যে জাপানের কনসাল জেনারেল ২/১ জন লোক নিয়ে আমাদের অবস্থা পরিদর্শন করে দেখতে চান। এতে আন্তর্জাতিক ফোরামে আমাদের অনেক সুবিধা হবে। আমি উনাকে নিয়ে আসবার অনুমতি দেই। অবশ্য ঐ লোকের কথার সত্যতা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাই উনারা যে পথে ইছাপুরায় আসবেন, তাতে আমি সতর্কতামূলক প্রহরার বন্দোবস্ত করেছিলাম। যাইহোক পরদিন ১১টার দিকে যথারীতি ২ জন সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যানসহ জাপানী কনসাল জেনারেল এলেন আমাদের দেখতে। আমি উনাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের সব অবস্থান দেখালাম। উনাদের বেশ কিছু প্রশ্ন, যেমন : কেন এই যুদ্ধ, যদি জিতি কী হবে, হারলে কী হবে, জেতার জন্য আমরা কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারব, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তারা রেখেছিলেন। পরে বাজারের দোকানদার এবং অন্যান্য লোকের সাথে তারা মতামত বিনিময় করেন। অবশেষে যাবার সময় কনসাল জেনারেল ভদ্রলোক আমাকে ১০ মাইল রেঞ্জ-এর দুটি ওয়াকী টকী ও একটি বাইনোকুলার উপহার দিয়ে যান। এগুলো পরবর্তীতে আমাদের অনেক উপকারে আসে।

* এরমধ্যে একদিন মাঝির ছদ্মবেশে দুই আলী আকবর (আমাদের দুজন আলী আকবর ছিল। এরা দুজনেই) দুজন আর্মিকে চনপাড়ায় মেরে তাদের কাছ থেকে দুটা আর্মস উদ্ধার করে।
* ফারুক, মিলু মুরাপাড়ায় এ্যাম্বুশ করে ৬ জন আর্মিকে মারে।
* আলমকে (আমার গ্রুপের আলম, হাবিবুল আলম না) একটা গ্রুপ দিয়ে টঙ্গী জয়দেবপুরের দিকে পাঠাই। তারা বোর্ডবাজারে একটা সফল এ্যাম্বুশ করতে সমর্থ হয়। ওখানে আমার গ্রুপের একটা ছেলে মারা যায়। পরবর্তীতে গ্রামের লোকেরা সেখানে ঐ ছেলের নামে একটা রাস্তার নাম রাখে।

হাসান সাংহাই চাইনীজ রেস্টুরেন্টে (ফার্মগেটের উত্তর পার্শে এয়ারপোর্ট বোর্ডের পশ্চিম দিকে) ডিনার খাবার সময় গ্রেনেড হামলা চালায় তাতে ২ জন পাক আর্মি মারা যায়।

কোরবানী ঈদের দুইদিন পর পাক আর্মির প্রায় ৩০০ সেনা দলবেধে বেরাইদ গ্রাম আক্রমণ করে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ করে। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সংঘর্ষে ওরা ৩ জন আর্মির লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষ করে, আমার এতদিনকার অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারি যে, যেহেতু ওরা মার খেয়ে ফিরে গেছে, সেহেতু

ওরা প্রতিশোধে যাবেই। অতএব আগামীকাল ওরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে পাল্টা আঘাত করবার জন্য আসবেই। তাই সবাইকে বেরাইদ গ্রামে রহমতউল্লার বাড়িতে জমায়েত হবার জন্য নির্দেশ দিলাম। সবাই আসতে আসতে রাত ৮টা বাজল।

আমাদেরকে পাক আর্মি তিনদিন থেকে আক্রমণ করতে পারত। একটা দিক ছিল গান বোট নিয়ে ডেমরার দিক থেকে এসে। তাই ঐ দিকটার দায়িত্ব দিলাম রশীদের উপর। ওকে রকেট লঞ্চার, এনার্গা আর চারটা এলএমজিসহ পাঠালাম কায়েতপাড়া হাটের আশে পাশে ডিফেন্স নেবার জন্য। ওকে একটা ওয়াকি টকি সেটও দিয়ে দিলাম যাতে প্রয়োজনে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

লতিফ আর আব্বাসকে দায়িত্ব দিলাম ইছাপুরা বাজার রক্ষা করবার। কেননা খিলক্ষেত থেকে (ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন এর পাশে) একটা রাস্তা সোলমাইদ ডুমনি হয়ে ইছাপুরা বাজারের উল্টাদিকে বালু নদীর পাড়ে শেষ হয়েছে। ঐ ঘাট থেকে নৌকায় নদী ক্রস করতে পারলেই পাক আর্মি কোনোরূপ বাধা ছাড়াই ইছাপুরার গড় এলাকায় অবস্থিত আমাদের ক্যাম্প দখল করে নিতে পারবে। অতএব কেউ যদি শুধু নদীর ঘাট দখল রাখতে পারে তবে ওদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হবে না। তাই লতিফ আর আব্বাসকে ঐ ঘাটের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালাম। অবশ্য আমি ঐ ঘাটটাকে গুরুত্ব দেই নাই আর ঘুণাক্ষরে কল্পনাও করতে পারি নাই যে, খিলক্ষেত দিয়ে ওরা আসতে পারে। এই চিন্তাধারাটাই ছিল আমার জীবনের চরম ভুল সিদ্ধান্ত (যাই হোক, সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি)।

আর আমি নিজে মায়াসহ প্রায় ৫০/৬০ জন বেরাইদ ডিফেন্স নেবার জন্য থাকলাম। রাত্রিবেলা বেরাইদের সামনে আমরা ট্রেঞ্চ তৈরি করে আমাদের পাকা ডিফেন্স নিলাম। সারারাত্রির তদারক কাজ আর ছুটোছুটিতে ক্লান্ত হয়ে রাইফেল মাথায় দিয়ে ট্রেঞ্চ এর ভিতর কখন ঘুমিয়ে গেছি বলতে পারব না। ভোরবেলা আকাশ একটু ফর্সা হয়েছে কী হয়নি এমন সময় সেন্ট্রী আমাকে জাগিয়ে ডুমনির দিকে দেখাল। অবাক হয়ে গেলাম ডুমনিতে আগুন দেখে। হঠাৎ কিছু গোলাগুলি। বুঝলাম, রাত্রিতেই পাক আর্মি খিলক্ষেত দিয়ে এসে ভোর হতে না হতেই চলে এসেছে। বুঝলাম আমাদের পরাজয় হয়েছে (পরে শুনেছিলাম লতিফ, আব্বাস ওরাও সন্দেহ করেছিল যে হয়ত এপথে আর্মি আসবে না, তাই মাত্র ২/৩ জন নর্মাল সেন্ট্রী ঘাট পাহারায় রেখে তারা ক্যাম্প-এ চলে গিয়েছিল। তাই ঐ ২/৩ জন পাক আর্মির অতর্কিত আক্রমণের প্রতিউত্তর না দিয়ে একজন আহতকে নিয়ে পালিয়ে যায়)। আমি ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে বিমূঢ়। এরমধ্যে ওয়্যারলেস জীবন্ত হয়ে উঠল। রশীদরা জানতে চাচ্ছে ঘটনা সম্পর্কে। ওদেরকে বললাম কায়েতপাড়া থেকে নাওয়া, ছনি দিয়ে ঘুরে পিছন দিক দিয়ে যেন আমাদের ক্যাম্পে চলে আসে। এই নির্দেশ দিয়ে আমার সাথের সবাইকে নিয়ে দৌড়ে বেরাইদের নৌকা ঘাটে এলাম। কিন্তু কোথাও কোনো নৌকা নেই। কী আর করা, হাচরে পাছরে সাঁতার কেটে বালু নদী পার হয়ে ছনি, ওখান থেকে ঘুরে আমার ক্যাম্পের দিকে। অনেক কষ্টে ক্যাম্পের পিছনের টিলায় গিয়ে দেখি আমার ক্যাম্প-এর ছেলেরা ওখানে অবসন্ন ক্লান্ত। আর আমার ক্যাম্প জ্বলছে।

একটু বিশ্রাম নিতে নিতেই সবাই জমায়েত হলে আরম্ভ হল প্রতি আক্রমণ। আমাদের সবচাইতে বড় সুবিধা ছিল আমরা সবাই ঐ এলাকার সমস্ত পাহাড়, গাছ জংলার আনাচ কানাচের সাথে পরিচিত আর ওরা এ এলাকা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। লুকোচুরি খেলার মতই খেলা চলছে। গাছের ঝোপের আর জংলার আড়ালে আবডালে লুকিয়ে লুকিয়ে চোরাগুপ্তা আক্রমণ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যা ৭ টার সময় দেখা গেল ওরা ফিরে গেছে, রেখে গেছে ১৫টি লাশ, সাথে আরো ৪টি মুক্তিযোদ্ধার লাশ। আমাদের আহত ৭ জন, মৃত ৪ জন। এর মধ্যে ৩ জনকে হত্যা করেছে পাক আর্মি। ওরা একটা কবরের ভিতর আশ্রয় নিয়েছিল। সে অবস্থায়ই আমাদের ৩ জন ছেলেকে গুলি করে মারে। তারপর সেই কবরের উপর হয়েছিল গ্রেনেড বৃষ্টি। ওদের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত কাপড় চোপড় লাগা কিছু মাংশপিণ্ড ছাড়া আর অবশিষ্ট কিছুই ছিল না। আর আরেকজন মারা যায় লুকোচরি খেলতে গিয়ে ওদের সামনাসামনি ধরা পড়ে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ঢাকার ছেলেদের একদিনে এতবড় ক্ষতি একসাথে আর হয়নি। যখন সব শেষ হল তখন আমরা যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত।

এভাবেই দিনের পর দিন আমরা আমাদের অবস্থানকে করেছি সুসংহত, আর হয়েছি সংগঠিত। আমাদের আক্রমণের তীব্রতাও বেড়েছে অনেক। ফল হয়েছে পাক বাহিনীর সৈন্যরা আর যখন তখন বাজারে আসেনা লুটপাট করার জন্য। ওদের পক্ষে আগের মতো যেখানে সেখানে চলাচল হয়ে উঠল বিপদজনক। সময়টা অক্টোবরের শেষ দিক। চারদিক থেকেই সংবাদ আসছে একের পর এক আমাদের সফলতার। ওরা শুধু থানার বাউণ্ডারীর মধ্যে ওদের নিজেদের আবদ্ধ করে ফেলল। একের পর এক এলাকা মুক্তাঞ্চল বলে ঘোষিত ও বিবেচিত হচ্ছে। আমাদের জয়ধ্বনি তখন চতুর্দিকে। আমরা আশা করছি আর হয়তবা ৫/৬ মাসের মধ্যে ওদের ক্যান্টনমেন্টগুলো বাদে বাকি সব জয় করে নেব। ঠিক এমনি একটা অবস্থার যখন মুখোমুখি তখনই ৩রা ডিসেম্বর ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এটা ছিল সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত। আমাদের প্রায় জিতে আনা যুদ্ধ জোর করে আর কেউ আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিল।

৩রা ডিসেম্বর থেকে আমাদের আর কিছুই করবার থাকল না। শুধু ৭ই ডিসেম্বর নাসিরাবাদ গ্রামে পাক আর্মির সাথে আমাদের শেষ সম্মুখ যুদ্ধ হয়। ৭ ঘণ্টার যুদ্ধে আমাদের ১ জন নিহত ও ৩ জন আহত হয় ওদের ২২ জন নিহত। সেদিনকার যুদ্ধে তৈয়ব আলীর performance was rather heroic.

৮ই ডিসেম্বর রশীদকে দিয়ে ৮১ মি.মি. মর্টার পাঠালাম মেঘনার কাছে বৈদ্যের বাজারে, পাক আর্মির বাঙ্কারগুলো উড়াবার জন্য। ১৩ই ডিসেম্বর নরসিংদীর পতনের পর টিএণ্ডটি অফিসে গিয়ে মেজর হায়দার ভাইয়ের সাথে দেখা করি। উনি আমাকে ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। সাবেগ সিং আমাকে সাথে নিয়ে ইণ্ডিয়ান আর্মি হেলিকপ্টার এ করে আগরতলায় ৯১ বিএসএফ হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যান। ১৪ই ডিসেম্বর আমরা ফিরে আসি রূপসীতে হেলিকপ্টারে করেই।

সাবেগ সিং আমার ক্যাম্পে গিয়ে আমার ছেলেদের সাথে কথাবার্তা বলেন। দুপুরে আমাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করার পর আমাকে সাথে নিয়ে তারাবোতে যেখানে

ইণ্ডিয়ান আর্মি তাদের ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেন্ট স্থাপন করেছিল সেখান থেকে একটা ১২০ মি.মি. মর্টার ১০ জন ইণ্ডিয়ান আর্মিসহ আমার কমান্ডে দিয়ে দেন। নির্দেশ ছিল ঐ গান দিয়ে আমরা ঢাকা এয়ারপোর্ট এ শেলিং করব। ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলা নাসিরাবাদ ক্যাম্প-এ এলাম ওদের নিয়ে। ভোর বেলা নাসিরাবাদ হাইস্কুল প্রাঙ্গণে ঐ ১২০ মি.মি. মর্টার বসাই। হায়দার ভাইয়ের নির্দেশ ছিল, উনি না বার্তা পাঠানো পর্যন্ত কোনো গোলা না ছুড়ি। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে থাকলাম। ২ টার দিকে সংবাদ পেলাম যুদ্ধ শেষ। পাক আর্মি সারেণ্ডার করতে যাচ্ছে। ঐ মর্টার গুটিয়ে নিয়ে ইণ্ডিয়ান আর্মির ১০ জনকে একজন গাইড দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ডেমরাতে নৌকাযোগে।

যুদ্ধ শেষ। হঠাৎ এ সংবাদে আমার সমস্ত চেতনা অবলুপ্ত। আমি নির্বাক। সমস্ত চিন্তাশক্তি হঠাৎ রহিত। এটা কেমন হল, কেন হল? হাজারো প্রশ্ন। জবাব নেই। সব ছেলেরা নাসিরাবাদ হাইস্কুল মাঠে লাইন করে এসে দাঁড়াল। সবাই উল্লসিত। তারা গাজী, তারা বিজয়ী। তারা স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছে। এতদিন স্বজনহারা। আজ সুযোগ এসেছে স্বজনের মাঝে ফিরে যাওয়ার। তাই ওদের এত উচ্ছ্বাস। সবাই যার যার জিনিস নিয়ে লাইনে দাঁড়ানো। শুধু আমি নির্বাক। ওদের এই আবেগ আর উচ্ছ্বাস আমাকে মোটেও স্পর্শ করতে পারে নাই। আমার বড় ভাই রউফ, টুআইসি রশীদ, আলম, এবাদ একে একে সবাই এসে ঢাকায় যাবার জন্য অনুরোধ জানাল ওদের সঙ্গে। আমার উত্তর ছিল, না, তোমরা যাও। একসাথে থেকো, ভাইকে বললাম, আম্মাকে বলে যেও তোমরা কোথায় ক্যাম্প করেছ।

মামা রহমতউল্লা আমার সাথে থেকে গেল। একে একেই সবাই লাইন করে আমার কাছে থেকে বিদায় নিল। আমি আর রহমতউল্লাহ শুধু বসে আছি সেই পড়ন্ত বিকেলে। কাঁদছি, আমি কাঁদছি অঝোরে। রহমতউল্লাহর প্রশ্ন, মামা, আজ সকলে আনন্দ উল্লাসে মাতোয়ারা, আর তুমিই শুধু কাঁদছ, কিন্তু কেন মামা, কেন? আমি নির্বাক। ও বারে বারে আমায় জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। তার প্রশ্নের জবাবে শুধু বলতে পেরেছিলাম, 'মামা, আমার মনে হয় এই সমাপ্তিটা ভাল হলনা মামা। সেই দিন বুঝতে পারিনি আমার কথার অর্থ। আজ বুঝতে পারি, মানুষের অবচেতন মন বলে একটা মন আছে। সেটায় সবসময় মানুষ অজান্তে আগাম ভালমন্দ সংবাদ জানতে পারে। যার আত্মার বিশুদ্ধতা আছে সে অনুধাবন করতে পারে। আর যে পাপী সে বুঝতে পারে না। আমিও পাপী। সঠিক অনুধাবন করতে পারিনি কিন্তু অবচেতন মন ঠিকই জানান দিয়েছিল।

আমাদের গুটিয়ে আনা যুদ্ধটা যদি কেউ শেষ না করে দিত হয়তবা আরও ২/১ বৎসর সময় বেশি লাগত। ২/৩ বৎসর কষ্ট বেশি হলে জাতিগতভাবে ত্যাগ আর ক্ষতি বেশি হত। তাই স্বাধীনতার মূল্যায়নও হয়তবা হত অন্যভাবে। কেননা আমাদের জাতিগতভাবে যে ত্যাগ তিতিক্ষার প্রয়োজন ছিল, একটা স্বাধীনতার জন্য হয়তবা ততটুকু ত্যাগ আমরা স্বীকার করবার সুযোগ পাইনি। স্বপ্নের ঘোরেই যেন সব হয়ে গেল। তাই আমরা আজ উপেক্ষিত।

যুদ্ধ শেষ। আরম্ভ হল চক্রান্ত। মুক্তিযোদ্ধাদের ইমেজ নিয়ে আরম্ভ হল ছিনিমিনি খেলা। সমস্ত যুদ্ধকালীন অবস্থায় গ্রামের মানুষ যখন চোর ডাকাতের ভয় ভীতি উপেক্ষা

করে দরজা খোলা রেখে ঘুমাতে পেরেছে নিরূপদ্রবে, শান্তিতে সে জায়গায় স্বাধীনতার পর আরম্ভ হল লুটপাট। পাক আর্মির রাস্তায় রাস্তায় ফেলে যাওয়া আর্মস সেই কাজে সাহায্য করল। সুপরিকল্পিতভাবে এই লুটপাট কারা করাল, নাম হল মুক্তিযোদ্ধাদের। সুন্দর ভাবে লেপন করা হল কালিমা আমাদের চরিত্রের উপর।

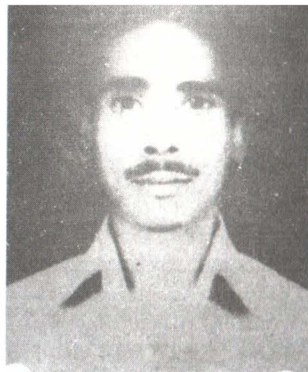
ডিসেম্বরের শেষ দিকে জোনাকী সিনেমা হলে পুলিশ, আর্মি, স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি আর মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয়ে হল একটা কনফারেন্স, নীতিমালা প্রণয়নের জন্য। বিরোধীতা করলাম। কেননা যারা নীতি নির্ধারণ করতে এসেছেন বেশিরভাগই পাকিস্তানের চাকরি করেছিলেন যুদ্ধের সময়, অতএব তাদের নীতি নির্ধারণীতে আমার কোনো আস্থা জন্মায়নি বলে প্রতিবাদ করে বেরিয়ে আসি। সাথে সাথে হায়দার ভাইসহ অন্য মুক্তিযোদ্ধারাও বেরিয়ে আসে। পরে দেখলাম এক/দেড় লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার পরিবর্তে ১১ লক্ষ সার্টিফিকেট বিতরণ করা হল। এটাও ছিল সুপরিকল্পিত একটা ষড়যন্ত্র।

বঙ্গবন্ধু ফিরে আসবার পর ৩১শে জানুয়ারী অস্ত্র সর্ম্পণ করবার শেষ সময়সীমা নির্ধারণ করা হল। বঙ্গবন্ধু বিএলএফ এবং কাদেরীয়া বাহিনীর আর্মস নিলেন। কিন্তু কোনো মুক্তিযোদ্ধা উনার কাছে আর্মস সারেণ্ডার করবার সুযোগ পেল না। হায়দার ভাইসহ আমরা সবকিছু দেখলাম। হায়দার ভাই বললেন, মুক্তিযোদ্ধাদের রিকগনিশন প্রয়োজন। যেভাবেই পার বঙ্গবন্ধু থেকে রিকগনিশন আদায় কর।

গেলাম মিন্টু রোড। বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন আর্মস জমা দিয়েছি কিনা। আমি বললাম কার কাছে দেব? তখন কর্নেল শফিউল্লাহ সাহেব ওখানে উপস্থিত ছিলেন। উনি শফিউল্লাহ সাহেবের কাছে আর্মস জমা দিতে বললেন। অস্বীকার করে বললাম, আপনাকে জাতির জনক স্বীকার করে আপনার ডাকে অস্ত্র হাতে নিয়েছি, অতএব অস্ত্র সমর্পণ করতে হলে আপনার কাছেই করব, অন্যথায় নয়। উনি সময়ের অভাবসহ অনেক অজুহাত দেখালেন। আমি কিছুতেই মানিনি। অবশেষে ৩১শে জানুয়ারি বিকেল ৩টার সময় বাসাবো মাঠে উনি এলেন। উনার পায়ের কাছে অস্ত্র নামিয়ে রেখে অস্ত্র সমর্পণ করলাম। আমার গ্রুপের পক্ষ থেকে। মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে শুধু আমার আর্মসই বঙ্গবন্ধু নিজে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেটাই বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি স্বীকৃতি।

এরপর আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্য একটা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৩ই ফেব্রুয়ারি হায়দার ভাইসহ ডা. জাফরুল্লার সভাপতিত্বে ইস্কাটন লেডিস ক্লাবের অনুষ্ঠিত হল মুক্তিযোদ্ধাদের এক সভা। আনুমানিক ৪০০/৫০০ ছেলের উপস্থিতিতে মাহমুদ হাসান ও নজরুলকে যথাক্রমে আহবায়ক ও যুগ্মআহবায়ক করে ১১ সদস্যের এক কমিটি তৈরি হল (যাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম)। নাম দেয়া হল বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। যার কার্যক্রম হবে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

(আ-বুক দেশপ্রেমের এই অমিত বিক্রমী যোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, বীর প্রতীক ৯ই অক্টোবর ১৯৯৯ সালে ইন্তেকাল করেন।)



মোহাম্মদ সামসুদ্দিন, বীর প্রতীক

১৯৪৭ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার পিতার নাম আজগর আলী, তিনি কৃষিকাজ করতেন। মাতা লাবনী খাতুন একজন সাধারণ গৃহিণী ছিলেন। আমরা মোট তিন ভাই, এক বোন। সবার মাঝে আমার স্থান চতুর্থ।

বিষ্ণুপুর প্রাইমারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর ১৯৫৯ সনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মিরামানি পলিটেকনিক একাডেমিতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হই এবং ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করি। তারপর কর্মহীন ছিলাম।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার পূর্বে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে গ্রামের ছেলে গ্রামেই থাকতাম। মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মেছি বলে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ না পেয়ে কিছু একটা করে ভবিষ্যতের জীবিকা নির্বাহের আশায় তৎকালীন মহকুমা শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বড় ভাই এর নিকট মটর ড্রাইভিং শিক্ষার প্রায় শেষ মুহূর্তে ডাক পড়ল রক্তক্ষয়ী সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের। আমি আওয়ামী লীগের সমর্থক এবং গ্রাম পর্যায়ের কমিটির একজন সদস্য ছিলাম।

পরিবারের অন্য কেউ প্রত্যক্ষভাবে হাতিয়ার তুলে না নিলেও বর্ডার এলাকায় বাড়ি ছিল বলে সবাই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিভিন্ন কাজে কর্মে সহায়তা করতো। যদিও আমি রাজনীতি সমন্ধে কিছুই বুঝতাম না তবুও স্বাধীনতার সংগ্রামে সাড়া না দিয়ে চুপ করে বসে থাকার মত কাপুরুষতা হয়ত সেদিন আমার মধ্যে ছিল না। তাই আমি স্বাধীনতাকামী জনতার সারিতে মিশে যাই এবং সংগ্রামী জননেতাদের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনে বাধ্য হই।

এই মুহূর্তে আমি আমার একটি স্মরণীয় দিনের কথা উল্লেখ না করে পারলাম না। দিন তারিখ মনে পড়ে না তবে যতটুকু স্মরণ হয় এপ্রিল মাসের প্রথম দিকেই হবে। ভাইয়ের বাসার জন্য বাজার থেকে সদায় পাতি কিনে যখন বাসায় ফিরছিলাম ঠিক তখনই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাক হানাদার বাহিনীর ৩টি জেট বিমান কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান ও সরকারী বড় বড় অফিস ভবনে শুরু হয় বেপরোয়া বোমা বর্ষণ। আর যে অফিসটি আমার সবচাইতে নিকটবর্তী সেটি হল ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোর্ট, দূরত্ব আনুমানিক ৫০০ গজ। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি আত্মরক্ষার জন্য পৌর সভার ময়লা পানি নিষ্কাশনের ড্রেনের ভিতর ঢুকে প্রথম বারের মত সংগ্রামী চেতনায় আত্মরক্ষার শিক্ষা পাই।

১৫/২০ মিনিট বোমা বর্ষণের পর যখন বর্বরদের বিমানগুলি চলে গেল। তখন আমার মনে হল যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর এখন কিছুটা শান্ত। আর অন্য কোনোদিকে চিন্তা না করে বাসার দিকে রওয়ানা হই। অল্প কিছুদূর গিয়েই দেখি রাস্তার পাশে এক হিন্দু বাড়ির একটি ঘরের দরজায় ও জানালায় অনেক লোক কান পেতে কী যেন শুনছে।

আমিও শোনার জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। যখন বুঝলাম যে লোকগুলি রেডিও শুনছে ঠিক তখনই আমি শুনলাম যে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া বলছি। আর যা বলল সবকিছু বোঝার মতো মন মানসিকতা তখন আমার ছিল না।

ঐ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর সংগ্রামী ছাত্র জনতা এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের দখলেই ছিল। যার অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিন। আইনুদ্দিন সাহেবকে আমি প্রথম দেখলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর থেকে এক মাইল উত্তরে সুহীলপুর গ্রামে তিতাস গ্যাস কোম্পানির সামনে।

তারপর হঠাৎ করে যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর হানাদারদের দখলে চলে গেল আমরা তখন খানদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৯৭১ সনের ২২শে এপ্রিল সিলেট জেলার তেলিয়াপাড়া সীমান্তের বিপরীতে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সিমলা নামক স্থানে মুক্তি বাহিনীর এক অস্থায়ী ক্যাম্পে যোগদান করি। সেই ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন লেফ্‌টেনেন্ট ইব্রাহিম। আমি মনে করি লে. ইব্রাহিম আমাকে দেখলে আজও চিনতে পারবেন।

আমি লে. ইব্রাহিম সাহেবের অধীনে প্রাথমিক ট্রেনিং-এ ছিলাম মাত্র ৭ দিন। এই ৭ দিনের একটি প্রশ্নের উল্লেখ না করে এ মুহূর্তে আর কিছুই লিখতে পারলাম না। একদিন আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে লে. ইব্রাহিম সাহেব প্রশ্ন করলেন আমরা এখানে কেন এসেছি? এ কথাটা যখন যত সহজ তখন তত কঠিন ছিল। উত্তর— আমরা মাতৃভূমিকে মুক্ত করার ট্রেনিং নিতে এখানে (ভারতে) এসেছি। আমার যতটুকু মনে পড়ে উচ্চ শিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধারাও এত সহজ প্রশ্নটা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে পারতনা বা উত্তর দিতে পারতনা। কারণ ইব্রাহিম সাহেব এই প্রশ্নটা করলে আমার মনে হত যে, এই বুঝি সুন্দরবন থেকে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার গুলিবিদ্ধ হয়ে আমাদের মাঝে হাজির হল।

এমনিভাবে ৭ দিন গত হল। ৮ দিনে সময় হঠাৎ করে দেখলাম ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৪৮টি ট্রাক ও একটি জীপ। জীপে বসা একজন ক্যাপ্টেন, জাতিতে শিখ। নাম জানার সুযোগ পেলাম না। আর এই গাড়িতে করে আমাদেরকে হায়ার ট্রেনিং-এর জন্য নিয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় নিবে তা আমাদের কিছুই জানায় না। আমি যতটুকু জানি ৪৮টি ট্রাকের প্রত্যেকটিতে ৪৮ জন করে মুক্তিযোদ্ধা থাকবে আর এদের মধ্যে একজন থাকবে কমাণ্ডার। আমি এই ৪৮টি ট্রাকের ৩নং ট্রাকের কমাণ্ডারের দায়িত্ব পেলাম। তার

পরদিন ক্যাপ্টেন সাহেবের জীপকে সামনে রেখে সমস্ত ট্রাক বহর চলতে লাগল। এ সময় আমার কাছে মনে হল যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জেনারেল ওসমানীর নির্দেশে বার্মা রণাঙ্গনের দিকে চললাম। এমনিভাবে ৩ দিন ৩ রাত গাড়ি চলার পর হায়ার ট্রেনিং-এর ট্রেনিং সেন্টার, আসামের কাছাড় জেলাস্থ ইন্দ্রনগরে এসে পৌছালাম। তখন সূর্য উঠেনি। এই প্রায় অন্ধকারের মধ্যে শুনলাম শত কোটি বানরের কিচির মিচির শব্দ আর ভাবছিলাম যে এই পাহাড়ের উপরেই বুঝি রাম তার লক্ষ লক্ষ অনুরাগীদের নিয়ে লংকা আক্রমণের পরিকল্পনা করছে।

সূর্য যখন উঠল তখন চার দিকে দেখি পাহাড় আর পাহাড়, আর গভীর অরণ্য। আমার গাড়ির সামনেই দেখলাম ছোট ছোট বেশ কয়েকটি তাবু। প্রত্যেকটিতে ২/৩ জন করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য। আর চারিদিকের পরিস্থিতি দেখে মনে হল আমরাই ইন্দ্রনগর প্রথম ট্রেনিং নিতে এসেছি। এরপর যখন আমি গাড়ি থেকে নামলাম তখন দেখলাম আমার ধারণা সম্পূর্ণ সত্যি। নাম, পিতার নাম, গ্রাম, থানা, জেলা ইত্যাদি লিখার পর আমি ও আমার সহযোদ্ধাদের নিয়ে রাস্তা থেকে প্রায় হাজার গজ উপরে উঠলাম। সেখানে কিছু তাবু ও বাকি সব উপজাতীয়দের ছোট ছোট কুড়েঘর। একটা বড় তাবু আমি ও আমার সহযোদ্ধারা পরিষ্কার করে গাছের পাতা দিয়ে বিছানা করলাম।

অনেক রাস্তা পাড়ি দিয়ে যাওয়াতে আমাদের সবাইকে ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। এমনি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেখে ইন্দ্রনগর ট্রেনিং সেন্টারের অধিনায়ক কর্নেল বাগচী (ভারতীয়) আমাদের সবাইকে ৩ দিন আরামের অনুমতি দিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে কর্নেল বাগচী আমাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, আমার বাড়িও একদিন তোমাদের দেশেই ছিল, ফরিদপুরে, আর শেখ মুজিব ছিল আমার ক্লাস ফ্রেন্ড। এ জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত কারণ যে বাংলা একদিন আমার মাতৃভূমি ছিল সে বাংলারই ছেলেদের মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমি পেলাম।

উপরে উল্লিখিত ট্রেনিং সেন্টারে যে সব মুক্তিযোদ্ধারা ছিলাম এর মধ্যে দলনেতা ছিলেন জনাব মাহবুবুর রব সাদী। আমি যখনই সাদী ভাইকে দেখতাম তখন মনে মনে ভাবতাম যে উনার মতো ব্যক্তিরাই সবচাইতে বেশি দেশপ্রেমিক। এছাড়াও মনির, নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া (শহীদ ও বীর উত্তম), আশরাফ, আশরাফুল হক (বীর প্রতীক), যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা জসিম ও একেএম রফিকুল হক (বীর প্রতীক) ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

শুরু হল নাম জানা অজানা শত সহস্র বাংলা মায়ের দামাল ছেলের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ। মাত্র এক মাস তের দিনের প্রশিক্ষণেই আমরা মোটামুটি সব কিছু আয়ত্ব করে নিলাম, যেমন হাই এক্সপ্লোসিভ, ৩৬ হ্যাণ্ড গ্রেনেড, স্টেন গান, রাইফেল, এসএলআর, এসএমজি ইত্যাদি। ইন্দ্রনগর ট্রেনিং ক্যাম্পের সমস্ত প্রশিক্ষকই ছিলেন ভারতীয় সামরিক বাহিনীর লোক। তাদের মাঝে যাদের নাম এই মুহূর্তে মনে আসে তারা হলো ক্যাপ্টেন চৌহান, সুবেদার মেজর ছাব্বির, ক্যাপ্টেন ধীরেন প্রভৃতি। কর্নেল বাগচী ছিলেন উক্ত ক্যাম্পের প্রধান।

এক মাস তের দিন প্রশিক্ষণের পর মে মাসের শেষ দিকে আমাকে ৪ নম্বর সেক্টরে (সিলেট এলাকায়) সাদী ভাইয়ের অধীনে নিয়োজিত করা হয়। উক্ত ৪ নম্বর সেক্টরের

কমাণ্ডার ছিলেন মেজর সিআর দত্ত। উল্লেখ থাকে যে সাদী ভাইয়ের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে আমি ছিলাম পাঁচ মাস। এই পাঁচ মাসে ৪ নম্বর সেক্টরে কম করে হলেও ১০ বার গেরিলা পদ্ধতিতে বেশ বড় ধরনের আক্রমণে আমি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। এবং অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩ নম্বর সেক্টরে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করি।

জুন মাসে মাহবুবুর রব সাদীর নেতৃত্বে ভারতের জালালপুরে যে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপিত হয় এতে আমি যোগদান করি। উক্ত ক্যাম্প থেকে প্রধান যে গেরিলা আক্রমণে অংশ নেই, তা হলো :

১. জুন মাসের শেষ দিকে সিলেট-জকিগঞ্জ রাস্তার উপর সরিফগঞ্জের নিকট পুল এবং মাটির বাঁধ বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করি। উক্ত আক্রমণটি পরিচালিত হয়েছিল মনিরের নেতৃত্বে। পুলটি ধ্বংস হওয়ার ফলে সিলেটের সঙ্গে জকিগঞ্জের যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
২. জুন মাসে আটগ্রামে অবস্থিত ডাকবাংলো, মসজিদ ও বাসস্ট্যান্ডে পাক বাহিনীর ঘাঁটিতে যে আক্রমণ হয় উক্ত আক্রমণে আমি ছিলাম মাহবুবুর রব সাদীর দলে।
৩. এর মধ্যে যে অপারেশনটি আমার জন্য সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় তা হলো ৩রা জুলাই ১৯৭১ এ সিলেটের কানাইঘাট থানা বর্তমানে উপজেলা রেইড করা। গ্রুপ কমাণ্ডার ছিলেন মাহবুবুর রব সাদী নিজে। সব মিলিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম ৩০ জন। মাহবুবুর রব সাদীর নেতৃত্বে আমরা ৩০ জন অতর্কিতে কানাইঘাট থানায় আক্রমণ করি ও তুমুল গোলাগুলির পর উক্ত থানা থেকে ৬০/৬২টি রাইফেল ছিনিয়ে আনি। উক্ত আক্রমণে আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা নিজেদের গুলিতে মারাত্মক ভাবে আহত হয়। তার নাম রেবুতী মোহন দাস বাড়ি নবীনগর উপজেলা, জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া। রেবুতীর পেটে গুলি লাগে।

পরবর্তীতে জুলাই মাসে খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া (বীর উত্তম)-এর নেতৃত্ব কানাইঘাট থানার অন্তর্গত মমতাজগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের যে অগ্রগামী ক্যাম্প স্থাপিত হয় তাতে অংশগ্রহণ করি। এই অগ্রগামী ক্যাম্প থেকে আমরা উক্ত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্নসহ রাজাকার, আলবদরের ঘাঁটিতে প্রায়ই গেরিলা আক্রমণ চালাতাম।

আমাদের ক্যাম্পের কিছু দূরেই সালাম টিলায় একেএম রফিকুল হক (বীর প্রতীক) এর নেতৃত্বে ছিল মুক্তি বাহিনীর অন্য আর একটি অগ্রগামী ক্যাম্প। কখনো কখনো আমরা দুই ক্যাম্পের যোদ্ধারা মিলে শত্রুর উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাতাম। ভারতের মেজর কুমার প্রায়ই আমাদের যুদ্ধ বিষয়ক পরিকল্পনায় সহায়তা করতেন।

অতঃপর আগস্ট মাসে সিলেটের জকিগঞ্জ থানার অমলসিদ নামক স্থানে আমরা মুক্তি বাহিনীর অগ্রগামী ক্যাম্প স্থানান্তর করি। উক্ত ক্যাম্পের কমাণ্ডার ছিলেন একেএম রফিকুল হক (বীর প্রতীক)। আবু সাঈদ, জসিম, আতাউর, মনিরসহ আমরা প্রায় ১২০/১২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা উক্ত ক্যাম্পে ছিলাম। প্রায় প্রতিদিনই আক্রমণ ও প্রতি

আক্রমণ চলত। পাক বাহিনীর ক্যাম্প ছিল আমাদের ক্যাম্প থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে, সিলেট জকিগঞ্জ রাস্তার উপর রসিদপুর বাজারে। আর আমাদের ডিফেন্স থেকে তাদের ডিফেন্সের, বাঙ্কার দেখা যেত। ভাঙ্গাটুকুর গ্রামস্থ ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি বাহিনীর ঘাঁটির সঙ্গে আমাদের অগ্রগামী ক্যাম্পের টেলিফোন যোগাযোগ ছিল। তারা আমাদেরকে আর্টিলারী ফায়ার দিয়ে সাহায্য করত। উক্ত ক্যাম্পে শত্রুর গোলার আঘাতে আমাদের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম শহীদ হন। আমাদের আক্রমণে বিভিন্ন দিন ১০ থেকে ১১ জন শত্রু সৈন্য খতম হয়। এ এলাকাকে প্রায় দেড় মাস মুক্ত রাখার পর হাই কমাণ্ডের নির্দেশে আমরা কুমিল্লা, ঢাকা এবং ময়মনসিংহের সকলেই ৩ নম্বর সেক্টরে বদলী হয়ে আসি ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৩ নম্বর সেক্টরের কমাণ্ডার ছিলেন লে. কর্নেল কেএম শফিউল্লাহ। আমি যে কয়মাস ৩ নম্বর সেক্টরে লড়াই করি তখন আমার যুদ্ধের ধরণ ছিল আলাদা। অর্থাৎ আমি নিয়মিত বাহিনীর সাথে সেক্টর ট্রুপসে। উক্ত সেক্টর ট্রুপসের কোম্পানি কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন এমএ মতিন স্যারের অধীনস্ত বাহিনীতে যোগদান করি ও ডিসেম্বর মাসে আখাউড়া সীমান্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। উল্লেখ্য যে উক্ত যুদ্ধেই শত্রুর মর্টার গোলার আঘাতে বাংকার ধ্বসে আমি আহত হই।

স্বাধীনতায় আমার উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হল আখাউড়া সীমান্তে সংঘটিত লড়াই। ১৯৭১ সনের ১লা ডিসেম্বর রাত দশটায় ক্যাপ্টেন মতিন স্যারের নেতৃত্বে আমরা আগরতলা বিমানবন্দর বরাবর আখাউড়াস্থ পাক বাহিনীর ঘাঁটির বিপরীতে চুপিসারে এসে ম্যানহোল খুঁড়ে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য পজিশন নেই এবং একত্রে ফায়ার আরম্ভ করি। সারারাত্র গোলাগুলির পর শেষ রাতের দিকে ভারতীয় মিত্র বাহিনীও আমাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেয়। এখানে উভয় পক্ষেরই প্রচুর সৈনিক হতাহত হয়।

উক্ত যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ৪ঠা ডিসেম্বর আমি যখন বাংকারে পজিশনরত অবস্থায় শত্রুপক্ষের উপর এলএমজি দিয়ে ফায়ার করছিলাম তখন হঠাৎ করেই শত্রুর একটা মর্টারের গোলা এসে পড়ে আমার বাংকারের উপর। ফলে সম্পূর্ণ বাংকার ধ্বসে পড়ে আমার উপর। সহযোদ্ধারা অনেক চেষ্টা করে আমাকে পরিশেষে বাংকার থেকে টেনে বের করলেও মেরুদণ্ডে আঘাত পাই।

চিকিৎসার জন্য ১৯৭৮ সনের মে মাসে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব আমাকে হাঙ্গেরীতে পাঠান কিন্তু ওখানকার মেডিকেল বোর্ড জানায় সময় শেষ, এখন আর চিকিৎসা করে কোনো ফল হবে না তাই ২৮ দিন পরেই বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেন। আর তখন থেকেই আরম্ভ হয় আমার এই হুইল চেয়ারের অভিশপ্ত জীবন।

স্বাধীন দেশ আমাকে এমন অবজ্ঞা আর অসম্মান করবে এ দুঃখ মানি কী করে?



আবুল কাশেম মো. রফিকুল হক, বীর প্রতীক

বাংলা ১৩৫৭ সালের ১০ই বৈশাখ ময়মনসিংহ জেলার অস্টগ্রাম থানায় (বর্তমানে উপজেলা) আমার জন্ম হয়। পিতা একেএম নূরুল হক সরকারি চাকুরি করতেন। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি তিনি সরকারি চাকুরি (সি. ও রেভিনিউ— নান্দাইল, ময়মনসিংহ) হতে অবসর নেন। মাতা হাসিনা হক একজন সাধারণ গৃহিণী ছিলেন। আমরা পাঁচ ভাই, এক বোন। সবার মাঝে আমার স্থান চতুর্থ।

আমি কিশোরগঞ্জ আজিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করার পর ১৯৬৮ সনে কিশোরগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কলা বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট এবং ১৯৭০ সনে কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল মহাবিদ্যালয় থেকে কলা বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে উক্ত কলেজে বিএ ক্লাসে এডমিশন নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় পরীক্ষাতেই ২য় বিভাগ লাভ করি। পরবর্তীতে (দেশ স্বাধীন হবার পর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে (সম্মানসহ) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্বে কিশোরগঞ্জ রাইফেল স্যুটিং ক্লাবে বালক গ্রুপের সদস্য ছিলাম। ছাত্র জীবনে আমি ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক এবং একজন সাধারণ কর্মী ছিলাম। আমার দ্বিতীয় ভাই একেএম মুর্শেদুল হক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ৩ নম্বর সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন।

ছাত্রজীবনে উপলব্ধি করেছিলাম ১৯৪৭ হতে ১৯৬৯ সন পর্যন্ত পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী বাংলাদেশকে কেবল শোষণ আর বঞ্চনা করে আসছিল। ফলশ্রুতিতে ১৯৬৯ সনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৬ দফার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে গড়ে উঠে এক দুর্বার গণআন্দোলন। ইয়াহিয়া খান বাধ্য হয়ে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন। ১৯৭০ সনের এই নির্বাচনে অংশ নেয় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ। ৬ দফার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ জয়ী হয় পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে। স্বভাবতই আশা করেছিলাম ভবিষ্যতের শাসনতন্ত্র তৈরি হবে ৬ দফার উপর ভিত্তি করে। কিন্তু জনাব ভুট্টো ২৭শে ডিসেম্বর জানালেন সংখ্যাগরিষ্ঠ

দল ইচ্ছামত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করলে তিনি সরে দাঁড়াবেন এবং পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য তিনি কোনোভাবেই দায়ী হবেন না।

এতে এটাই স্পষ্ট হয় যে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নির্বাচনের রায় মানতে রাজি নন। ফলে আরম্ভ হয় বৈঠকের ষড়যন্ত্র এবং এদেশে বাঙালি হত্যার জন্য গোপন সৈন্য ও অস্ত্র প্রেরণ।

অতঃপর রমনা রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনতে পেলাম পরদিন ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে। যার মূল কথা ছিল— 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল সকল স্কুল, কলেজ, অফিস-আদালত। বাংলাদেশ ব্যাপী শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ গণআন্দোলন। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বিরাজ করছিল বাংলার মানুষের মাঝে থমথমে ভাব। সকলের মুখে বিস্ময়ের ছাপ, একটা আতঙ্কের ভাব।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সন। আমি ছিলাম কিশোরগঞ্জ শহরের বাড়িতে পরদিন সকালে ঢাকা বেতার থেকে শুনতে পেলাম দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। অল্পক্ষণ পরই দিল্লির খবরে জানা গেল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার খবর। অন্যদিকে ঢাকা থেকে সংবাদ আসল পাক বাহিনী ২৫শে মার্চের রাত্রে ঢাকা সেনানিবাস, পিলখানা এবং রাজারবাগে বাঙালি সৈন্য, পুলিশ এবং আনসারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে হামলা চালিয়ে বহু ছাত্রকে হত্যা করেছে।

২৮/২৯শে মার্চ সন্ধ্যায় রেডিও খুলতেই একটা নতুন কেন্দ্র ধরা পড়ে নাম-স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। তাতে শুনতে পেলাম মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠ— বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অস্থায়ী সেনাপতি হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণার ভাষণ, সেই সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধরার আহবান।

স্বাধীনতা একটা জাতির আত্মার আলোক। স্বাধীনভাবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা কখনো নিষ্প্রভ হয় না। এমন কোনো মূল্য নেই যা স্বাধীনতার জন্য দেওয়া যায় না। আর তাই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার সত্যটি নিজের চেতনায় প্রখরভাবে অনুভব করেছিলাম বলেই মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিলাম।

বাংলার বিপ্লবীসন ১৯৭১ সালের ১৬ই এপ্রিল আমি প্রথম সিমনা মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগদান করি। এ স্থানটি মাতৃভূমি বাংলাদেশের সিলেট জেলার তেলিয়াপাড়ার অতি নিকটস্থ। এ কেন্দ্র হতে প্রাথমিক ট্রেনিং এর পর ইন্দ্রনগর ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগদান করি বিশেষ উপযুক্ত ট্রেনিং গ্রহণের জন্য। ইন্দ্রনগর জায়গাটি আসামের কাছাড় জেলায় অবস্থিত। আমরা পাঁচশ জন বাংলার দামাল ছেলে এ কেন্দ্র থেকে মে মাসে ট্রেনিং গ্রহণ করি।

ভারতের সামরিক অফিসারগণ আমাদেরকে বিস্ফোরক, বিভিন্ন ধরনের ছোট আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও গেরিলা পদ্ধতিতে শত্রুর উপর আক্রমণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। আমাদের প্রতি ভারতীয় অফিসারদের মার্জিত ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করে।

ইন্দ্রনগরের প্রায় পাঁচশত বিপ্লবী যোদ্ধাদের মাঝে বাছাই করা আমাদের ২৫ জন— যেমন শহীদ খাজা নিজামউদ্দিন ভুঁইয়া (বীর উত্তম), আশরাফুল হক (বীর প্রতীক),

মনির, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা জসিম উল্লেখযোগ্য J.L.W (Junior Leader Warefare) ট্রেনিং প্রদান করা হয়। ট্রেনিং এর পর প্রথমে অনিয়মিত কিন্তু সেপ্টেম্বর থেকে নিয়মিত ভাবে ভারতীয় ৭৫ টাকা করে বেতন পেতাম। এটা যথেষ্ট ছিল। মাসিমপুর ক্যান্টমেন্টের দোকান থেকে কাপড় কিনে তাদের টেইলার দিয়ে পোশাক (যেমন লম্বা কলারসহ জামা) বানাতাম। মোজা, জুতা কিনতাম। জোক, মশা তাড়াবার মলম কিনতাম। নভেম্বর পর্যন্ত এই ভাতা পেয়েছি মনে আছে। ভারতের ইন্দ্রনগর প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের সমস্ত প্রশিক্ষণদাতাই ছিল ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সদস্য। উক্ত প্রশিক্ষণদাতাদের মাঝে যাদের নাম মনে পড়ে তারা হলো ক্যাপ্টেন ধীরেন, ক্যাপ্টেন চৌহান (শিখ) ও সুবেদার মেজর ছাব্বির (ভারতীয়)।

প্রশিক্ষণ শেষে মে মাস থেকে ৪ নম্বর সেক্টরের সদস্য হিসাবে অতঃপর অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩ নম্বর সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে (মে মাস) আমরা ৩০ জন সিলেটের বড়লেখা নামক চা বাগানে প্রতিষ্ঠিত শত্রু ছাউনীতে অতর্কিতে আঘাত হানি। ট্রেনিং শেষে জুন মাসের প্রথম দিকে মাহবুবুর রব সাদীর নেতৃত্বে ভারতের বদরপুরের অদূরে জালালপুর মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা ঘাঁটি স্থাপিত হয়। উক্ত ঘাঁটি হতে ৪ নম্বর সেক্টরে (ইকো - ৪) আমি যে সমস্ত অপারেশনে যোগদান করি সেগুলোর মাঝে যেগুলি স্মরণ আসে, তা হল—

প্রথম অপারেশনটি হয় সম্ভবত আশরাফ ভাইয়ের (বীর প্রতীক) নেতৃত্বে সিলেট জকিগঞ্জ রাস্তার উপর কালিগঞ্জ পুলে। রাত তিনটার দিকে পুলের অদূরে তিনটা ট্যাঙ্ক ধ্বংসকারী মাইন আমরা পুঁতে রাখি এবং কিছুক্ষণের মাঝেই বিস্ফোরক দিয়ে পুলটি উড়িয়ে দেয়া হয়। উক্ত অপারেশনে আমরা ১৫/২০ জন ছিলাম। বিস্ফোরক লাগানোর কাজে আমার সাথে ছিল সামসু, জসিম ও আতাউর। আমাদের কাজে সাফল্য অর্জনের জন্য অন্য সবাই পুলের দুই দিকে নিজ নিজ পজিশনে পাহারারত ছিল। পুলটি ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে শত্রু সৈন্য নিকটবর্তী ছাউনী ও বাংকার থেকে আমাদের লক্ষ করে গুলি ছুড়তে থাকে। আমরা তাদের গুলির জবাব না দিয়ে দক্ষতার সাথে কাজ সমাধা করে ঘটনাস্থল থেকে সরে আসি। এ অপারেশনে আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা সামান্য আহত হয়। রাস্তায় পুঁতে রাখা ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন বিস্ফোরিত হয়ে পরদিন সকালে পাক বাহিনীর সামরিক জীপ ধ্বংস হয় এবং তিনজন দখলদার পাক সেনাসহ নরপিশাচ বেলুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন বসারত আলীর মৃত্যু ঘটে। মাইনের শব্দ আমরা নিজেরাই দূর হতে শুনেছিলাম। ক্যাপ্টেন মারা যাবার পর তারা পার্শ্ববর্তী তিনটা গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। পরবর্তীতে গ্রামবাসীদের কাছে এসব তথ্য (পাকদের নিহত হবার খবর, গ্রাম পোড়ানো ইত্যাদি) জানতে পারি।

দ্বিতীয় গেরিলা আক্রমণটি হয় লাতু রেলওয়ে স্টেশনের পাশে পুলের ওপর আনুমানিক রাত ৩-৩০ মিনিটের সময়। জসিম, মুর্তজা, সালাম ও ইলিয়াস সহ ২৫/২৬ জন মুক্তিযোদ্ধা এতে অংশ নেই। আমরা চার জন বিস্ফোরক লাগানোর কাজে ছিলাম বাকি সবাই পাহারারত ছিল। এক্সপ্লোসিভের আঘাতে পুলটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।

তৃতীয় অপারেশনটি জকিগঞ্জ থানার অন্তর্গত কালীগঞ্জ বাজারের উপর সংঘটিত

হয়। উক্ত অপারেশনটির কমান্ডার ছিলেন আশরাফুল হক (বীর প্রতীক)। জসিম, প্রদীপ, সামসু, বদিউদ্দিনসহ আরও প্রায় ১৫/২০ জন মুক্তিযোদ্ধা এতে অংশ নেই। ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে বাজারে অবস্থিত শত্রুর ক্যাম্প থেকে ১৭টি রাইফেল ছিনিয়ে আনতে আমরা সক্ষম হই। (রাজাকারদের ক্যাম্পে মাঝে মাঝে পাক আর্মিরা আসত তবে রাতে থাকত না। ঐদিন পাকিস্তানিরা আসেনি।)

চতুর্থ— জকিগঞ্জ রাস্তার উপর সরিপপুর বাজারের পাশে অবস্থিত সেতু এবং বরাক নদীর মাটির বাঁধ ২১শে জুন বিস্ফোরক দিয়ে উড়োনো হয়। এতে জকিগঞ্জের সাথে সিলেটের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পঞ্চম অপারেশন— ২৯শে জুন জকিগঞ্জের আটগ্রামে অবস্থিত পাক বাহিনীর তিনটি ঘাঁটিতে সন্ধ্যায় একযোগে আক্রমণ চালানো হয়। এতে আমরা আটগ্রামের মসজিদের ঘাঁটি হতে দুইজন পাকসেনা জীবিত ধরে আনতে সক্ষম হই।

আটগ্রাম মসজিদের ঘাঁটি অপারেশনের বর্ণনা

একাত্তরের আমার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অপারেশন হলো ২৯শে জুন সিলেটের জকিগঞ্জ থানার অন্তর্গত আটগ্রামে অবস্থিত পাকবাহিনীর তিনটি ঘাঁটিতে একযোগে আক্রমণ। সন্ধ্যা নামার সাথে সাথেই আমরা তিনটি দলে ভাগ হয়ে পড়ি। আটগ্রামের বাস স্ট্যান্ডে অবস্থিত ঘাঁটিতে আশরাফুল হক (বীর প্রতীক), ডাক বাংলোর ঘাঁটিতে মাহবুবুর রব সাদী এবং মসজিদের ঘাঁটিতে নেতৃত্ব দেন মনির ভাই। আমি ছিলাম মসজিদের ঘাঁটি আক্রমণকারী দলে। প্রথমে নদী পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের নাতানপুর বিএসএফ থেকে দেয় আর্টিলারি সাপোর্টের নীচ দিয়ে মসজিদ সংলগ্ন পাকবাহিনীর ঘাঁটির কিছু দূরে পজিশন নিয়ে একত্রে ফায়ার আরম্ভ করি এবং একঘণ্টা ফায়ারিং এর পর হঠাৎ করে আমরা প্রায় ১৪/১৫ জন জয় বাংলা ধ্বনি তুলে শত্রুর বাংকার অভিমুখে ফায়ার করতে করতে ছুটে চলি। এতে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে শত্রুর এলএমজি। একটি বাংকার থেকে দুইজন পাঠান সৈন্যকে জীবন্ত ধরে ফেলি। বাকিরা রাতের আঁধারে পিছন দিকে পালিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, একাত্তরের জুন মাসে ৪নম্বর সেক্টরে জীবন্ত পাকসেনা ধরে আনি আমরাই প্রথম।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অগ্রগামী ক্যাম্প স্থাপন

অতঃপর জুলাই মাসে সিলেট জেলার কানাইঘাট থানার অন্তর্গত মাদারীপুর সালামটিলায় (অনেকে সালামতটিলা বলেন। একটা টিলার উপর বাড়িটা ছিল আর মালিকের নাম সালাম তাই এই নামকরণ। একাত্তরে জনাব সালাম ভারতে চলে গিয়েছিলেন। উনি মাঝে মাঝে এসে আমাদের দোয়া করতেন আর বাড়ির জিনিসপত্র ঠিকঠাক রাখতে বলতেন।) অগ্রগামী ঘাঁটি স্থাপনের জন্য ভারতের সামরিক বাহিনীর মেজর কুমার আমাকে নির্দেশ দেন। এই শিবিরে আমার অধীনে ৪২ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। তাদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সর্বপ্রথম ছাউনিটি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম। বর্বর পাক বাহিনী আমাদের অগ্রগামী ছাউনিতে প্রায়ই আক্রমণ করতে আসত। কিন্তু বাংলার অকুতোভয় বীর সৈনিকের কাছে তাদেরকে সর্বদাই পরাজয় বরণ করতে হতো।

আমার সহযোদ্ধারা যেভাবে তাদের জীবন উপেক্ষা করে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়ে পাকসেনাদের পিছপা করেছে সেজন্য সত্যিই আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমাদের সাথে হাতিয়ার ছিল দুইটি দুই ইঞ্চি মর্টার, চারটি এলএমজি, পাঁচটি স্টেনগান ও বাকি সব রাইফেল ও এসএলআর। ক্যাম্পে প্রতি সন্ধ্যায়ই রাতের জন্য পাসওয়ার্ড (সাংকেতিক নাম, যা দ্বারা শত্রুর আক্রমণে নিজেদের চিহ্নিত করা যায়) নির্ধারণ করা হত।

আমার উক্ত ছাউনীর অদূরে মমতাজগঞ্জে ছিল খাজা নিজামউদ্দিন ভুঁইয়া (বীর উত্তম)-এর অগ্রগামী ছাউনী। আমি কোনো বিশেষ অপারেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে তার সাথে পরামর্শ করতাম। প্রয়োজনে তিনি আমাকে তার মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে সাহায্য করতেন এবং বিশেষ প্রয়োজনে তিনিও আমাদের কাছ থেকে অস্ত্রসহ যোদ্ধা নিতেন। এ বিষয়ক দুটি চিরকুট যা প্রয়াত সাংবদিক মাহবুবউল আলম রচিত 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত'-তে মুদ্রিত তা হলো—৮ই আগস্ট বাহকের মাধ্যমে প্রেরিত পত্রে খাজা নিজামউদ্দিন আমাকে লিখেছেন, আজ এক জরুরি কাজের জন্য আতাউর ও সামসুসহ ভাল ৬ জন যোদ্ধা পাঠাবে সান্ধ্য আহারের পর। তাদের সঙ্গে দেয়া হবে একটা অটোমেটিক ও বাকি সব রাইফেল। এরা ইন্‌শাল্লাহ কাল সকালে ফেরত যাবে। আগের পাসওয়ার্ড থাকবে (বিশেষ দ্রষ্টব্য) কিছুক্ষণ আগে এক গাড়ি পাক সৈন্য আটগ্রাম গিয়েছে। এরা আচমকা আমাদের আক্রমণ করতে পারে। আটগ্রামে খবর পাঠিও। আর আমার একপ্লোসিভ (বিষ্ফোরক) চাই। পরদিন অর্থাৎ ৯ই আগস্ট লিখলেন, "রফিক এই মাত্র খবর পেলাম রাজপুর স্কুলে ও রামপুরে পাঞ্জাবীরা বাংকার করছে। আমি আজকে সে দিকে যাব। তোমার গ্রুপ রাতে নদীর পার থেকে আমাদের গ্রুপের পর পরই ফায়ার খুলবে (গুলি চালাবে)।"

বাংলার সেই বীর সন্তান খাজা নিজামউদ্দিন ভুইয়া (বীর উত্তম) পরবর্তীতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পাক বাহিনীর সাথে দীর্ঘ ছয় ঘন্টা ধরে সম্মুখ যুদ্ধ চালিয়ে বীরদর্পে শাহাদৎ বরণ করেন। খাজা ভাই আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাকবাহিনীর কবল থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন মোকামটিলা, মনিপুর, উজান, মমতাজগঞ্জ এলাকা। উক্ত মুক্ত এলাকার মমতাজগঞ্জের মোকামটিলার উপর এই বীর সন্তানের শেষ শয্যা রচিত হয়েছে।

আগস্ট মাসের ১ম সপ্তাহে আমাকে বাহিনীসহ বাংলাদেশের সর্বপূর্ব সীমান্ত সিলেটের জকিগঞ্জ থানার অমলসিদ নামক স্থানে অগ্রবর্তী শিবির স্থাপনের জন্য আদেশ করা হয়। স্থানটি ভারতের টুকুর গ্রামের নিকটবর্তী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। প্রথমে ৫৩ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে অমলসিদে অবস্থিত সাবেক ইপিআর ক্যাম্পে মূল শিবির স্থাপন করি। পরবর্তীতে পাক বাহিনীর আক্রমণের চাপ বৃদ্ধির জন্য ও আমাদের প্রতিআক্রমণ বাড়ানোর কারণে বাহিনীর সংখ্যা ১২২ জনে উন্নিত করা হয়।

ক্যাম্পের ডিফেন্স এলাকাটি ছিল প্রায় এক মাইল জুড়ে। বাংকার ছিল ১৯টি। ১৫টি এলএমজি, ৫টি স্টেনগান, ৪টি দুই ইঞ্চি মর্টার, বাকি সব রাইফেল ও এসএলআর। অ্যমুনিশন, বিষ্ফোরকসহ এন্টিপারসোনাল মাইন ছিল ৮০০টিরও বেশি।

আমার উক্ত ক্যাম্পের সঙ্গে ভারতের ভাঙ্গাটুকুর গ্রামে অবস্থিত বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) হেডকোয়াটারের টেলিফোন যোগাযোগ ছিল (লন্ডন-আমস্ট্রাডাম সাংকেতিক নামে)। টেলিফোনে আমার নির্দেশ পেলে তারা তাদের ছাউনি থেকে

আমাদের আর্টিলারি ফায়ার দ্বারা সাপোর্ট দিত। কোম্পানিকে তিনটি ডিফেন্সে ভাগ করি ও আতাউর (বিএ), আবু সাইদ (বিএ) ও জসিম (আইএ)কে তিনটির দায়িত্ব প্রদান করি। মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম ছিল আমার সহকারী।

শত্রুর ঘাঁটি ছিল আমাদের ছাউনি থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে সিলেট জকিগঞ্জ রাস্তার উপর সরিফপুর বাজারে। দূরুত্ব কম বলে আমাদের বাংকার থেকে তাদের বাংকার দেখা যেত। পাক বাহিনী প্রায়ই উপর্যপুরী ৫ থেকে ৮ ঘণ্টাকাল একনাগাড়ে আমাদের ডিফেন্সের উপর আক্রমণ চালাতো কিন্তু তাদের আক্রমণে আমাদের অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা সঙ্গীরা মোটেই বাংকার পজিশন ছেড়ে উঠত না। উপরন্ত আমরা বর্বর বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করে তাদের উপর মাঝে মাঝে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। এতে ভারতীয় বাহিনীর আর্টিলারি সাপোর্টও কখনো কখনো নিতে হত।

অব্যাহত আক্রমণের মুখে বিভিন্ন দিকে ৫ জন রাজাকারসহ ৬ জন খানসেনা খতম হয়। আগস্টের শেষ দিকে মুক্ত এলাকার পরিমাণ হয় প্রায় ৬ বর্গমাইল। উক্ত সময়ে আমাদের একজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা কুমিল্লা জেলার পাঁচপুকুরিয়ার সিরাজুল ইসলাম আগস্ট মাসের ১২ তারিখ দিবাগত রাত এগারেটায় শহীদ হয়। ডিফেন্স এলাকার আক্রমণ প্রতিহত করার সময় ট্রেঞ্চ থেকে উঠে ট্রেঞ্চ এর উপরে এলএমজি রেখে দাঁড়িয়ে নির্ভিক চিত্তে অনবরত গুলি চালাতে থাকে, আর তখনই আসে বিপর্যয়। পাক বাহিনীর মর্টারের গোলা এসে পরে তার উপর। ছিটকে পড়ে সিরাজ, কাছেই এলএমজি টি পরে থাকে একজন বিশ্বাসী বন্ধুর মত। অমলসিদে মুক্ত এলাকার নাম রাখা হয় সিরাজনগর। (মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম ১২-৮-৭১ তারিখে রাত আনুমানিক ১১টায় শহীদ হয়। তার শরীরের গঠন ছিল মাঝারী ধরনের। গায়ের রং শ্যামলা। উচ্চতা পাঁচ ফুট ২/৩ ইঞ্চি হবে। সে ভাল গান গাইতে পারত। পল্লীগীতি ও স্বাধীনতার গান গেয়ে ক্যাম্পের সবাইকে সে আনন্দ দিত। তার স্বভাবও ছিল নম্র প্রকৃতির।)

আমার জানামতে শহীদ সিরাজুল ইসলামের গ্রামের বাড়ি ছিল কুমিল্লা জেলাস্থ পাঁচপুকুরীয়ায়। উল্লেখ্য যে স্বাধীনতার পর উক্ত ঠিকানায় পত্রও লিখেছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় তার পরিবারের কারো কাছ থেকে কোনো উত্তর পাই নাই। শহীদ সিরাজুল ইসলামকে অমলসিদ ক্যাম্পের পাশে দাফন করা হয়েছিল যথাযোগ্য ধর্মীয় ও সামরিক মর্যাদায়।

এই ছয় বর্গমাইল এলাকা দেখার অভিপ্রায়ে ক্যাপ্টেন রব, সেক্টর কমান্ডার কর্নেল সি আর দত্ত, ভারতের সাংবাদিকগণ প্রায়ই আসতেন। উক্ত মুক্ত এলাকা সমন্ধে ভারতীয় দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকায়ও খবর উঠেছিল। আমি আমার বাহিনীসহ প্রায় দেড় মাস কাল এই এলাকা মুক্ত রাখি এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এ মুক্ত এলাকাটি তদানীন্তন ইপিআর ও মুজাহিদ মুক্তিযোদ্ধা কোম্পানির নিকট অর্পণ করে ৩নম্বর সেক্টরে যোগদান করি। (জকিগঞ্জস্থ অমলসিদ অগ্রগামী ক্যাম্পের কয়েকজন ছাড়া অন্য সকল মুক্তিযোদ্ধাই ছিলাম ঢাকা, কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহ জেলার বাসিন্দা। স্বভাবতই আমাদের আগ্রহ ছিল নিজ জেলা/সেক্টরে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার। আর তাই কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সামরিক বাহিনীর গাড়িতে করে উক্ত জেলাসমূহের সকল মুক্তিযোদ্ধাকে ৩নম্বর সেক্টরে পাঠিয়ে দেন। উল্লেখ্য যে, ৪ নম্বর সেক্টরটি সিলেট এলাকা জুড়ে হলেও সিলেটের মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল খুবই

নগন্য আর তাই আমি ৩ নম্বর সেক্টরে আসার সময় অমলসিদ অগ্রগামী ক্যাম্পের দায়িত্ব অর্পন করে আসি তদানীন্তন ইপিআর ও মুজাহিদ মুক্তিযোদ্ধা কোম্পানির নিকট।

এখানে (৩ নম্বর সেক্টরে) ক্যাপ্টেন এমএ মতিন সাহেবের নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে বেশ কয়েকটি অপারেশনে অংশ নিই।

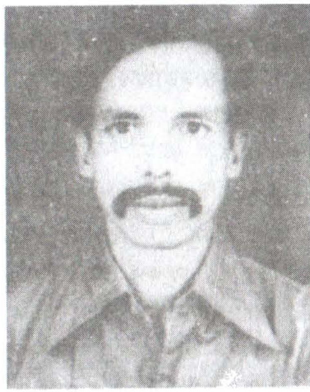
সর্বশেষে ৩রা ডিসেম্বর আগরতলা বিমানবন্দর বরাবর আখাউড়া সীমান্তে পাক বাহিনীর ঘাঁটির বিপরীতে রাত ১০টায় ক্যাপ্টেন মতিনের নেতৃত্বে আমার সম্মুখ যুদ্ধের জন্য ছোট ছোট ম্যানহোল খুঁড়ে অবস্থান নেই এবং কিছুক্ষণ পরই পাক বাহিনীর ঝংকার ও ঘাঁটি লক্ষ করে সবাই এক সাথে গুলি ও গোলা ছুড়তে থাকি। সম্পূর্ণ রাত গোলা গুলির পর শেষ রাতে মিত্র বাহিনী (ভারতীয়) আমাদের সাথে অংশ নেয়। দুইদিন তুমুল যুদ্ধের পর আখাউড়াস্থ পাক বাহিনীর পতন হয় এবং প্রচুর হতাহতের মাঝে পাক বাহিনী পিছনে হটে যায়। ৬ই ডিসেম্বর আখাউড়ার যুদ্ধ শেষ হলে পাকিস্তানিরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে প্রথমে আশুগঞ্জ ও সর্বশেষে ভৈরব বাজারে সমবেত হয়। আশুগঞ্জে তুমুল যুদ্ধ হয় কিন্তু ওখানে আমরা ছিলাম না। আমাদের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমাদেরকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থামিয়ে রাখা হয়।

৩রা ডিসেম্বর থেকে মিত্র বাহিনীর একাত্মতায় বুঝতে পেরেছিলাম সার্বিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা তার সেনাদল নিয়ে মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে দুর্বার বেগে সকল দিক থেকে ঝাপিয়ে পড়েছে পাক হানাদার বাহিনীর উপর। যৌথ বাহিনীর আক্রমণে পাক বাহিনী বাংলার সর্বত্রই পর্যুদস্ত হয়ে পিছু হটতে থাকে। ফলে এও বুঝতে পেরেছিলোম বাঙালির চেতনার সমন্বিত ধারা সংগঠিত হওয়ার মুহূর্তেই যুদ্ধ শেষ।

এল ১৬ই ডিসেম্বর। দীর্ঘ চব্বিশ বছরের শাসন ও শোষন থেকে মুক্তির আনন্দে ভরা এই দিন। বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো বিজয়ের আনন্দ। ৯ মাসের যুদ্ধজীবন শেষ হলো। পুরো ৯ মাসই আপনজনদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় পরিচিত আঙ্গিনায় ফিরে যাওয়ার জন্য মন হয়ে উঠল উতালা। তাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্কুলে আমাদের ক্যাম্প করা হয়েছিল) ১৮/১৯ তারিখে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার ক্যাপ্টেন মতিন সাহেবের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে কিশোরগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা নাজিমুদ্দিন ও বাচ্চুসহ সরাইল দিয়ে নদী পার হয়ে কটিয়াদী পর্যন্ত পায়ে হেঁটে ও পরবর্তীতে কিছু পথ রিকশায় ও কিছু পথ হেঁটে ডিসেম্বরেই কিশোরগঞ্জে শহরের বাসায় পৌঁছি। বাড়িতে পৌছার আগ পর্যন্ত আমি বা আমার আত্মীয়স্বজন কেউ কারো সংবাদ জানতাম না।

ভেবেছিলাম ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই দেশে কেউ বঞ্চিত হবে না স্বাধীনতার সুফল থেকে। গ্রাম বাংলার দরিদ্রতম নাগরিকও সুখের মুখ দেখবে, শরীক হবে সমৃদ্ধিতে। সকলেই ভোগ করবে গণতান্ত্রিক ন্যায় বিচার।

শোণিতের নক্ষত্র জ্বেলে যারা আমাদেরকে পথ দেখিয়েছে অথচ নিজেরা ঘরে ফিরতে পারেনি সেই শহীদ যোদ্ধারাও এখানে বিয়োগান্ত চরিত্র। তারা অনেকেই জাতীয় বীরমাল্য পায়নি, পেয়েছে কেবল স্বজনের আপনজন হারানোর কান্না।



মতিউর রহমান, বীর প্রতীক

বকশীগঞ্জ উপজেলার ধানোয়া সরকার বাড়িতে (পো: ধানোয়া কামালপুর) আমার জন্ম, বকশীগঞ্জ উপজেলা বর্তমানে জামালপুর (প্রাক্তন ময়মনসিংহ) জেলার অন্তর্গত। জৈষ্ঠ্য মাসের কোনো এক শুক্রবার বিকাল ৪টার সময় আমার জন্ম, বর্তমানে (২০১১) আমার বয়স ৫৮ বছর। আমার পিতা মরহুম তসলিম উদ্দিন সরকার গৃহস্থালী-কৃষিকাজ করতেন। তিনি ১৯৭৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মাতা গৃহিণী ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা চার ভাই এক বোন। এদের মধ্যে আমার স্থান তৃতীয়।

আমি কামালপুর বিদ্যালয়ে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়াশুনা করি। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে বাবার কাজে সাহায্য করতাম। আমি কখনোই কোনো দলের সদস্য ছিলাম না। চাচাত, জেঠাত ভাই মিলে আমরা ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। আমাদের গ্রামের প্রায় ৩০/৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। একাত্তরের এপ্রিল মাসের ৭ তারিখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। মেঘালয়ের মহেন্দ্রগঞ্জ থানার ইউথ ক্যামে প্রায় মাসখানেক প্রাথমিক ট্রেনিং নেই। তারপর তুরাতে ২৮ দিনের উচ্চতর ট্রেনিং নেই। গেরিলা ট্রেনিং নেই কিন্তু পরে সম্মুখ সমরেও যুদ্ধ করতে হয়েছে।

ইউথ ক্যাম্পে হাবিলদার ধন বাহাদুর (ভারতীয়) আর সুবেদার তোরাব আলী (বাংলাদেশী) ওস্তাদরা রাইফেল, গ্রেনেড ইত্যাদি চালনা শিক্ষা দিতেন। ইউথ ক্যাম্পের চার্জে ছিলেন বাংলাদেশী ক্যাপ্টেন মান্নান আর ভারতীয় ক্যাপ্টেন লেগী, তাছাড়া মেজর তাহেরও ট্রেনিং দিতেন। তুরাতে ক্যাপ্টেন বালজিত সিং (শিখ) ছিলেন। সম্পূর্ণ তুরা ক্যাম্পের চার্জে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার সান্ত সিং (ভারতীয়)। এমারত হোসেন পান্না ছিলেন আমার কোম্পানি কমান্ডার। তারপর কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন ওয়াহিদুজ্জামান হেলাল।

জুনের প্রথম সপ্তাহে আমরা বাংলাদেশে ঢুকি। আমাদের ১১ নম্বর সেক্টরের সাব সেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন মান্নান। তারপর ক্যাপ্টেন আজিজ ও কিছুদিন মেজর আমিনও আমাদের কমান্ডার ছিলেন। আমাদের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর তাহের। বাংলাদেশে ঢুকে আমরা প্রথম অপারেশন করি কামালপুরে। চরমপত্রে বলত কম্বলপুর। পাকিস্তান আর্মির (বকশীগঞ্জ) কমাণ্ডার ছিল মেজর আইউব। আমি আলফা কোম্পানিতে ছিলাম।

আমার উল্লেখযোগ্য অপারেশনগুলো হচ্ছে—

কামালপুর অপারেশন।

মাদ্দা (বকশীগঞ্জ থানা)— এখানে ২ জন মুক্তিযোদ্ধা মারা যান।

অপারেশন কর্ণজোড়া (শ্রীবর্দি থানা)।

আণ্ডার চর অপারেশন।

কোনো অপারেশনেরই তারিখ মনে নেই। কয়েকটা অপারেশনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজের সাথে একটা অপারেশনে ছিলাম। উনি অ্যাটাক পার্টিতে ছিলেন। আমরা কাট আপ পার্টিতে ছিলাম। রাত ১০টা হতে যুদ্ধ শুরু হয় ভোরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল তার ভিতরেও যুদ্ধ চলে। তারপর ভোরেই যুদ্ধ থেমে যায়। পরে বিকালে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। সেদিন আমরা জিততে পারিনি। বড় রকমের মার খাই ওখানে। অন্যান্য যুদ্ধে একজন দুইজন মারা যেত কিন্তু এই যুদ্ধে ৩০/৩৫ জন মারা যায়। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনও এখানে শহীদ হন। সেটা ছিল ৩১শে জুলাই দিবাগত রাত অর্থাৎ ১লা আগস্ট।

একদিন ধানোয়া ৩ নম্বর বাংকারে আমরা ছিলাম। ওখানে আমাদের রান্নাঘরের কোনে পাকরা আর্টিলারী শেল মারে। আমরা পজিশনে যাই। সেদিন যুদ্ধে ৩০/৪০ জন পাক মারা যায়। একজন আহত পাক হাবিলদারকে আমরা ধরেও নিয়ে আসি। পরে সে মারা যায়।

মাদ্দা ঘাসিরপাড়ায় যুদ্ধে আমাদের ২জন মারা যায়। এক জনের নাম হুমায়ুন। আরেক জনের নাম মনে নেই।

ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর সংগমস্থলে আন্ডারচর (প্রাক্তন দেওয়ানগঞ্জ থানা) অবস্থিত। ভোর ৪টার দিকে আন্ডারচরে আমাদের অবস্থানের উপর পাকিরা আক্রমণ চালায়। ওরা স্পীড বোটে করে এসেছিল। যুদ্ধ সকাল ১১টা সাড়ে ১১টার দিকে শেষ হয়। এই যুদ্ধে আমাদের জয় হয়। পাকিস্তানি আর্মির প্রচুর ক্ষতি হয়। ওদের কয়েকজন মারা যায় এ যুদ্ধে।

পাকিরা আমাদের পুরো ধানোয়া গ্রামটা পুড়িয়ে দেয়। সবাই খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লালমাটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

কর্ণজোড়াতে আমাদের হেড অফিস ছিল। সেখানে দালাল ছিল তৎকালীন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জেডআর আলী। সে আর্মি নিয়ে আমাদের ঘেরাও করে। পাকিদের সঙ্গে প্রচুর গেলাগুলি হয়। ওখানে থেকে ৩ দিন পর পাহাড়ি এলাকা দিয়ে বের হয়ে আসি। আমাদের পক্ষে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি— কেউ নিহত বা আহত হয়নি তবে কষ্ট পেয়েছিলাম। এখানে ৬ জন দালাল ধরা হয়। তবে ঐ চেয়ারম্যান ধরা পড়েনি।

বাট্টাজোড় যুদ্ধে আমার বন্ধু তাহের, মোজাম্মেল, সামাদ গুলি খায়। তখন আমি ভোটান কোম্পানির চার্জে ছিলাম। ওরা কমান্ডার পান্নার আন্ডারে ছিল। একটা কোম্পানিতে ১৫০-২০০ জন থাকত।

কামালপুরের পূর্বদিকে মৃধাপাড়া গ্রামের মাঝখানে সিএন্ডবি রোডের উপর একটা ব্রীজ ছিল। পাকিস্তানি ক্যাম্প হতে আমরা ১০০/১৫০ গজ দূরে ছিলাম। যুদ্ধ চলছিল। আমরা অ্যাডভান্স করে আসছিলাম। এমন সময় ২ জন পাক আর্মিকে দেখে বললাম স্যার (মেজর তাহের) আমরা ফায়ার করি? উনি বললেন যে, না আমি মৃত চাইনা জিন্দা চাই। তারপর ১০/১৫ গজ অ্যাডভান্স করার পর তার পায়ের উপর শেল পড়ে। উনি আমার ৩/৪ গজ দূরে ছিলেন— উনি আগে ছিলেন। আমি শেলের আওয়াজ শুনেই পড়ে

যাই তাই অক্ষত ছিলাম। উনাকে নিয়ে আমরা তখন ব্যাক করি। ইণ্ডিয়ান অ্যাম্বুলেন্স ছিল বালুগ্রামে (বাংলাদেশ)। তাকে ওটাতে তুলে মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেই। তার ছোট ভাই বেলাল, আমি এবং আরও অনেকেই ওখানে ছিলাম। বেলাল, মেজর তাহেরের হাতে ওয়ারলেস ছিল। উনার পায়ে স্প্লিন্টার লাগে দিনের বেলায়।

আমি ২৯শে নভেম্বর রাত ১১টা ৫ মিনিটে গুলি খাই। আমরা অ্যাটাক পার্টি ছিলাম। আমাদের ১০টা কোম্পানি ছিল। কামালপুর ক্যাম্পকে চতুপার্শ থেকে ঘেরাও করে চতুর্দিক থেকে 'জয় বাংলা' বলে শ্লোগান দিয়ে ওদের সারেন্ডার করতে বলি। ওরা চুপচাপ। তারপর আমরা চতুর্দিক ঘেরাও ক্লোজ করতে করতে কাছে আসছি এমন সময় ওরা বৃষ্টির মতো গুলি শুরু করে। কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। ইপিআর ক্যাম্পের সামনে (ইউনিয়ন পরিষদের সামনে) বাজারে একটা বড় বটগাছ ছিল। আমার ১০/১৫ গজ সামনে দিয়ে দুজন পাক আর্মি যাচ্ছিল। আমি আমার হাতের স্টেনগান (SMC) দিয়ে বার্স্ট করি।

আমার কখন গুলি লাগে টের পাইনি। কে কোথা দিয়ে গুলি করছিল তাও দেখিনি। আমি তখনো গুলি চালাচ্ছি। হঠাৎ ইন্ডিয়ান হাবিলদার বলে উঠেন, রহমানকো যা'দা চোট লাগা।' ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন বলে উঠল, 'উসকো আন্দারমে ভেজ দো'। আমার থাই এর দিকে তাকিয়ে রক্ত দেখতে পাই। তারপর সেখানে হাত দিয়ে প্রচুর রক্ত দেখতে পেয়ে পড়ে যাই। আমাকে কাঁধে করে ১০/১৫ গজ দূরে এক ড্রেনে রেখে আসা হয়। ঐ ড্রেনে আমার ১০/১৫ গজ দূরে একজন যোদ্ধাকে পড়ে থাকতে দেখি। আমার ধারণা ছিল সে ইন্ডিয়ান আর্মির সদস্য। ওর সাথে আমার 'মামা' 'মামা' বলে কথা হয়। আমরা ও ইন্ডিয়ান আর্মি পরস্পরকে 'মামা' বলতাম। ও আমাকে বলছিল, 'মেরা যাদা চোট লাগ গিয়া ইধার আও। আমিও ওকে একই কথা বললাম, 'মেরা যাদা চোট লাগা ইধার— হঠাৎ ও বলে উঠল 'ইয়া আলী' বুঝলাম যে লোকটা পাক আর্মি তারপর আমি চুপ হয়ে গেলাম ও আস্তে আস্তে ক্রলিং করে ব্যাক করে সিএন্ডবি রোডে উঠলাম। তারপর ধানোয়ার দিকে আস্তে আস্তে যেতে লাগলাম।

তারপর এমন জায়গায় আসলাম যেন কামালপুর থেকে গুলি আসলেও মরব না, আবার ধানোয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিও যেন না লাগে। ঐ টাইম থেকেই খুব চীৎকার করতে থাকি আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। ওদের কয়েকজন জিজ্ঞাসা করল আমি কে? সব বলার পরও কেউ বিশ্বাস করল না। আরও কিছু এ্যাডভান্স করলাম। ওদের ডাকলাম। কেউ সাউণ্ডই দিল না। আমি একটা বাঁশের ব্রীজের (ধানোয়ার সামনে ও কামালপুরের পিছনে— দুই গ্রামের মাঝামাঝি) পূর্বদিকে ছিলাম। ভোরের দিকে আমাদের ছেলেরা গলার আওয়াজ শুনে আমাকে চিনতে পারে। ওরা স্টেন গান, গ্রেনেড ইত্যাদি নিয়ে আসছিল তখন ১০/১৫ গজ দূরে থাকতেই বলে উঠলাম, 'আমাকে মারতে লাগবে না, আমি মতি।' আমাকে চিনতে পেরে অস্ত্র ফেলে ওরা উদ্ধার করতে এল। আমাকে উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গেই আমি সেন্সলেস্ হয়ে যাই। আমাকে তুলে প্রথমে আমাদের বাংকারে নেয়া হয়— প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য। ওখানে ক্যাপ্টেন মান্নান ছিলেন (ধানোয়ার চার্জে ছিল ক্যাপ্টেন আজিজের নেতৃত্বে কাট অ্যাপ পার্টি)। মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে ঐ দিনই তুরাতে (মিলিটারী হসপিটাল) নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে ২/৩ দিন ছিলাম। ওখান হতে আমাকে শিলং আর্মি হসপিটালে নিয়ে যায়। শিলং-এ ১৭/১৮ দিন ছিলাম।

এই সময় ডাক্তাররা আমার রক্ত পড়া বন্ধ করতে পারেননি। আমি শিলং থাকার সময়ই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। ১৬ই ডিসেম্বর যখন দেশ স্বাধীন হয় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা খবর পাই। ডাক্তার নার্সরা খুব আনন্দ করতে লাগলো- বাংলাদেশ আজাদ হো গিয়া। আমার যতটুকু সেন্স ছিল খুবই আনন্দ লাগলো।

ডিসেম্বরের ১৭ তারিখে আমাকে গৌহাটি পাঠিয়ে দেয়া হয়। এখানে পায়ের রক্ত পড়া বন্ধ হয়। গৌহাটিতে বেশ কয়েকদিন ছিলাম। এখানে জেনারেল ওসমানী আমাদের দেখতে যান। আমাকে ১০০০ টাকা দেন। কাপড়-চোপড় দেন। পড়ার জন্য বাংলা বই দেন। ডাক্তার নার্সদের ভালোভাবে চিকিৎসা করবার জন্য নির্দেশ দেন।

পা কেটে ফেলার জন্য আমাকে গৌহাটি হতে পুনা কম্বাইণ্ড মিলিটারী হাসপাতালে পাঠানো হয়। আমি যেদিন গৌহাটি পৌঁছি তার ২/৩ দিন আগে মেজর তাহের পুনা চলে যান। আমি পুনাতে পৌঁছে তার সাক্ষাৎ পাই।

একদিন সন্ধ্যায় নাটক দেখার জন্য আমার হুইলচেয়ার একজন হাবিলদার যখন ঠেলে হলরুমে নিয়ে যায় তখন মেজর তাহের গাড়ি হতে ক্রাচে ভর করে নামেন। আমাদের চোখে চোখে পড়ে যায়। আমার চোখ পানিতে ছলছল করে উঠে। তার চোখেও পানি। উনি কামালপুরের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। আমাকে সান্ত্বনা দেন, তোরতো পা আছে, কান্দস কেন? তুইতো ডাকাতি বা চুরি করতে যাসনি..." কামালপুরে কে কে আহত বা নিহত হয় তার খোঁজ খবর নেন। এই দিন আর নাটক দেখা হয়নি, যে যার ওয়ার্ডে চলে যাই। মেজর তাহেরের সঙ্গে এরপর প্রায়ই দেখা হত।

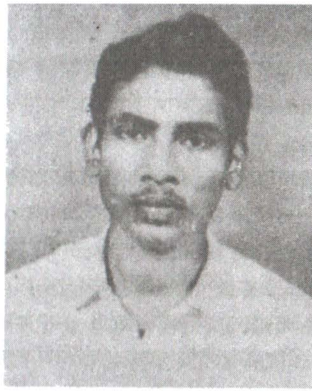
আমার ইনচার্জে যে মেজর ছিলেন মেজর তাহের তাকে ডেকে বললেন, আমার যা যা দরকার তা যেন দেয়া হয়। টাকার দরকার হলে তার (তাহের) কাছ থেকে নিতে বলেন। পরে তার ভাই ইউসুফ আমাদের দেখতে যান ও টাকা পয়সা দেন।

ইন্দিরা গান্ধী আমাদের দেখতে যান। আমাকে একটা এক ব্যাণ্ড Vosh রেডিও দেন। নতুন কোম্পানির নতুন রেডিও। তখন আমি ৮নম্বর ওয়ার্ডে ছিলাম। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিংও আমাদের দেখতে আসেন। উনি প্রত্যেককে একটা করে বড় স্টীলের প্লেট দিয়েছিলেন। এখনও প্লেটটা রাখা আছে। বাড়িতে গেলে মাঝে মাঝে ওটাতে ভাত খাই। এছাড়াও আরো অনেকে দেখতে যান ও টুকটাক জিনিস দেন। তাদের নাম মনে নেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ গিয়েছিলেন।

পুনায় মেজর তাহেরের রুমে আমরা সময় কাটাতাম। তিনি অফিসার্স কেবিনে থাকতেন। একদিন আমরা তার রুমে বসে ফলমূল খাচ্ছি এমন সময় একটা চিঠি পড়ে উনি হাসলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বললেন যে তার প্রমোশন হয়েছে— লে. কর্নেল হয়েছেন। তিনি বললেন, এটার দরকার ছিল না। ওসমানী সাহেব চিঠিটা দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশে ফেরত আসি মে মাসে (৭২)। পুনাতে শেষের দিকে হাঁটতে পারতাম। পুনা থেকে ট্রেনে করে ব্যারাকপুর তারপর কোলকাতা থেকে প্লেনে করে ঢাকা আসি। ঢাকায় আমি ভর্তি হই CMH-এ।

সামগ্রিক ভাবে যুদ্ধের জন্য ১৯৭৩ সালে 'বীর প্রতীক' উপাধী পাই।



শহীদ খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া, বীর উত্তম

খাজা নিজামউদ্দিন ১৯৪৯ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারি কুমিল্লার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিজামউদ্দিনের গ্রামের বাড়ি ছিল কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার মালাপাড়া গ্রামে। পিতা আবদুল লতিফ ভূঁইয়া একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি সাব ডিভিশনাল ম্যানেজার, গভ: একোয়ার্ড এস্টেট্স পদে ছিলেন, চাকুরি জীবনে অত্যন্ত সৎ ও দক্ষ অফিসার হিসেবে তার সুনাম ছিল। মাতা মরহুমা তাবেন্দা আখতার খাতুন গৃহিণী ছিলেন। উভয়েই ১৯৭১ সালের পর মৃত্যুবরণ করেন। ছয় ভাই ও তিন বোনের মধ্যে নিজাম ছিলেন দ্বিতীয়।

শহীদ নিজামের পিতা একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন বিধায় তার শিক্ষাজীবন দেশের বিভিন্ন জেলায় সম্পন্ন হয়েছে। কুমিল্লা গিরিধারী প্রাইমারী স্কুলে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। অরুন চন্দ্র হাইস্কুল-নোয়াখালী, ফেনী জুনিয়র হাই স্কুল, নারায়ণগঞ্জ বার একাডেমী, নুরুল হক চৌধুরী হাই স্কুল-কাটলী, চট্টগ্রামে বিভিন্ন সময়ে পড়ালেখা করেছেন। পরে ১৯৬৪ সনে চট্টগ্রাম জে, এস, সেনস ইনস্টিটিউট থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেন। উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষ চট্টগ্রাম সরকারি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ে পড়েছিলেন, পরে ১৯৬৬ সনে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৬ সনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনায় সম্মানে ভর্তি হন। ১৯৬৯ সনে সম্মান কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। পরে দিবাতে এম. কম. আর নৈশতে এম. বি. এ. পড়তেন। ১৯৭০ সনে তিনি এম. কম পরীক্ষা শেষ করেন। উপরোক্ত সব পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণী লাভ করেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। যখন তিনি দশম শ্রেণীতে পড়তেন (জে. এম. সেনস ইনস্টিটিউট) তখনও তার কয়েকটি লেখা বিভিন্ন বার্ষিকী ও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে তার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অনুরাগ আশাতীতভাবে বেড়ে যায়। *কালচক্র* নামে একটি অনিয়মিত সাহিত্য সংকলন ইব্রাহিম রহমান ও খাজা নিজামউদ্দিনের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

বাণিজ্য অনুষদে সাহিত্য, সংগীত ও ক্রীড়ায় তার যথেষ্ট নৈপুণ্যের ছাপ ছিল। একজন গীটার বাদক হিসেবে তার সুনাম ছিল। অনেক অনুষ্ঠানে তিনি গীটারের সুরে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। তার গীটার শিক্ষক ছিলেন বোরহান আহমেদ।

১৯৬৯ সালের 'কালচক্র' এর ২১শে সংকলনটিতে (সম্পাদনা ইব্রাহিম রহমান ও খাজা নিজামউদ্দিন) তার নিম্নোক্ত কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

প্রিয়তমাসু
আমার সময়ের রাজ্যে
তোমার সংগীত ঐকতান তোলে
মিছিলের উচ্চকিত ধ্বণির মতো
আমার নিভৃত জাগ্রত করে
আমি শুনি, কান পেতে শুধু শুনি।

অনবরত ভাবনার পাহাড়ে
ইচ্ছার দ্যুতিময় স্রোতে
তোমার সোহাগী দৃষ্টির দংশিত প্রসাদ।
সম্পন্ন প্রভাব অনায়াস প্রলুব্ধ করে
কাব্যিক রঙে নিজেকে প্রেমিক রাখি।

কিন্তু
রক্তের বিপন্ন উচ্ছ্বাসে যখন
উদ্দাম ফাগুনের পরশ লাগে
করবী আর পলাশের লালে
মৃত ভায়েরা এসে দাঁড়ায় তৃষ্ণার
নির্যাতনে ক্লিস্ট ছায়া ফেলে
আমি অস্থির হই
দংশিত বিবেক নির্ভীক চেতনায় প্রজ্বলিত হয়।

প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রণে তাই
তোমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতির ন্যায়
ভাইদের ক্ষুধিত আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে
নিশ্চিত সংগ্রামের শপথ নিলাম।

১৯৭১ সনের জানুয়ারিতে তিনি তৎকালীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (বর্তমানে ঢাকা শেরাটন)-এ 'কন্ট্রোলার অফ একাউন্টস' হিসেবে যোগদান করেন। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত তিনি সেখানে চাকুরি করেন।

১৯৬৯ সালের ২৭শে জুন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। সংগঠনের কিছু সদস্য সন্ধ্যায় এলিফেন্ট রোডস্থ হোটেল কামপালায় এক সম্মেলন অনুষ্ঠান করে। শহীদ খাজা নিজামউদ্দিন ছিলেন সেই সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা। হোটেল কামপালার সম্মেলনের এক মাসের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের (একাংশ) নাম পরিবর্তন করে 'বাঙলা ছাত্রলীগ' রাখা হয়। খাজা নিজামউদ্দিন বাঙলা ছাত্রলীগ জাতীয় কার্যকরী সংসদের প্রমোদ-সম্পাদক নিযুক্ত হন।

মুক্তিযুদ্ধে ৯ জন গণযোদ্ধাকে 'বীর উত্তম' বীরত্ব উপাধীতে ভূষিত করে সরকার। খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া তাদেরই একজন।–সম্পাদক

শহীদ নিজামউদ্দিনের ছোট ভাই (তৃতীয়) শাহজালাল উদ্দিন ভূঁইয়া কুমিল্লায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার অপর ভাই (ষষ্ঠ স্থান) আল্লামা ইকবাল উদ্দিন ভূঁইয়া যশোরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

একাত্তর সনের ২৫শে মার্চের কালো রাতে খাজা নিজাম মহসিন হলেই ছিলেন, পরে তুমুল উত্তেজনা ও সবার ছুটাছুটিতে হল থেকে তিনি বেরিয়ে পড়েন। কিছু দিনের মাঝেই কুমিল্লায় চলে আসেন। ভারতে যাবার পূর্বে তিনি গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার মালাপাড়ায় এসেছিলেন। সেখানে গ্রামের তরুণদের সাথে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, বর্বরদের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে তারা এদেশের কাউকে রেহাই দেবে না। কয়েকজনকে সাথে নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। ভারতে আগরতলায় ইন্দ্রনগরে খাজা নিজাম দুমাসের ট্রেনিং গ্রহণ করেন। প্রথম ট্রেনিং ক্যাম্প সিমানা নামক স্থানে হয়েছিল। ট্রেনিং শেষে সীমান্ত পার হয়ে নিজাম তার বাহিনী নিযে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। জালালপুরে তাদের ছাউনি স্থাপিত হয়। নিজাম গণবাহিনীর যোদ্ধা হিসেবে ৪ নম্বর সেক্টরের জালালপুর সাব-সেক্টরের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড পদে ছিলেন। তার অধীনে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ছিল ৪৮৬ জন এবং দায়িত্ব ছিল সিলেটের তেলিয়াপাড়া থেকে শেরপুর নদীঘাট অঞ্চল। ছোট ছোট দলে বিভক্ত এই মুক্তিযোদ্ধাদের উপর দায়িত্ব ছিল কয়েকটি ঘাঁটির—কানাইঘাট, মমতাজগঞ্জ, ভরামহিদ, নক্তিপাড়া, মনিপুর ও সড়কের বাজার।

প্রধানত সড়ক সেতুর উপর তারা আঘাত হানেন। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অগ্রভিযান ব্যহত হয়। নিজেদের গোপন করে শত্রুকে নির্মূল করার গেরিলা পদ্ধতির লড়াইয়ে কমাণ্ডার নিজামের বাহিনী দক্ষতার পরিচয় দেয়। তাদের অভিযানে অনেক পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। সিলেটের টেলিফোন টাওয়ারও এই বাহিনীর বোমায় উড়ে যায়। সামরিক বাহিনীর যোগাযোগ ব্যহত হয়। পাক অগ্রাভিযান রোধের জন্য ৪ই সেপ্টেম্বর রাতের আঁধারে নিজামের বাহিনী সড়কের বাজারের নিকটস্থ পাকা পুল উড়িয়ে দেবার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যায়। নিজাম ছিলেন তার বাহিনীর পুরোভাগে। যথাসময়ে সতর্কতার সঙ্গে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে পুলের সঙ্গে বিস্ফোরক স্থাপন করে তারা নিরাপদ দূরত্ব সরে যান। পুল ভাঙার ভীষণ শব্দ রাতের নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে দেয়।

পাক বাহিনী আশেপাশেই ওৎ পেতে ছিল। সম্মুখ সমর, এলোপাথারী গোলাগুলি

সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায়। নিজাম ক্ষিপ্রগতিতে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে আদেশ তদারক করছিলেন। নিজেও গুলি ছুড়ছিলেন। হঠাৎ ওপার থেকে তার উপর একটা গোলা এসে পড়ে। আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন নিজাম। উভয় পক্ষেই হতাহত হয়। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তখনও জানা যায়নি। দীর্ঘ ছয় ঘন্টা যুদ্ধের পর যখন পাক বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়। তারপর মুক্তিবাহিনী নিজামের লাশ নিয়ে নিজ শিবিরে ফিরে।

মোকামটিলার তিন কামেল পীর হযরত পাতা শাহ (রঃ), হযরত গুল শাহ্ (রঃ) ও হযরত নীল শাহ্ (রঃ), তাদের সমাধির পাশেই তাকে দাফন করা হয়। তার স্মরণে ভরামহিদ, নক্তিপাড়া, উজানপুর, মোকামটিলা, সড়কের বাজার ইত্যাদি স্থানগুলোর নাম এলাকাবাসী 'নিজামনগর' রাখেন (বেসরকারী ভাবে প্রচলিত, সরকারি তরফ থেকে ঘোষণা হয়নি)। সিলেট জেলা পরিষদ ও এলাকাবাসী খাজা নিজামের কবরটি পাকা করে দেন।

শহীদ নিজামউদ্দিন সম্পর্কে ৪ নম্বর সেক্টরের জালালপুর সাব-সেক্টর কমাণ্ডার মাহবুবুর রব সদী, বীর প্রতীক বলেন,

প্রথম দেখাসাক্ষাতের পর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে কিছুটা অভিনব পন্থায়। বলাবাহুল্য ঐ সময় আমাদের সম্পূর্ণ রূপে সোপর্দ্দ করা হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে। বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক নেতা বা সামরিক কর্মকর্তার সঙ্গে আমাদের আর কোনো যোগাযোগ রইল না। দেশের ভিতরে রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীন কোন্দল মীমাংসার কাজে আমাকে প্রায়ই নিয়োজিত থাকতে হত। আমার মনে পড়ে ২৫শে মার্চ বিকালেও হবিগঞ্জ থেকে নবীগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের একটি অভ্যন্তরীন কোন্দল মীমাংসার দায়িত্ব নিয়ে আমি নবীগঞ্জে যাই। এবং নবীগঞ্জেই ২৬শে মার্চ সকালে ঢাকার ঘটনা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর নামে প্রেরিত টেলিগ্রামটি পাই। দেশের ভিতর রাজনৈতিক কোন্দল যে পর্যায়েই থাক না কেন, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হতেই সকলের চোখে মুখে একটি লৌহ দৃঢ় ঐক্যের ইঙ্গিতই দেখেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিংএ এসে আবার ঐ ধরনের কোন্দলের মোকাবেলা করতে হবে এবং সেই কোন্দলের মধ্যমনি আমাকেই সাজতে হবে এই ধরণের কোনো সন্দেহ ঘুণাক্ষরেই আমার মনে দেখা দেয়নি। জাতীয়তাবাদের চেতনার উল্লম্ফনের ঐ লগ্নে এদেশের সকলেই মনে হয়েছিল অত্যন্ত আপনজন এবং শত্রু বলতে চোখের সামনে ছিল একমাত্র পাকিস্তানিরা। অবশ্য পরে জানতে পেরেছিলাম স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিত্বকে বাদ দিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃবৃন্দের অনেকেই বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন নানারকম কোন্দলের মধ্যে। এবং সে সব কোন্দলের তুলনায় আমাদের ক্যাম্পে প্রথম এবং শেষ একমাত্র কোন্দলটি অত্যন্ত সামান্য ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়।

যাই হোক, আমাদের সেই নাম না জানা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে সিলেট জেলার ছেলেদের সঙ্গে কুমিল্লা জেলার একটি বিরাট দলও যোগ দেয়। আমরা ক্যাম্পে উপস্থিত হওয়ার দ্বিতীয় দিনে ট্রেনিং শুরু হওয়ার আগেই দুইটি ছেলের মধ্যে ঝগড়াকে কেন্দ্র করে সিলেট বনাম কুমিল্লা দলাদলি শুরু হয়ে যায়। উত্তেজনা যখন তুঙ্গে ঠিক তখনই সেই ক্যাম্পের

দায়িত্বে নিয়োজিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেনানায়করা আমার কাঁধে ক্যাম্প কমাণ্ডারের দায়িত্বটি চাপিয়ে দেন। নিজে সিলেটের বাসিন্দা হওয়ায় স্বভাবতঃই কুমিল্লার ছেলেদের আস্থা অর্জন আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কাজেই নানারকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েই কমাণ্ডারের দায়িত্ব নিতে হয় আমাকে। আমি দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুমিল্লার ছেলেদের মধ্যে ক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। এবং পরদিনই ভারতীয় বাহিনীর কমাণ্ডারদের উপস্থিতিতে আমাদের সকলকে এক জায়গায় জড়ো করা হয়। সেই সমাবেশে কুমিল্লার ছেলেদের ক্ষোভের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। পরবর্তীতে কুমিল্লা এবং সিলেটের ছেলেদের আলাদা া হয়। এবং ঐ ক্যাম্পের দায়িত্বে নিযুক্ত ভারতীয় বাহিনীর কমাণ্ডার (যিনি এককা ল বাংলাদেশেরই ফরিদপুরের অধিবাসী ছিলেন) কর্নেল বাগচী কুমিল্লার ছেলেদের প্রশ্ন করেন আমার কমাণ্ড মেনে নিতে তাদের আপত্তি আছে কিনা? এই প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া, কুমিল্লার বীর যোদ্ধা আশরাফ এবং মাহবুব নামক একজনের নেতৃত্বে কুমিল্লা থেকে আগত ছেলেদের একটি বিরাট অংশ আলাদা হয়ে যায়। নিজামউদ্দিন এবং আশরাফ বলেন তারা কোনো অবস্থাতেই অনৈক্যের কারণ হতে রাজি নন। পরবর্তীকালে কুমিল্লা থেকে আগত ছেলেদের প্রায় সকলেই ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং ট্রেনিং অথবা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমাদের মধ্যে আর কখনো জেলাভিত্তিক কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। সকল জেলার ছেলেরা এক সঙ্গে মিলেমিশে একে অপরের জন্য জীবন দিয়েছে।

ঐ ঘটনার আগে নিজামউদ্দিনের সঙ্গে আমার তেমন কোনো হৃদ্যতা গড়ে উঠেনি। সুতরাং বলাই বাহুল্য আমার কমাণ্ড রক্ষার জন্য বরং দেশ ও জাতির স্বার্থে একজন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক হিসাবে যে ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল, সেই ভূমিকাই নিজাম সেদিন গ্রহণ করেছিলেন। এবং তাদের সঠিক ভূমিকা গ্রহণের মধ্যদিয়েই ঘটনাটি অতি অল্পে শেষ হয়েছিল। না হলে এই ঘটনা ক্রমশঃ বিরাট আকার ধারণ করে অন্যান্য ক্যাম্পেও ছড়িয়ে পড়তে পারত। এবং এতে আর কিছু নাহোক অন্ততঃ সিলেট অঞ্চলে স্বাধীনতা যুদ্ধ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। শুধু সেই ঘটনাই নয়, প্রয়োজনের মুহূর্তে নিজাম সব সময়ই একজন নিঃস্বার্থ দেশ প্রেমিকের ভূমিকা পালন করেছেন এবং জীবনের শেষ যুদ্ধে দেশের প্রয়োজনে নিজের জীবনটাকে খোলাম কুচির মতো ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাংলা মায়ের এই দুর্দান্ত দুর্বার সন্তানটি চিরজীবী হয়ে রইলেন।

ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর মাসিমপুর 'ইকো সেক্টর' হেডকোয়ার্টারে অফিসার্স ট্রেনিং-এর জন্য ইন্টারভিউ ঢাকা হয়। আমরা কয়েকজন এই ইন্টারভিউতে যোগ দিতে অস্বীকার করি। এখানে বলে রাখা ভাল সিলেট জেলার বিশাল অঞ্চলকে স্বাধীনতা যুদ্ধে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়। মেজর শফিউল্লার নেতৃত্বে কুমিল্লার একটি অংশ এবং সিলেটের দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় সেক্টর ৩, মেজর চিত্তরঞ্জন দত্তের নেতৃত্বে সিলেট জেলার মধ্য অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় সেক্টর ৪ এবং সিলেট জেলার উত্তর পশ্চিম অঞ্চল নিয়ে মেজর মীর শওকতের নেতৃত্বে গঠিত হয় সেক্টর ৫। আমাদের প্রতিটি সেক্টরের সঙ্গে ট্রেনিং, অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ এবং প্রয়োজন হলে উপদেশ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি করে সেক্টর স্থাপন করা হয়।

আমরা ছিলাম ৪ নম্বর সেক্টরের সঙ্গে শিলচরের কাছাকাছি মাসিমপুরে ভারতীয় বাহিনী যে সেক্টর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে তার নাম ছিল 'ইকো সেক্টর'। আমাদের সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাদের অফিসার্স ট্রেনিং এর প্রথম ব্যাচের ইন্টারভিউ পরিচালনা করেন ইকো সেক্টরের কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার এমবি ওয়াটকে। অফিসার্স ট্রেনিং-এ যোগ দিতে অস্বীকার করার পর আমি অবিলম্বে কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার ওয়াটকের কাছে হাজির হওয়ার নির্দেশ পাই। সেখানে পৌঁছলে ব্রিগেডিয়ার ওয়াটকে আমাকে অফিসার্স ট্রেনিং এ যোগ দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। আমি তাকে আমাদের মতামত স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেই। আমি বলি, আমরা যখন প্রথম ট্রেনিং নিতে আসি তখন বলা হয়েছিল এক সপ্তাহ ট্রেনিং-এর পরই আমরা যুদ্ধে যোগ দিতে পারব। অথচ বিশ দিন বিএসএফ এর কাছে এরপর একমাস আর্মির কাছে ট্রেনিং গ্রহণ করার পর এখন আবার তিন মাসের জন্য অফিসার্স ট্রেনিং এ যেতে বলা হচ্ছে। অপরদিকে আমাদের দেশে শত্রু দিন দিন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, দেশের মানুষের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। আমাদের আর ট্রেনিং এর প্রয়োজন নেই। আমরা অবিলম্বে যুদ্ধে যোগ দিতে চাই। এই বক্তব্যের যুক্তিকে এড়িয়ে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। অবশেষে আমরা অফিসার্স ট্রেনিং থেকে রেহাই পাই। নিজাম এই ব্যাপারেও অত্যন্ত দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনিও অফিসার্স ট্রেনিং এ না গিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। ৪ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমাণ্ডার মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত আমাকে ৪নম্বর সেক্টরের জালালপুর সাব সেক্টরের সাব-সেক্টর কমাণ্ডার নিযুক্ত করলে আমি নিজামউদ্দিন ভূঁইয়াকে জালালপুরের সেকণ্ড-ইন-কমাণ্ড নিযুক্ত করি।

নিজাম উদ্দিন ছিলেন একজন সুপুরুষ। তার উচ্চতা ছিল মাঝারি, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, কখনো কোনো অসুখ বিসুখ হতে দেখিনি। তৎকালীন সময়ে আমাদের আরো অনেকের মতো তারও মুখ জুড়ে গজিয়েছিল কালো দাঁড়ি, তার চোখ দুটিতে ছিল এক ধরনের অদ্ভুত দ্যুতি। চোখে মুখে বাঁধভাঙ্গা তারুণ্যের ছাপ। নিজামের হাসি ছিল অদ্ভুত রকমের সুন্দর। হাসলে তাকে খুব কোমল মনে হত। এই কথাগুলো নিজামউদ্দিনকে অন্য সকলের চেয়ে আলাদা করে দেখানোর উদ্দেশ্যে বলিনি। নিজাম শহীদ হওয়ার পর তার কথা ভাবতে গিয়ে আমার যা যা মনে পড়েছিল সে কথাগুলোই শুধু তুলে ধরার চেষ্টা করলাম মাত্র। নিজাম কথা বলতেন খুব কম। কথা যা বলার ভেবে চিন্তেই বলতেন। স্বভাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন খুব শান্ত। কখনো রাগ করতে দেখিনি, মতামতের দিক থেকে তিনি ছিলেন নমনীয়। তার মতের বিপক্ষে সঠিক যুক্তি তুলে ধরতে পারলে গ্রহণ করতে কখনও দ্বিধা করেননি। তবে এ কথাটাও অস্বীকার করা যায় না যে নিজামের চরিত্রে কিছুটা অন্তর্মুখী ছিলেন। যে কারণে নিজামকে আমি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। অন্তত তার জীবনের শেষ যুদ্ধে যে চরম সাহসিকতা প্রদর্শন করে নিজাম নিজেকে উৎসর্গ করলেন, অত্যন্ত লজ্জা এবং অপরাধবোধের সঙ্গে হলেও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি সেই বীর নিজামকে আমি সেইভাবে আগে চিনতে পারিনি। যদি তখন তাকে ঠিকভাবে চিনতে পারতাম তাহলে হয়তো জালালপুর সাব-সেক্টরের অনেক বীরত্বপূর্ণ ঘটনার (যেগুলোর কথা কেউ কখনও কোথাও লেখেনি এবং ভবিষ্যতে কেউ লিখবে কিনা জানি না) সঙ্গে আরও অনেক চমকপ্রদ ঘটনার সংযোজন ঘটত।

জালালপুর সাব-সেক্টরের মুক্তি সেনারা বেশি দিন ভারতের মাটিতে অবস্থান করেনি। সাব-সেক্টর স্থাপিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে আমরা বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করি। এবং কানাইঘাট থানার লুতাছড়া চা বাগান, মন্তাজগঞ্জ মনিপুর টিলা, জকিগঞ্জ থানার কারবালা, রবুর চর, আটগ্রাম, আমলসিদ ইত্যাদি জায়গায় সাতটি অ্যাডভান্স ক্যাম্প স্থাপন করি এবং খুব সম্ভবত জুলাই মাস থেকেই ঐ সব এলাকায় বাংলাদেশের পতাকা উড়তে থাকে। লুতাছড়াতে স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে একটি প্রশাসনিক কমিটিও গঠন করে দিয়েছিলাম। এই ক্যাম্পগুলো স্থাপন করে ভারতের জালালপুর থেকে সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার লুতাছড়াতে স্থানান্তরিত করে আমি লুতাছড়া কাম্পের দায়িত্ব গ্রহণ করি। নিজামউদ্দিন কে সাব-সেক্টর টুআইসির পদে বহাল রেখে মন্তাজগঞ্জ ক্যাম্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই মন্তাজগঞ্জেই শহীদ নিজাম এখন শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন।

বাংলাদেশের ভিতরে ক্যাম্প স্থাপনের ব্যাপারে ভারতীয় সেনানায়কদের তরফ থেকে প্রথমে খুব আপত্তি উঠে। পরে বহু রকম তর্ক বিতর্কের পর তারা রাজি হন। এই বিষয়েও শহীদ নিজাম আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

শহীদ নিজাম যে যুদ্ধে শহীদ হন সেই যুদ্ধের সম্পর্ক বিচার করতে হলে আরেকটি বিষয় সুস্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন যে, বাধ্য হয়ে ভারতীয় বাহিনীর কাছে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ভারতে গেলেও আমি ভারতীয় বাহিনী সম্বন্ধে কখনো সম্পূর্ণ সন্দেহ মুক্ত হতে পারিনি। আমার সব সময়ই মনে হত পাক সেনারা পরাজিত হওয়ার পর আমাদেরকে আরেকটি সুদীর্ঘ গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সেই যুদ্ধ হবে ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। যদিও ভারতীয় সরকারের-পরবর্তী আচরণ আমার এই সন্দেহকে সম্পূর্ণ অমূলক প্রমাণ করেছে, তবুও তৎকালীন অবস্থায় মনের গভীরে এই সন্দেহ পোষণ না করে আমি পারিনি। বাংলাদেশের ভিতরে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে ক্যাম্প স্থাপনের জন্য আমার এত উৎসাহের পিছনে প্রধান কারণ ছিল যতদূর সম্ভব ভারতীয় বাহিনীর আওতার বাইরে থাকা। যদিও ভারতীয় বাহিনীর কম্যাণ্ডারবৃন্দ ব্রিগেডিয়ার ওয়াটকে, কর্নেল বাগচী, মেজর মুখার্জি, মেজর দাস, কাপ্টেন কুমার, ক্যাপ্টেন চান, এদের সকলের সহৃদয় ব্যবহার এবং সহযোগিতার কারণে আমাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে চিরকালের জন্য তাদের কাছে ঋণী থাকতে হবে। তবুও রণনীতি ও রণকৌশলগত নানারকম ব্যাপারে তাদের অনেক পরামর্শই আমি মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারতাম না। স্বভাবতঃই কার্যক্ষেত্রে আমি তাদের অনেক পরামর্শ পাশ কাটিয়ে চলার চেষ্টা করতাম। প্রধানতঃ যে বিষয়টিতে জটিলতা সৃষ্টি হয়। সেটি হচ্ছে শত্রু সেনার কার্যকর ক্ষতিসাধন করতে পারার সম্ভাবনা না থাকলে আমি আমার ছেলেদের কোনো ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে রাজি হতাম না। ওদের পরামর্শে আমার মনে হত ওরা চায় আমাদেরকে দিয়ে পাকসেনার যতটুকু সম্ভব ক্ষতিসাধন হবার হোক, আমরাও যেন ধ্বংস হতে থাকি।

নিজামউদ্দিনের আত্মেৎসর্গ ঘটনার সাক্ষাৎদর্শী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। সেদিনের যুদ্ধে তার সঙ্গের মুক্তিযোদ্ধাদের যারা জীবিত ফিরে এসেছিল তাদের কাছে শোনা বর্ণনার যেটুকু মনে করতে পারছি তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য হচ্ছি। ঠিক

আগের মতই একটি চরম সংকটময় মুহূর্তে দেশ ও জাতির স্বার্থে যে বিশেষ ভূমিকা পালনের প্রয়োজন ছিল, নিজের জীবনকে বাজী রেখে সেই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের প্রশ্নে নিজাম হেরে গেলেন। আর মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাসে একটা দুর্বার দূরন্ত প্রেরণা হয়ে নিজাম জিতে গেলেন চিরদিনের মত। আর কেউ কোনোদিন কোথাও তাকে হারাতে পারবে না। নিজামের ছোট দলটি সংখ্যার দিক থেকে প্রায় দশগুন একটি নিয়মিত পাক সেনাবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। পাক বাহিনীর তুলনায় তাদের অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল নিম্নমানের। তুমুল গুলিবর্ষণের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা হতাশ হয়ে পড়ে এবং পিছু হটতে শুরু করে। ঠিক এই সময় নিজাম এলএমজি ম্যানের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শত্রুর উপর গুলি চালাতে থাকেন। পিছন থেকে সঙ্গীরা তাকে বসে পড়ার জন্য অনুরোধ করলে নিজাম জবাব দেন, 'আমার গায়ে পাঞ্জাবীর গুলি লাগবে না। তোরা সব সামনে এগিয়ে আয়, মার দুশমনদের'। আমাদের ছেলেরা আবার নতুন উদ্যমে আবার এগিয়ে যায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজামের গায়ে গুলি লাগে। বেপরোয়া নিজাম এর পরও গুলি চালাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেননি, মাটিতে ঢলে পড়েন। মাটিতে শুয়ে শুয়েও তিনি যুদ্ধের নির্দেশ দিতে থাকেন। আর সঙ্গীদের অনুরোধ করেন তার লাশ যেন ফেলে আসা না হয়।

সকল দিককে সম্পৃক্ত করে নিজামউদ্দিনের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের মূল্যায়ন এই পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কারণ নিজাম শুধু একজন ব্যক্তিই নন। নিজামউদ্দিন একটি প্রতীক। যে লক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল সে লক্ষ আজো বাস্তবায়িত হয়নি। প্রতিক্রিয়া নামক অক্টোপাসের অসংখ্য হাতের বাঁধনে আবদ্ধ আজকের বাংলাদেশের বিকৃত সমাজে শহীদ নিজামের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। নিজাম একটি জনগোষ্ঠীর মুক্ত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার ইচ্ছার প্রতীক। সফল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই লক্ষ, সেই ইচ্ছা যেদিন বাস্তব রূপলাভ করবে, সেদিন সে সমাজের বিকাশের মধ্য দিয়েই কেবল শহীদ নিজামউদ্দিনের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে। তবু অপ্রিয় হলেও একটি সত্য ঘটনা তুলে না ধরে পারছিনা যে, শহীদ নিজামকে বীর উত্তম উপাধিতে ভূষিত করে কর্তৃপক্ষ তাকে সম্মানিত করতে পারেননি। বরং তারা তাদের নিজেদের হীনমন্যতাই প্রকাশ করেছেন। শুধু নিজামের বেলায়ই নয় 'গ্যালান্ট্রি এওয়ার্ডে'র তালিকাটি দেখলে যে কোনো বিবেকবান ব্যক্তির চোখেই একটি বৈষম্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বাইরে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা শহীদদের মধ্য থেকে একজনকে মরনোত্তর এবং সর্বোচ্চ উপাধি 'বীর শ্রেষ্ঠ' প্রদান করা হয়নি। এফ. এফ (Freedom Fighters) এম, এফ (মুক্তি ফৌজ), বিএলএফ (Bangladesh Liberation Force), C-in-C Spectial ইত্যাদি সকল রকম বাহিনীর শহীদদের মধ্যে মরনোত্তর বীর উত্তম দেওয়া হয় মাত্র একজনকেই। তিনি হচ্ছেন শহীদ নিজামউদ্দিন। শুধুমাত্র কাদের সিদ্দীকির বাহিনীকেই গণবাহিনী নামে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে কাদের সিদ্দীকিসহ কয়েকজনকে বীর উত্তম উপাধি দেওয়া হয়েছে। কাদের সিদ্দীকি যদি বঙ্গবন্ধু না আসা পর্যন্ত

অস্ত্রসমর্পন বন্ধ রেখে এবং পরে বঙ্গবন্ধুর কাছে অস্ত্র জমা দিয়ে তার নিজের এবং তার বাহিনীর স্বতন্ত্রের স্বীকৃতিটুকু আদায় না করতেন তাহলে তিনি নিজেও এই উপাধি পেতেন কিনা সন্দেহ।

যাই হোক মুক্তিযুদ্ধে, গ্যালান্ট্রি এওয়ার্ড বিতরণে স্বজনপ্রীতির এই নমুনা সমগ্র জাতির জন্য চরম লজ্জাকর হলেও এই সত্যটি উল্লেখ না করে পারলাম না। আমার জানা নেই গ্যালান্ট্রি এওয়ার্ড বিতরণে প্রধান কর্তৃপক্ষ কারা ছিলেন। যদি বেসামরিক কর্তৃপক্ষ হয়ে থাকেন তাহলে বলতে হয়, সামরিক বাহিনীকে খুশি রাখার জন্যই এরকম করা হয়েছে। আর যদি সামরিক কর্তৃপক্ষ করে থাকেন তাহলে বলতে হয় তাদের মধ্যে এক ধরনের সামরিক অভিজাত্য বোধজনিত পক্ষপাতিত্ব কাজ করছে।

১৯৭৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শহীদ খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়াকে মরণোত্তর 'বীর উত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন। এ সম্বন্ধে মুক্তিযুদ্ধকালীন ৪ নম্বর সেক্টর কমাণ্ডার মেজর (অব:), মেজর জেনারেল সি, আর, দত্তের বক্তব্য :

সাহসকিতাপূর্ণ অবদান ও বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে বীর শ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করার জন্য ৪ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে সরকারের কাছে আমি সুপারিশ করেছিলাম।

শহীদ খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়াসহ এসব অমন সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা পাঠ্যসূচিতে স্থান দিলে আগামী দিনের বংশধররা দেশপ্রেমের শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা লাভ করবে। এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।



হাবিলদার আরব আলী, বীর বিক্রম

সিলেট জেলার কোতয়ালী থানার লতিফুর গ্রামে ১৯৩৪ সালের ১লা জুলাই আমার জন্ম হয়। আমার পিতার নাম মো. মাহমুদ আলী ও মাতা হারিজা খাতুন, গৃহস্থী তাদের পেশা ছিল। আমরা মোট সাত ভাই বোন। সকলের মধ্যে আমি তৃতীয়। আমি সিলেটের রাজা জি. সি. স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছি।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে প্রাক্তন ইপিআর বাহিনীতে চাকুরিরত ছিলাম। এরও আগে পুলিশ বাহিনীতে ছিলাম। ১৯৫৮ সালে ইপিআর এ যোগ দেই। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কোনো পদোন্নতি পাইনি। মুক্তিযুদ্ধের পরে প্রমোশনে হাবিলদার পদবী পাই।

আমি মুক্তিযুদ্ধের আগে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলাম না বা সমর্থকও ছিলাম না।

আমার বড়ভাই মকবুল আলী (প্রাক্তন ইপিআর এর হাবিলদার) মুক্তিযুদ্ধে জড়িত ছিলেন। দিনাজপুরে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। এখনও দিনাজপুরে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করছেন।

২৫শে মার্চ চুয়াডাঙ্গায় ৪র্থ উইং-এর ডি কোম্পানির ১২ প্লাটুনের সেকশন কমাণ্ডার হিসেবে বর্ণি BOP তে ছিলাম। ২৬শে মার্চ কোর্ট চাঁদপুর ডিফেন্সে ছিলাম। ৩১শে মার্চ পিছু হটে রাজাপুর ও দর্শনায় প্রায় ১৪ দিন পর্যন্ত ডিফেন্সে ছিলাম। ১৬ই এপ্রিল চুয়াডাঙ্গার মুজিবনগরে উপস্থিত হই। ২৭শে এপ্রিল বেনাপোল ডিফেন্সে যোগ দেই। সেখানে আমরা সব ইপিআর একত্রিত হই। এরপর পাক হামলার পর আমরা ভারতের মধ্যে বনগাঁও ক্যাম্প করি। বনগাঁয়ে প্রায় ৭/৮ দিন থাকার পর ডিফেন্সের জন্য সেক্টর ভাগ করে দেয়া হয়। এরপর ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাব-সেক্টরে যোগ দেই ও কর্তব্যরত থাকি।

আমার প্রশিক্ষণদাতারা ছিলেন প্রাক্তন ইপিআর কর্নেল আব্দুল লতিফ ও (ইপিআর) উইং কমাণ্ডার মেজর আতাউর রহমান চৌধুরী (কুমিল্লায় বাড়ি)।

৮ নম্বর সেক্টরের অধীনে বয়রা ও কাশীপুর (ভারত ও বাংলাদেশ) এই দুই জায়গা হতেই মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি।

একাত্তরের মে মাসের ৮ তারিখ সকাল আটটার সময় বাংলাদেশের কাশীপুর

এলাকায় যখন পাক বাহিনী এসে অত্যাচার আরম্ভ করে তখন ঐ এলাকার জনসাধারণ ভারতের দিকে আশ্রয়ের জন্য চলে যেতে থাকে। এই জনসাধারণ তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা আমারে জানায়। আমাদের ব্যাটেলিয়ান কমান্ডার ক্যাপ্টেন খন্দকার নজমুল হুদা আমাকে ডেকে পাক ফৌজ যে কাশীপুরে হামলা করেছে এটার কী প্রতিকার করা যায় তার পরামর্শ দিতে বলেন। উত্তরে আমি আমার কমাণ্ডারকে বলি যে আমি আমার অধীনস্থ সবাইকে নিয়ে পাক বাহিনীর মোকাবিলায় যেতে প্রস্তুত আছি। তিনি আমাকে যাবার জন্য আদেশ দেন। তখন আমি আমার অধীনস্থ সবাইকে নিয়ে কাশীপুর সীমান্তে যাই এবং সেখানে সবাইকে রেখে আমি ল্যান্স নায়েক আবুল হুসেনকে সাথে নিয়ে পাক ফৌজের গতিবিধি দেখার জন্য দখলদারদের এলাকায় চলে যাই। কাশীপুর যাবার পর দেখতে পাই যে একটা পাকা বাড়ির চারদিকে পাকবাহিনী আনাগোনা করছে। তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমরা মাত্র দুইজন লোক এবং আমাদের কাছে হাতিয়ারও দুইটা, কিছু হ্যাণ্ড গ্রেনেড আর দুইটা মাত্র পিস্তল। দুশমনের মোকাবিলায় এগুলো যৎসামান্য। আর আমাদের সাথীদের খবর দেবার মতো অবস্থাও ছিলনা, কেননা পাক হানাদার বাহিনী তখন যশোর ক্যান্টনমেন্টের দিকে রওয়ানা দিয়েছে। সুতরাং কোনো বিকল্প রাস্তা না দেখে তাদের পিছু পিছু পাটক্ষেতের ও ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে অনুসরণ করতে থাকি। হানাদার বাহিনী তখন বেলচা গ্রাম অতিক্রম করে সামনের দিকে যেতে থাকে। সামনে তিন মাইল দূরে ছুটিপুর গ্রাম। এর আগেই আমরা আমাদের সুবিধার জন্য খালপার পাড়ার কাছে যশোর যাবার রাস্তাটা কেটে রেখেছিলাম। হানাদার বাহিনী তখন বেলচা গ্রাম অতিক্রম করে সামনের দিকে যেতে থাকে। সামনে তিন মাইল দূরে ছুটিপুর গ্রাম। এর আগেই আমরা আমাদের সুবিধার জন্য খালপার পাড়ার কাছে যশোর যাবার রাস্তাটা কেটে রেখেছিলাম। হানাদার বাহিনী যখন কাটা রাস্তার উপর চলে আসে তখন আমি ও আমার সাথী অপারেশনের জন্য বেলচা গ্রামের একটা ভিটা বাড়ির আড়ালে প্রস্তুত হই। আমার সাথীকে রাস্তার অন্যপাশ হতে পজিশন নেবার জন্য বলি। আর তাকে এই বলে উপদেশ দেই যে ওরা কোনো হামলার আশংকা না করে অপ্রস্তুত অবস্থায় চলছে। আমরা তাদেরকে এই রকম অপ্রস্তুত অবস্থায় আর পাবনা তাই আমি গুলি করার সাথে সাথে তুমিও গুলি চালিও। যখন দেখি যে তারা আমার রেঞ্জের বাইরে চলে যাচ্ছে তখন আমি নির্দ্বিধায় গুলি ছুড়ি। সাথে সাথে একজন রাজাকার ও একজন পাকফৌজ ঢলে পড়ে। আমার সাথীও সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুড়তে শুরু করে। পাকবাহিনী কোনোরকম আড়াল না পেয়ে প্রাণভয়ে সামনের দিকে দৌড় দিতে থাকে। সাঁতার না জানাতে অনেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য পানিতে পড়ে ডুবে মরে ও অনেকে পাটক্ষেত দিয়ে সামনের দিকে ছুটতে থাকে।

আমাদের কোনো খবর না পাওয়া সত্ত্বেও আমার গুলির আওয়াজ শোনা মাত্র আমার কোম্পানির জোয়ানরা দৌড়ে আসতে থাকে ও আমাদের ওপর দিয়ে গুলি শুরু করে। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে আমার লোকজন না পাকফৌজ গুলি আরম্ভ করেছে। ইতস্ততঃ করে আমরা দুজন পাটক্ষেতে লুকিয়ে কারা গুলি করছে তা দেখার জন্য সচেষ্ট হই। দেখি যে আমাদের রশিদ হাবিলদার গুলি চালাচ্ছে। তখন আমি আমার সাথীকে নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে জোরে আওয়াজ দিয়ে তাদেরকে এগিয়ে যেতে বলি।

তারা পাক বাহিনীকে ধরার জন্য এগিয়ে যায়, তাদের সাথে আমিও যাই। কাটা রাস্তা অতিক্রম করে পানি পার হয়ে পাকফৌজ যখন ছুটিপুরের দিকে পালাচ্ছিল তখন আমরা পজিশন নিয়ে গুলি শুরু করি এবং খাল পাড় হয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে ছুটিপুর পর্যন্ত যাই। ছুটিপুর পৌঁছে পাকফৌজ তাদের গাড়িগুলো নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়। কিন্তু গাড়ি তিনটা কাদামাটিতে ডুবে যায়। তারা সেখানে পজিশন নিয়ে আমাদের উপর হামলা করে।

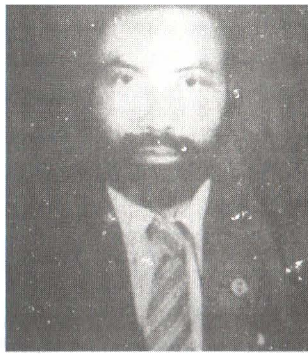
আমার সাথীরা পজিশন নেবার পর পেছন দিকে ক্লিয়ার কি না দেখার জন্য আমি পিছনে চলে আসি। বেলচা গ্রামে আসার পর দেখতে পাই যে সুবেদার মনিরুজ্জামান আমাদের সাহায্য করার জন্য আরও এক প্লাটুন জোয়ান নিয়ে আসছেন। আমি তাকে নাভাবনের রাস্তায় একটা সেকশনকে ডিফেন্স বসাতে বলি এবং কবিপুর মাঠে অন্য একটা সেকশনকে ডিফেন্স বসাতে বলি। তাকে কাশীপুর স্কুল থেকে অ্যামুনিশন সাপ্লাই দিতে বলি। আমি গ্রামের ভিতর দিয়ে রেকি করে আমার অগ্রবর্তী দলের সাথে মিলিত হবার সময় পথে দেখতে পাই যে বেলচা গ্রামের পূর্বদিক থেকে পাক বাহিনী পশ্চিম দিকে পজিশন নিয়ে আছে। তাদের কাছ থেকে প্রায় ২০ গজ দূরে দুটা খেজুর গাছের আড়াল থেকে বাংলায় পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। কোনো জবাব না পাওয়াতে আবার উদুর্তে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তারা পাক বাহিনী বলে জানায়। তখন আমি পজিশন নিয়ে তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলি। উত্তরে তারা আমার দিকে গুলি ছোড়ে। এতে আমার বাম হাতে একটা গুলি লাগে। আমিও গুলি ছোড়া আরম্ভ করি। আমার গুলিতে তারা পালাতে থাকে। পরে তাদের কাউকেই দেখতে পাইনি। না পাওয়াতে আবার তাদের খোঁজ করতে থাকি। কিছুক্ষণ পর দেখতে পাই যে সামান্য দূরে একটা পাকা বাড়িতে একজন লোক একটা স্টেনগান ও একটা ২´´ মর্টার নিয়ে ঢুকছে। তা দেখে আমিও দৌড় দিয়ে ঐ বাড়ির দেয়ালের বাইরে পজিশন নিলাম। আমি তার খোঁজ নেবার জন্য ধানের গোলার আড়াল গিয়ে দেখতে পাই যে তার হাতিয়ার আমার গুলিতে খারাপ হয়ে গেছে। আমি মনে মনে ভাবলাম যখন তার হাতিয়ার নষ্ট হয়ে গেছে ও সে আমাকে গুলি করতে পারবে না তাই তাকে জীবিত ধরার ইচ্ছায় বাড়ির ভিতর ঢুকে দেখতে পাই যে সে মরার মতো পড়ে আছে, তার হাতিয়ারও তার পাশে পড়ে আছে। আমি তাকে মৃত ভেবে তার কোমড়ে আটকানো গ্রেনেডের বেল্ট বাম হাত দিয়ে খোলার চেষ্টা করার সময় হঠাৎ সে উঠে আমার ঘাড় ধরে হাতিয়ার কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে আমার হাতিয়ার দূরে ফেলে দেই ও তার সাথে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করি। প্রায় আধঘণ্টা হাতাহাতি করার পরও কোনোভাবে তাকে কাবু করতে না পেরে হঠাৎ পেছন দিক হতে তার কোমড় জড়িয়ে ধরি। সেও আমাকে ছাড়ানোর জন্য পেছন দিকে কিল ঘুষি মারতে থাকে কিন্তু কোনোভাবেই আমাকে তার আয়ত্তের মধ্যে পাচ্ছিল না। দুজনেই যখন ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি তখন আমি ঐ বাড়ি থেকে আমার কোম্পানির আবুল কালামকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখি ও তাকে জোর গলায় ডাক দেই। কামাল এসে রাইফেল দিয়ে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন রফিক খানকে গুঁতো মারে। গুঁতো মারার সাথে সাথেই পাক হানাদার ক্যাপ্টেন ঝটকা মেরে কামালের হাত হতে রাইফেল কেড়ে নিয়ে কামালকে গুলি করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। কিন্তু কামাল এসে আমার পেছনে লুকায় তাই হানাদার ক্যাপ্টেন গুলি করতে পারছিল না। আমি এক

সময় হঠাৎ করে আমার হাত দিয়ে ঝটকা মেরে তার হাত হতে রাইফেল ফেলে দেই আর কামালকে সামনে এসে ওকে ধরার জন্য বলি। কামাল এগিয়ে এসে ওকে ধরতে গেলে হানাদার ক্যাপ্টেন রফিক কামালের আঙ্গুল কামড়িয়ে ধরে। তখন আমি উক্ত ক্যাপ্টেনের বাম কান দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে কেটে ফেলি ফলে সে কামালের আঙ্গুল ছেড়ে দেয়। কামাল এসে তাকে ধরে আর আমি আমার ব্যাগে রাখা দড়ি একহাত দিয়ে কোনোরকমে বের করে দুজনে অতিকষ্টে তাকে বেঁধে ফেলি। এরমধ্যে স্থানীয় জনসাধারণ ও আমার কোম্পানির লোকেরা এসে পৌঁছে ও জয়বাংলা শ্লোগান দিতে থাকে। আমাদের লোক ও জনসাধারণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় উক্ত ক্যাপ্টেনকে ভারতের বয়রা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেই। তারপর আমি ছুটিপুরের দিকে রওয়ানা হই। রাস্তায় আমাদের হাওলদার আলাউদ্দিনকে দেখতে পাই। তার সঙ্গে আরও ৬০/৭০ জন সৈন্য দেখতে পাই। তাদের সবাইকে সাথে নিয়ে আমি ছুটিপুর উপস্থিত হই। সেখানে আগে থেকেই আমাদের জোয়ানরা পাক সেনাদের সাথে যুদ্ধরত ছিল। কাদায় ডেবে যাওয়া গাড়ি তিনটা নেবার জন্যই হানাদাররা আমাদের সাথে যুদ্ধ করছিল। আমি হাওলদার আলাউদ্দিনকে তার লোকজন নিয়ে পজিশন নিতে এবং হামলা চালাতে বলি। কিন্তু হানাদার বাহিনীর মেশিনগানের জন্য আমরা অগ্রসর হতে পারছিলাম না। তাই আমি আবুল হাওলাদারের পার্টি উঠিয়ে তাদের নিয়ে হানাদার বাহিনীর ডান দিকে গিয়ে দুইটা ব্রেন গান দিয়ে তাদের মেশিনগানের অবস্থানের ওপর ফায়ার করতে থাকি। এতে হানাদার বাহিনী নাভারণের দিকে পালিয়ে যায়। পরে শত্রুকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে আমি ওয়ারলেসের মাধ্যমে বয়রা ক্যাম্পের কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন খন্দকার নজমুল হুদাকে কিছু লোক নিয়ে এসে গাড়িগুলো নিয়ে যাবার জন্য খবর দেই। তারপর আমি ছুটিপুর থেকে আমাদের মূল ক্যাম্পের দিকে রওনা হই। কিছুদূর আসার পর পরপর কয়েকটা শব্দ শুনতে পাই ও আগুন দেখতে পাই। তখন আমি আবার দৌড় দিয়ে ছুটিপুর ফিরে এসে দেখি সে গাড়িগুলো জ্বলছে। এই বিষয়ে জানতে চাইলে আমাদের জোয়ানরা জানায় যে আলাউদ্দিন হওলাদার পেট্রোল ট্যাঙ্কে আগুন দিয়েছে আর গাড়িতে গ্রেনেড চার্জ করেছে। তখন আমি তাকে তিরস্কার করি ও গাড়িতে আগুন লাগানোর জন্য কৈফিয়ত তলব করি। এর মধ্যেই জনসাধারণ ও আমাদের লোকসহ প্রায় ২০০/২৫০ জন লোক নিয়ে ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা সাহেব বচসাস্থলে এসে পৌঁছান এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আরব আলী, গাড়িগুলো কোথায়। তখন তাকে আমি হাওলাদার আলাউদ্দিনের ঘটনাটা ব্যক্ত করি। তিনিও আলাউদ্দিনকে তিরস্কার করেন ও কৈফিয়ত তলব করেন। আমরা তারপর হানাদারদের ১৪টা লাশ পিছনে রেখে প্রতিরক্ষা অবস্থান ত্যাগ করে বয়রা ক্যাম্পের দিকে রওনা হই। মধ্যপথে বটতলা গ্রামে গিয়ে শুনতে পাই যে, সুবেদার মনিরুজ্জামান সাহেবকে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন ক্যাপ্টেন সাহেব আমাকে তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে আমি ক্যাপ্টেন সাহেবকে জানাই যে তাকে আমি কাশিপুর রেখে গিয়েছিলাম অ্যামুনিশন সাপ্লাই দেবার জন্য। বোধহয় পেটের অসুখের জন্য তিনি মেইন ক্যাম্পে ফিরে গিয়েছেন। আরও কিছূদূর যাবার পর (যে জায়গায় পাক হানাদার ক্যাপ্টেনকে ধরেছিলাম সেখানে) সুবেদার মনিরুজ্জামানের সঙ্গী আনসারকে দেখতে পাই। তাকে সুবেদার সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে সে জানায় যে, এখানে বটগাছের কাছে তিনজন হানাদার সৈন্যের কথা

লোকমুখে শুনতে পেয়ে তাদের ধরার জন্য তারা আসে ও বটগাছের নীচে জঙ্গলের মধ্যে তিনজন উর্দি ছাড়া লোককে বসে থাকতে দেখতে পায়। সুবেদার সাহেব তাদের ধরার জন্য অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে স্টেন বাগিয়ে ধরে অগ্রসর হয়ে তাদের সারেণ্ডার করতে বলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে তারা নিরস্ত্র হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে হতে হঠাৎ একজন সুবেদার সাহেবকে গুলি করে ও তিনি পানিতে পড়ে যান ও আমরা পালিয়ে যাই। এই কথা শুনে আমি আমার কোম্পানির সবাইকে চারদিক ঘিরে তল্লাসী চালাতে বলি। তল্লাসী চালিয়ে কোনো পাক ফৌজকে পাইনি শুধু সুবেদার সাহেবকে মৃত অবস্থা দেখতে পাই। দুটো গুলি তার সিনায় একটা পেটে লেগেছিল। পরে তার লাশ যথাযোগ্য সম্মানের সাথে সেই রাতে দাফন করা হয়।

সুবেদার সাহেবের লাশ উদ্ধারের পর আমি ক্যাপ্টেন সাহেবকে এখানে কিছু লোক রেখে বাকিদের খাবার জন্য ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করি। অন্যান্যরা এসে এখানে পজিশন নেয়। আমি রাতে মেইন ক্যাম্পে অবস্থান করি ও আমার হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়া হয়। পরদিন ভোর বেলায় ক্যাপ্টেন সাহেবসহ পুরো কোম্পানি ডিফেন্সে চলে যায় শুধু আমি ক্যাম্পে থেকে যাই। আমি বয়রা বাজারে চা খাবার সময় ডিফেন্সে ফায়ার শুনতে পেয়ে চা ফেলে কাশীপুর ডিফেন্সের দিকে দৌড়ে যাই। যেতে যেতে হঠাৎ ফায়ার বন্ধ হয়ে যায় এবং দেখতে পাই যে জনসাধারণ সহ আমাদের লোক পিছনে চলে আসছে। তারা আমাকে জানায় যে, পাকফৌজ আমাদের বটতলা ডিফেন্স দখল করে নিয়েছে। আমি সত্যি-মিথ্যা যাচাই-এর জন্য সিপাহী জাকির ও একজন সাধারণ পাবলিক মক্কেল আলী মোল্লাকে সাথে নিয়ে ডিফেন্সের দিকে যাই ও গিয়ে দেখতে পাই যে আমাদের অনেক অ্যামুনিশন ডিফেন্সের উপর ও রাস্তায় পরে আছে। সব অ্যামুনিশন জড়ো করে মসজিদের ভিতর নিয়ে যাই। তারপর আমাদের লোকদের খোঁজ করার জন্য পিছন দিকে যাই। খেজুর-বাগান গিয়ে ক্যাপ্টেন হুদাসহ ৫০/৬০ জনকে দেখতে পাই। তাকে জিজ্ঞাসা করি, স্যার, আপনারা কেন ডিফেন্স ছাড়লেন? তিনি বললেন যে, পাকফৌজ এর আর্টিলারি ও বিমান হামলাতে আমরা টিকতে না পেরে পিছনে চলে এসেছি। মনে হয় তারা ডিফেন্স দখল করে নিয়েছে। তখন আমি বললাম যে, আমি ডিফেন্সে নিজে গিয়েছি ও সমস্ত অ্যামুনিশন জড়ো করে মসজিদে রেখে এসেছি। কোনো পাকফৌজ দেখতে পাইনি। কিন্তু ক্যাপ্টেন সাহেব আমাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাকে নিয়ে সেই স্থানে যাই ও কোনো পাকফৌজ না দেখতে পেয়ে তার বিশ্বাস হয়। হঠাৎ করে ছুটিপুরের দিক থেকে একটা বার্স্ট ফায়ার আসে। আবার সবাই পিছনে হাটতে থাকে। আমি রাগ করে সিপাহী জাকিরকে নিয়ে ছুটিপুরের দিকে ফায়ার ওপেন করি। উত্তরে পাকফৌজ কোনো জবাব দেয়নি। আমি কয়েকটা গ্রেনেডও ছুড়ি। কোনো সাড়া পাইনি। তখন অনুমান হয় যে, পাকফৌজ ছুটিপুরেই অবস্থান নিচ্ছে, এদিকে আসবে না। তখন আমরা বটতলাতে পুরোপুরি ডিফেন্স নেই।

পরবর্তীতে আমি আরো অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। সরকার আমাকে 'বীর বিক্রম' উপাধিতে ভূষিত করে। তারপরের ইতিহাস অভাবের, কষ্টের আর অপমানের। এ কষ্ট বড় কষ্টের।



অনারারী ক্যাপ্টেন মো. আবদুল জাব্বার খান, বীর প্রতীক

ফরিদপুরের নড়িয়া থানার আটিপাড়া গ্রামে ২-৭-৩৭ তারিখে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা ওয়াসিউদ্দিন খান। তিনি ১৯৬৭ সালে ইন্তেকাল করেন। মাতার নাম বিবি মিরেন নেছা। আমরা মোট ৩ ভাই, কোনো বোন ভাই। আমি মেঝ।

আমি ২রা জুলাই ১৯৫৭ সালে একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করি। নন কমিশন পদ লাভ করি ১-৬-৬২ সালে। জুনিয়র কমিশন পদ লাভ করি ২৬-৩-৭১ সালে। অনারারী কমিশন পেয়ে লেফটেনেন্ট পদে উন্নিত হই ২৬শে মার্চ ১৯৮৫ সনে। ১৯৮৫ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অনারারী ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হই।

১৯৫৫ সালের ২রা জুলাই চাষাড়া রিক্রুটিং অফিসে ভর্তি হয়ে বিকালে চট্টগ্রাম ইবিআরসিতে গমন করি এবং এ কোম্পানির ১নং প্লাটুনে ট্রেনিং গ্রহণ করি। তখন সেন্টার কমাণ্ডার ছিলেন লে. কর্নেল এলএমকে লোদী। আমার কোম্পানি অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন ফিরোজ সালাউদ্দিন। ট্রেনিং সমাপ্তের পরে ১৯৫৬ সালের জুন মাসে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ময়নামতি সেনানিবাসে সি কোম্পানিতে একজন পূর্ণাঙ্গ সিপাহী রূপে চাকরি শুরু করি। জুন মাসে ময়মনসিংহে ফুড অপারেশনে যাই। আগস্ট মাসের ১৪ তারিখে সেখান হতে কুমিল্লা ফিরে আসি। তৎকালীন জেনারেল আতিকুর রহমানের অধীনে তখন আমরা নানা প্রকার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে সি কোম্পানি হতে বদলী হয়ে হেড কোয়ার্টার কোম্পানির মর্টার প্লাটুনে আসি। ১৯৫৭ সালের মে মাসে কুমিল্লা হতে পল্টনের সাথে রাত ৯ টায় বন্দরে আসি। এবং ৯ দিন জাহাজে অতিবাহিত করে পেশোয়ার যাই। সেখানে নতুন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। পেশোয়ারে আমাদের কর্মকাণ্ড অনেক সুনাম অর্জন করে।

১৯৫৮ সালে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের নির্দেশে মার্শাল ল ডিউটি করি। পরে বাঙালি জাতির মান সবার উচ্চাসনে প্রমাণিত করে সম্মানের সঙ্গে যশোর প্রত্যাবর্তন করি। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেই। আয়ুব ও ফাতেমা জিন্নার

নির্বাচনে খুলনায় ডিউটি করি। ১৯৬৭ সালে পুনরায় লাহোর গমন করি। সেখানেও পাক-ভারত সীমান্তে ডিউটি করি।

১৯৬২ সালে আমার ইউনিটের খেলাধূলায় বহু সুনাম অর্জন করেছি। ১৯৬৮ সালে দ্বিতীয় বারের রিইউনিয়নে আমি ১লা রিইউনিয়নে যে গৌরব অর্জন করি তা ক্ষুন্ন করিনি।

১৯৬৯ সালে লাহোর হতে পুনরায় জুন মাসে ঢাকার জয়নেদবপুরে আসি। তখন আয়ুব নগরে শেখ মুজিবের বন্দী অবস্থার (আগরতলা মামলা-সম্পাদক) ডিউটি করি। দেশের পরিস্থিতি আয়ত্বে না আসায় আইউব খান ইয়াহিয়া খানকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে অবসর নেন। ১৯৭০ সালের মুজিব এবং ইয়াহিয়ার নির্বাচনী ডিউটি করি।

আমার ছোট ভাই আবদুল হাশেম খান ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর আর্টিলারী কোরের একজন সৈনিক ছিল। যুদ্ধের সময় সে ছুটিতে বাংলাদেশে এসে অক্টোবরের দিকে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে মুজিব ব্যাটারীতে যোগ দেয়। আমার আপন চাচাতে ভাই ফিরোজ খান মেলাঘরে ২ নম্বর সেক্টেরের সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যুদ্ধ করেন।

আমার আপন শালা শহীদ আবদুল হামিদ সরদার মুক্তিযুদ্ধের আগে সিপাই পদে ২য় ইস্ট বেঙ্গলে কর্মরত ছিল। মার্চের প্রথম দিকে (যুদ্ধ শুরু হবার আগে) জয়দেবপুর থেকে সে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ইনফেন্ট্রী ওয়ার্কশপে ডিউটিতে আসে। মার্চ মাসে (২৫শে মার্চের পর) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বাঙালি অফিসারদের সহায়তায় সে ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে আগরতলা হয়ে ইণ্ডিয়া আসে ও পরে ৩য় ইস্ট বেঙ্গলে যোগ দেয়। দেশ স্বাধীন হবার মাত্র ৭দিন আগে সুনামগঞ্জ এলাকায় সে শহীদ হয়। সেখানেই তার কবর আছে।

আমরা একটা সংঘবদ্ধ সেনাবাহিনীতে ছিলাম। একাত্তর সালে কর্নেল ওসমানী এবং বাঙালি জাতি যখন আমাদেরকে যুদ্ধে যাবার আহবান জানাল তখন মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করলাম। দেশের পরিস্থিতিতে তখন আমাদের মনের অবস্থা ভাল ছিল না।

সারা জীবন পাঞ্জাবীদের সাথে লড়াই করেছি। সেনাবাহিনীতে বাঙালি ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে যে পার্থক্য দেখি। আমরা বাঙালিরা ব্যারাকে বাংলা বলতে পারতাম না। ওরা আমাদের ছোট নজরে দেখতো-বাঙালিরা ছোট জাত, মাক্ষী কা জাত, চাউল খানেওয়ালা। আমাদের প্রতিদিনের রেশন ছিল ২২ আউন্স। তার মধ্যে বাঙালিরা পেত ৬ আউন্স আটা ও ১৬ আউন্স চাল। পাঞ্জাবীরা পেত ১৬ আউন্স আটা ও ৬ আউন্স চাল। তাছাড়া আমাদের লোক ছিল মাত্র ৩% ওদের ৯৭%। শেখ সাহেবের বক্তৃতার পর তা বেড়ে ৬% হয়। তবে ট্রেনিংএর রেজাল্ট বাঙালিদের সবসময়ই ভাল হত। আমরা ওদের চেয়ে এগিয়ে থাকতাম। পাঞ্জাবীরা ছিল মোটা বুদ্ধিঅলা।

আমরা যেহেতু একটা সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর অন্তর্গত ছিলাম এবং সবকিছুই একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে চলতো তাই সরাসরি খারাপ ব্যবহার বা পক্ষপাতিত্বের কোনো সুযোগ ছিল না। ফলে উপর দিয়ে পাঞ্জাবী ও বাঙালি অফিসারদের ব্যবহারে কোনো তারতম্য ছিল না সবাই ভাল ব্যবহার করত। তবে তলে-তলে সুযোগ পেলে পাঞ্জাবীরা বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করত। অন্যদিকে বাঙালি অফিসাররা কিছুটা সহানুভূতিশীল ছিলেন।

বাংলার উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য পাঞ্জাবী শাসকের চক্রান্তে বৃদ্ধি পায়। চাকুরীতে বাঙালির পদমর্যাদা থাকে না। যদিও বাঙালির দেশে উৎপাদন বেশি তবুও বাংলায় হাহাকার সর্বত্র বিরাজমান। কোনো বাঙালি ন্যায়সঙ্গত কথা নিয়ে দাঁড়ালে রাষ্ট্রদ্রোহী ধারায় বন্দি করে শাস্তি প্রদান করে। শেখ মুজিবকে আগরতলা মামলায় আটক রাখে। এমনিভাবে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার পরিকল্পনায় লিপ্ত ছিল শাসক গোষ্ঠী। কৃত্রিম ভালোবাসার অভিনয়ে ইয়াহিয়া খান শেখ সাহেবকে মুক্তি দেন। ভোটের পর বাংলায় সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে।

১৯৭০ সালে ভোটে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো সাহেব শতকরা ৭৫ ভাগ ভোট পায়। ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ভুট্টো সাহেবের উস্কানিতে ইয়াহিয়া খান শেখ সাহেবকে এসেম্বলীতে ডাকেনা এবং ক্ষমতা প্রদান না করে স্বাধীনতা রক্ষার অজুহাতে বাংলায় সৈন্য সমাবেশ করেন। তার ভাষায় শেখ সাহেবকে গদী দিলে সে ভারতীয় নীতি গ্রহণ করবে ফলে বাংলা ভারতে পরিণত হবে।

বাঙালি যখন তাদের ন্যায্য দাবির শ্লোগান চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয় তখন উপায়ন্তর না দেখে ইয়াহিয়া খান ৮ জন জেনারেল এবং তার দলীয় কর্মীদের নিয়ে এসেম্বলীতে বসেন। কিন্তু ইয়াহিয়ার একরোখা সিদ্ধান্ত শেখ সাহেব মানলেন না। কারণ তিনি বাঙালির স্বার্থকে ছোট করে চুক্তির মাধ্যমে গদী নিতে রাজি হন নাই।

ঐ সময় বাংলার সেনাসদরে ছিলেন লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব আলী খান, এবং গভর্নর ছিলেন ভাইস এডমিরাল এস. এম. আহসান। তারা দুইজন পাকিস্তানি থাকা সত্ত্বেও বাঙালিকে অত্যাচার করতে রাজি ছিলেন না। অতএব তাদের বদলী করে টিক্কা খানকে বাংলার গভর্নর ও সামরিক প্রধান করে পাঠায়। বৈঠকে কোনোমতেই যখন ইয়াহিয়া খানের স্বার্থসিদ্ধি হলনা তখন সে লাহোরে প্রত্যাবর্তন করে ও পরিকল্পনা করে ২ ডিভিশন সৈন্য আনে এবং লাহোরে যাবার সময় ২৫শে মার্চের গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে যায়। ইয়াহিয়ার নির্দেশক্রমে জেনারেল টিক্কা খান পাঞ্জাবী সেনা ও অফিসারদের নির্দেশ দিলেন বাঙালি অফিসার ও সেনাদের উইথড্র করার এবং তাদের সমূলে ধ্বংস করার। ১৯শে মার্চ ব্রিগেডিয়ার আরবাব এবং তার সাথে ৩২ পাঞ্জাবের ১ কোম্পানি ও আর্টিলারিসহ জয়দেবপুরে ২য় ইষ্ট বেঙ্গলের হাতিয়ার উইথড্র করতে যায়। ঘটনা বুঝে জনসাধারণ রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে। ২য় বেঙ্গলকে কিছু না করতে পেরে নিরীহ কিছু লোক গুলি করে হত্যা করা হয়। এবং পরে লে. কর্নেল মাসুদুল হোসেন খানকে হেলিকপ্টার যোগে বন্দি করে ঢাকায় আনে। তিনি ছিলেন পাক আমলে ২য় বেঙ্গলের সর্বপ্রথম বাঙালি সিও। তারপর ৩২ পাঞ্জাবের সিও লে., কর্নেল রকিবকে আমাদের সিও হিসেবে পোস্টিং দেয়। কিন্তু তখনও জানতাম না আমাদের সিও বন্দি কিনা।

টিক্কা খান যখন বুঝতে পারে যে বাঙালিকে জোরপূর্বক দাবাতে হবে তখন ২৬ তারিখে চট্টগ্রাম ইবিআরসি, চিটাগাং পোর্ট, ইপিআর ছাউনি, পুলিশ ব্যারাক আক্রমণ করে এবং শেখ সাহেবকে বন্দি করে নিয়ে যায়। ফলত বাঙালিরা পাক সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করে। এবং টিক্কাখান তার সেনাদের আদেশ দেয় প্রয়োজন হলে ৭২ ঘণ্টার

মধ্যে বাঙালিদের ধুলায় পরিণত করার। তাই পাকসেনা নারকীয় কর্ম শুরু করে। উপায়ান্তর না দেখে বাঙালি জনতা গোপনে সংঘবদ্ধ হয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে থাকে।

তখন ২য় ইস্ট বেঙ্গল ছিল জয়দেবপুরে। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় কোম্পানি ছিল। যেমন এ কোম্পানি ছিল টাঙ্গাইল, তার কোম্পানি কমাণ্ডার ছিল মেজর কাজেম কামাল (অবাঙালি)। বি কোম্পানি ছিল অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে, তার কমাণ্ডার ছিলেন মেজর এ. লতিফ (অবাঙালি)। 'সি কোম্পানি' ছিল ময়মনসিংহ, কোম্পানি কমাণ্ডার ছিলেন মেজর নুরুল ইসলাম। 'ডি কোম্পানি' ছিল জয়দেবপুর, কোম্পানি কমাণ্ডার ছিলেন মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী। এডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান, আইও ক্যাপ্টেন নাসিম, কোয়ার্টার মাষ্টার ক্যাপ্টেন এজাজ এবং টুআইসি মেজর কাজী মোহাম্মদ সফিউল্লাহ।

লে. কর্নেল রকিব সাহেব মেজর সফিউল্লাহকে বলেন যে ময়মনসিংহে ভারতীয়দের সাথে কিছু গোলমাল হচ্ছে। তাই অটোমেটিক হাতিয়ারগুলো নিয়ে যেন তথায় যাই। পরে পল্টনের যত বাঙালি জোয়ানরা একত্র হয়ে ২৮ তারিখ রাত ৯টায় তাদের হত্যা করে টাঙ্গাইলের উদ্দেশ্যে রওনা হই। চলন্ত অবস্থায় যেখানে অবাঙালি পাই তাদের হত্যা করা হয়।

২৮ তারিখ রাত ২ঃ৩০ মিনিটে এ কোম্পানির সাথে মিলিত হই। টাঙ্গাইলের অবাঙালিদের ঐ রাতে খতম করে মুক্তাগাছা রাজবাড়িতে থাকি। সেখানে জনগণ আমাদের অনেক উপকার করেছিল। ৩০শে মার্চ সেখান হতে ময়মনসিংহ যাই ও সার্কিট হাউসে থাকি। সেখানে অবাঙালি খতম করি ও সমস্ত বাঙালি ট্রুপস একত্র হয়ে দল গঠন করি। ১লা এপ্রিল অধিনায়ক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে মেজর শফিউল্লাহ ভাষণ দেন এবং কেন আমরা পাক সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করেছি তা বুঝিয়ে দেন।

২রা এপ্রিল ট্রেনযোগে কিশোরগঞ্জ পৌছি। ৩রা এপ্রিল আমাদের উপর বিমান হামলা হয়। ঐ দিন এ কোম্পানি কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন নাসিম সাহেব ভৈরবে ডিফেন্স নেয়। কিশোরগঞ্জ হতে বাকি লোক ট্রেনযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাই। সেখান হতে বাস ও ট্রাক যোগে সিলেট অভিমুখে যাত্রা করি। ঐ সময় ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে মিলিত হই এবং সবাই সিলেটের সাতঘর চা বাগানে থাকি এবং ৪র্থ বেঙ্গলের সঙ্গে তেলিয়াপাড়া যাই। তখন কর্নেল ওসমানী সাহেব আমাদের সাথে দেখা করেন।

পরে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল তেলিয়াপাড়া লোকেশন আমাদের দিয়ে ভারতে চলে যায়। তখন বিভিন্ন স্থান হতে লোক জড়ো হয়ে আমাদের শক্তি বাড়ায় এবং সি কোম্পানি কমাণ্ডার মেজর আজিজ সাহেব সিলেট গমন করেন। আর এক কোম্পানি মেজর জিয়াউর রহমান সাহেব ৮ম ইস্ট বেঙ্গলের জন্য চিটাগাং নিয়ে যায়, তার কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন এজাজ সাহেব। ডি কোম্পানি কমাণ্ডার ছিলেন মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী। হেড কোয়ার্টার ও ডি কোম্পানি একত্রে থেকে ছোট বড় সব অপারেশন করে এবং প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালায়।

আমি তৎকালীন পাকিস্তানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। তারপর কাকুল ক্যান্টনমেন্টে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণদাতা অফিসারবৃন্দের কেউ কেউ ক্যাপ্টেন ছিলেন। তাদের নাম এখন স্মরণ নাই। তাছাড়া সাবেক রাষ্ট্রপতি হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ প্রশিক্ষণ অফিসার ছিলেন এবং অন্যান্য অফিসারবৃন্দও ছিলেন।

২৬শে এপ্রিল পাক বাহিনী ১০ ঘণ্টা হামলা চালায় ফলে এ কোম্পানি সেখান থেকে তেলিয়াপাড়ায় ফিরে আসে। ২৪শে এপ্রিল শফিউল্লাহ সাহেব পুনরায় তেলিয়াপাড়ায় সভা ডাকেন এবং ৩০শে এপ্রিল সেখান থেকে হেডকোয়ার্টার সিমনাতে নেওয়া হয়। ডি কোম্পানি ঐ দিনই কলকলিয়া যায় ও সেখানে সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া লোকেশন নির্ণয় করে।

ডি কোম্পানি কমাণ্ডার মেজর মইনুল চৌধুরী আমাকে হুকুম দিলেন যে, লক্ষীপুর গ্রামে ডিফেন্স করেন। ১৯৬২ সালের পাক-ভারত বর্ডার সংঘর্ষের জন্য গ্রামটা বিখ্যাত। এখানে মেজর তোফায়েল শহীদ হন। তার নামে একটা স্মৃতিসৌধ ঐ গ্রামে আছে। পাক সেনাদের উপর আদেশ ছিল যে ঐ গ্রামে এসে মেজর তোফায়েলের স্মৃতি দখল করবার। আমাদের সাহসিকতা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবলের কারণে তারা দখল করতে পারে নাই। দুইটা হেভী মেশিনগান এবং দুইটা টু ইঞ্চ মর্টার আমাদেরকে সহায়তা করে। আমি ঐ সময় বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে ফাঁদ পেতে আক্রমণ চালিয়ে পাকসেনাদের অনেক ক্ষতি করি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেটগামী রেললাইন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেটের পাকা রাস্তা আমার দায়িত্বে ছিল। সিলেট থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আসা পাক সেনার ট্রেন এবং বাস যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেটে আসা পাকসেনাদের উপর ফাঁদ পেতে আক্রমণ চালিয়ে অনেক ক্ষতি করি। ফলে তারা পিছনে ভেগে যায়। এছাড়া সিলেট এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্রেন লাইনের ইসলাম ব্রীজ, পাঁচগাও ব্রীজ, হরষপুর ব্রীজ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট গামী সড়কের মাদমপুর ব্রীজ, চান্দ্রা ব্রীজ, এবং বুজুন্দী গ্রামের ব্রীজ ধ্বংস করি। পাওয়ার হাউস, বিজলী সাপ্লাই পয়েন্ট, কোয়ার্টার সাপ্লাই পয়েন্ট ধ্বংস করি।

এইসব ধ্বংস করার কারণ ছিল যেন পাক সেনাবাহিনী সরাসরি ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং সিলেট যেতে না পারে এবং আমাদের উপর সরাসরি আক্রমণ না করতে পারে। তাদের চলার পথে, রাস্তায় ফাঁদ পেতে কেচকা মাইর দেওয়া ছিল আমাদের কাজ। আমার অপারেশনের এরিয়া ছিল চান্দ্রা গ্রাম, কালিশিমা গ্রাম, মাধুপুর গ্রাম, হরষপুর গ্রাম, বুল্লা গ্রাম, পাইকপাড়া গ্রাম, পাঁচগাও, ইসলামপুর। এই এরিয়া নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছিল। কোম্পানি হেডকোয়ার্টার ঐ লক্ষীপুর গ্রামে বহাল ছিল। আমি ঐ গ্রামে মে মাস থেকে ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত ঐ দায়িত্বে বহাল থাকি।

তারপর আমাদের হেডকোয়ার্টার থেকে হুকুম পেলাম যে আমাদের বিলোনিয়া যেতে হবে। আমি সেক্টর ফোর্সকে আমার এরিয়ার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ১লা নভেম্বর আমার ফোর্স নিয়ে ইণ্ডিয়ান ফোর্সের গাড়িতে চড়ে ডি কোম্পানির অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদের অধিনায়কত্বে বিলোনিয়ায় রাত ৮টায় পৌছি। ঐ এলাকাটা ছিল আমাদের জন্য অজানা বা অচেনা।

ওখানে অধিনায়ক ছিলেন মেজর জাফর ইমাম। তার কাছে আমরা রিপোর্ট করি। ২ নভেম্বর আমার উপর নির্দেশ হয়, আপনি বিলোনিয়া-চিতলিয়া গ্রামে একলা রেকি করতে যান। ৪-১১-৭১ তারিখে ঐ সেক্টরে একজন ইণ্ডিয়ান জেনারেল, একজন ব্রিগেডিয়ার এবং ঐ সেক্টরে আমাদের সকল কমাণ্ডার, অর্ডার গ্রুপ এবং রেকি গ্রুপ

আমরা ঐ চিতলিয়া এরিয়া রেকি করতে যাই। কারণ ৫-১১-৭১ তারিখে আমাদের অনুপ্রবেশ করার তারিখ নির্ধারিত করা হয়েছিল।

৪-১১-৭১ তারিখে বেলা ৪ ঘটিকার সময় নিজ নিজ এরিয়াতে পৌছি। পৌছানোর পর ক্যাপ্টেন হেলাল মোরশেদ আমাকে হুকুম দিলেন যে, লেফ্‌ট ফরোয়ার্ড প্লাটুনের এরিয়া আপনি নিজে যেয়ে রেকি করে আসেন। আমার সাথে আমার অর্ডার গ্রুপ মেশিনগান কমাণ্ডার এবং তিন সেকশন কমাণ্ডার এবং অন্যান্য অটোমেটিক হাতিয়ার কমাণ্ডারগণ ছিল। ঐ এরিয়ায় গাইড করে নিয়ে যাবে বলে একজন সৈনিক আমার সাথে দেন।

রওনা হয়ে যাওয়ার ২০০ গজ পরে শত্রুর পোঁতা মাইন আমার বাঁ পায়ের নীচে পরে এবং বাঁ পায়ে আঘাত পাই। তখন ৪-১১-৭১ তারিখের বেলা চারটা, ১৪ই রমজান ইফতারের কিছু আগে। বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে আমাদের অধিনায়ক সাহেব এবং অনান্য অফিসার, জেসিও এনসিওগণ ছুটে এসে দেখে আমি আহত হয়ে পড়ে আছি।

ঐ সময় অনেক রক্ত পড়ছিল। তখন আমার কাছে একটা লুঙ্গি এবং একজন হাবিলদারের কাছে একটা লুঙ্গি ছিল। দুটি লুঙ্গি দিয়ে ধরে রাখায় রক্ত পড়া থেমে গেছে। পরে ব্যাণ্ডিজ করে নায়েব সুবেদার আবদুল মোমিন ও ৪ জন মুক্তিযোদ্ধার সাথে দিয়ে আমাকে রিয়ার হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়। তারা পাশের বাড়ি হতে ঘরের বেড়া ঝাঁপ এনে তাতে আমাকে শুইয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ইণ্ডিয়া নিয়ে আসে। হেডকোয়ার্টার থেকে আমার একসিডেন্ট স্থলের দূরত্ব ছিল ৫-৭ মাইল। আমি যেখানে এক্সিডেন্ট হই পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেখানে থেকে ২০০ গজ দূরে ছিল। তারা ইচ্ছা করলে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু যখন আমি নদী পার হচ্ছিলাম তখন তারা আমার উপর ফায়ার করেছিল কিন্তু আমাদের কোন ক্ষতি হয় নাই।

৫-১-৭১ তারিখে ভারতীয় ফিল্ড মেডিকেল ব্যাটালিয়নে (শালবন-আগরতলা) অপারেশন করে আমার বাঁ পা হাটুর নীচে পর্যন্ত কেটে ফেলে। তার ৫/৭ দিন পর জ্ঞান ফিরলে আমাকে মুক্তিযোদ্ধা হসপিটাল, ধর্মনগরে (ছনের ঘর) পাঠানো হয়। এখানে ২/৩ দিন ছিলাম। তারপর হেলিকপ্টার যোগে শিলচর মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। ৪/৫ দিন পর শিলচর থেকে ট্রেনযোগে গোহাটি মিলিটারী হসপিটালে পাঠানো হয়। এখানে ১ মাসের মত ছিলাম। ডিসেম্বরের ৩১ তারিখ বা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আরও ৩ জন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আমাকে পুনার খিড়কি সামরিক পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়।

খিড়কিতে ১০ই আগস্ট (৭২) পর্যন্ত থাকতে হয়েছে। এখানে আমার দুই বার অপারেশন হয়। ফেব্রুয়ারি ১৫ তারিখে skin grafting করা হয়। খিড়কিতে আর পুনাতে মে মাসে অপারেশন করা হয়। পুনাতে কৃত্রিম পা সংযোজন করা হয়। খিড়কি থেকে পুনাতে কয়েকবার যেতে হয়েছে। এখানে চিকিৎসা, ব্যবহার খুব ভাল ছিল। ভারতীয় কর্নেল আবদুল মজিদ খিড়কি হাসপাতালের ইনচার্জে ছিলেন। উনার সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধারা (যারা খিড়কিতে ছিল) বোম্বাই ইত্যাদি জায়াগায় ট্যুরে গিয়েছিল। উনার জন্য আমরা একটা ঈদের নামাজ পড়েছি। তার বদৌলতে আমরা ঐ হাসপাতালে হালাল মাংশ পেয়েছি।

পুনাতে (খিড়কি) তখন অনেক যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন যেমন দুই জন অফিসার (তাদের একজন মরহুম কর্নেল তাহের), চার জন জেসিও (যাদের মধ্যে দুই জন বিডিআর আর ২ জন সেনাবাহিনীর) ও অন্যান্য পদবীর সৈনিক অনেক ছিল।

৯ মাস ভারতে চিকিৎসা শেষে, কৃত্রিম পা সংযোজন করে ১০-৮-৭২ তারিখে হাসপাতাল হতে কোলকাতা-বেনাপোল, খুলনা এবং বরিশাল হয়ে রকেটে করে ১৫-৮-৭২ তারিখে ঢাকা আসি। ঢাকায় সেনা সদরে আমার রিপোর্ট করার কথা ছিল কিন্তু আমার ইউনিট (২য় ইস্ট বেঙ্গল) তখন ঢাকার কুর্মিটোলায় ছিল। তাই সেখানেই যোগ দেই।

তারপর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিয়মিত কর্তব্যেরত ছিলাম। এর ভিতর বাংলাদেশের নানা দুর্যোগ এবং ১৯৭৭ সন থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে অপারেশন ডিউটি করি। ১৯৭৯ সালের মে/জুন মাসে কুমিল্লা সেনানিবাসে বদলী হয়ে আসি। আমার ব্যক্তিগত পদোন্নতি উপলক্ষে ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে ৩২ বেঙ্গলে বদলী করা হয়। সেখান থেকে ১৪-৯-৮৬ সালে আমি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করি। দীর্ঘ ৩২ বছর সামরিক বাহিনীতে চাকরি করে বর্তমানে অবসর অবস্থায় আছি।

চাকুরি জীবনে বহু ডিউটি করি তার মধ্যে ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালে আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেই। এর আগে আমি তৎকালীন পাকিস্তানে নানা দুর্যোগের সময় ডিউটি করি। যেমন—

১. ১৯৫৬ সালে ফুড অপারেশন ডিউটি করি।
২. ১৯৫৫ সালে গোমতী নদীর ভাঙ্গন থেকে কুমিল্লা শহর রক্ষার জন্য ঐ বাঁধের জন্য ডিউটি করি।
৩. ১৯৫৮ সালে আয়ুবের মার্শাল লর সময় পাকিস্তানের পেশোয়ার জেলায় ডিউটি করি।
৪. ১৯৬৪ সালে আয়ুব ও ফাতেমা জিন্নার নির্বাচনে ডিউটি করি।
৫. ১৯৬৫-র পাক ভারত যুদ্ধে যশোর ছিলাম।
৬. ১৯৭০ সালে শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইয়াহিয়া খানের নির্বাচনী ডিউটি করি ময়মনসিংহে।
৭. একাত্তরের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধ করে আহত হই।

২য় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর মুক্তিযুদ্ধের যুদ্ধসমূহ :

ময়মনসিংহ	— ২৭-২৮ মার্চ
জয়দেবপুর	— ২৮-২৯ মার্চ
টাঙ্গাইল	— ২৮-২৯ মার্চ
নরসিংদি-ডেমরা	— ১-২০ এপ্রিল
আশুগঞ্জ-ভৈরব	— ১-১৪ এপ্রিল
সিলেট	— ৯-১৭ এপ্রিল
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লালপুর, গেকর্নঘাট	— ২০-২৮ এপ্রিল

শাহবাজপুর, সরাইল, মাধবপুর	— ২৫ এপ্রিল - ১৫ মে
তেলিয়াপাড়া	— ১৯ এপ্রিল - ১৯ মে
শেরপুর, মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল	— ৫-২৫ এপ্রিল
হাটহাজারী, নাজিরহাট	— ১০ এপ্রিল - ২৫ মে
নাজিরহাট, রামগড়	— ১০ এপ্রিল - ২৫ মে
হরষপুর, মুকুন্দপুর	— ১৫ এপ্রিল - ১৬ জুন
নলুয়া চা বাগান	— ১-৩ জুন
ধর্মগড়	— ২-৪ সেপ্টেম্বর
মুকুন্দপুর	— ১২ সেপ্টেম্বর
কালেঙ্গা ফরেস্ট	— ২৩-২৫ সেপ্টেম্বর
কৃষ্ণপুর—মণ্ডলা	— মে-নভেম্বর
বিলোনিয়া	— ২-২৮ নভেম্বর
রাজাপুর, আজমপুর, আখাউড়া	— ১-৫ ডিসেম্বর
ডেমরা	— ১০-১৬ ডিসেম্বর

মুক্তিযুদ্ধে আমার স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে নভেম্বরে আহত হওয়া আর উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হচ্ছে ধর্মনগর এ্যাটাক। তখন বর্ষাকাল (তারিখ মনে নেই। মে, জুন বা আগস্ট মাসে হবে) ছিল। আমাদের কোম্পানির কমাণ্ডার ছিলেন মেজর মইন। আমি ছিলাম ডেলটা কোম্পানি এবং কাট আপ পার্টিতে। রাইট ফরোয়ার্ড কাতলামারা এরিয়াতে ছিল প্রটেকশন পার্টি, ফোর্স ছিল বি কোম্পানি। ঐ কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান। তার সাথে ছিলেন ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়া।

এই অপারেশনে আমাদের এ্যাটাকিং ফোর্স ফেল করেছিল কারণ প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল আর পাকিস্তানিরা প্রচণ্ড ফায়ারিং করছিল— বলার মতো না। পাকিস্তানিরা আমাদের 'ডি কোম্পানি ঘেরাও করে ফেলে। ডি কোম্পানির একটা প্লাটুন যার কমাণ্ডার ছিলেন সুবেদার মমিন, সুবেদার আবদুর কাদের, হাবিলদার ওয়াজদ আলী বার্কী ওদেরকেও ঘেরাও করে ফেলেছিল। আল্লাহর রহমতে আমার মর্টারের ফায়ারের সাহায্যে তারা বেঁচে আসেন। এদের মধ্যে লে. সাঈদ আহমদও ছিলেন। সেদিন আমি প্রায় ৫০০-র মতো তিন ইঞ্চি মর্টারের গোলা ফেলি। আমাদের ৪ জন লোক আহত হয়। এদের মধ্যে লে. জহিরুল হক আমার পোষ্টে এসে আমাকে ধন্যবাদ, মোবারকবাদ জানান।

মোট কথা কোনো পক্ষেরই তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। ইণ্ডিয়ান ১৮ রাজপুত আমাদের সঙ্গে ছিল। তাদের ২/৩ জন লোক মারা যায় ও আহত হয়।



মেজর এম. এ. মুত্তালিব

নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা থানার কাজলাবৈরাটী গ্রামের বাড়িতে ১৯৩৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর আমার জন্ম হয়। কর্নেল তাহের এবং আমি একই গ্রামের সন্তান। আমার পিতার নাম মৌলভী হাফিজউদ্দিন, পেশায় কৃষক ছিলেন। তিনি ১৯৮০ সালে ইন্তেকাল করেন। মাতার নাম হাফিজা বেগম। তিনি গৃহিণী ছিলেন। ১৯৭৫ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। আমরা মোট ৫ ভাই, ২ বোন। ভাই-বোনদের মধ্যে আমি সবার বড়।

আমি আমাদের গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করি। তারপর নেত্রকোনা আঞ্জুমান হাইস্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করি ও একই স্কুল হতে ১৯৫১ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করি ও ৫৪ টাকার মোহসীন স্কলারশিপ পাই। আমি পঞ্চম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আমার ক্লাসের ফার্স্টবয় ও স্কুলের ক্যাপ্টেন ছিলাম। তারপর নেত্রকোনা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হই।

মুক্তিযুদ্ধের আগে সিলেটে সাধারণ ব্যবসা করতাম। আমি যে বছর নেত্রকোনা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার-এ পড়াশুনা করি সেই বছর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা মেজর আবদুল গণি আমাদের কলেজে এসে বাঙালি ছেলেদের আর্মিতে ভর্তি হবার আহবান জানিয়ে একটা ভাষণ দেন। আমরা অনেক ছাত্র ছিলাম। ভাষণ শেষে উনি আহবান জানালেন, তোমরা কেউ আর্মিতে যাবে? কেউ দাঁড়াল না। আমরা দুইজন মাত্র দাঁড়ালাম। আমার সাথে ছিল আবদুর রহমান। সে অবশ্য আর্মিতে ঢুকতে পারেনি, ভর্তি পরীক্ষায় বাদ পড়ে যায়।

মেজর গণি আমাদেরকে আর্মিতে ভর্তি হবার জন্য যে পড়াশুনা ও Physical training নিতে হয় সে সম্পর্কে বললেন। বললেন যে তার জন্য উনি আমাদের কাছে লোক পাঠিয়ে দিবেন, ট্রেনিং দেবার জন্য কীভাবে ভর্তি হওয়া যায় তার প্রস্তুতির জন্য এবং পরে লোক পাঠিয়েছিলেন।

কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের মাঝামাঝি আমাকে আর্মির তরফ থেকে ইন্টারভিউর জন্য ডাকল। কাজেই পড়াশুনায় বাধা পড়ল। তারপর প্রাথমিক ট্রেনিং-এর জন্য গেলাম

ঢাকার পিলখানায়। সেখানে প্রায় তিন মাস ট্রেনিং নিলাম সেখানে আমরা বাঙালি ছিলাম .০০১% অর্থাৎ ব তি নগণ্য। তিন মাস ট্রেনিং এর পর ৪/৫ জন বাঙালির মধ্যে পরীক্ষায় টিকলাম মাত্র দুই জন। অন্যজন নূরুদ্দিন খান (সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান)।

পিলখানার ট্রেনিং শেষে ঢাকার সোয়ারীঘাটে এক খড়মের দোকানে (তখন সোয়ারাঘাটে শত শত খড়মের দোকান ছিল) পার্ট টাইম চাকরি করতাম। সোয়ারীঘাটে আমাদের োকানের কাছাকাছি মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান সাহেব এক ভাড়া করা সাধারণ বাসায় থাকতেন তখন (তখনকার অবস্থা বর্তমান সময়ের মতো ছিলনা। তখনকার মন্ত্রীরা মোটামুটি সাধারণ বাসায় বাস করতেন)। এটা ১৯৫৪ সালের কথা। শেষ মুজিবের সঙ্গে এখানেই ১৯৫৪ সালে প্রথম দেখা হয়। তার তখন খুব নাম ডাক। তাকে আমার দেখার খুব ইচ্ছা। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে প্রচুর লোকজন আসে যায়। একদিন বিকালে আমিও গেলাম। আতাউর রহমান, শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী, লোকজন সেখানে ছিল। শেখ মুজিবের তখন পূর্ণ যৌবন। লম্ফ-ঝম্ফ দিয়ে কথা বলেন। আমি তাকে বললাম, আপনিতো মন্ত্রী হইলেন দুর্নীতির, আমাদের (বাঙালির) জন্য কি রাখলেন?' বললেন, স্বাধীনতা, আমার মুখ সব সময়ই খারাপ, মুখের উপর কথা বলি। তাকে বললাম, কিসের স্বাধীনতা? চুরি চামারীর স্বাধীনতা? বললেন, না, না... দেখ তোমরা এখন বুঝবা না, একদিন দেখবা। তুমি কী কর? বললাম, আপনাদের খড়ম সাপ্লাই দেই। (আমি আর্মিতে ভর্তি হবার প্রাথমিক ট্রেনিং নিয়েছি, ফলাফল-ফাইনাল সিলেকশন বাকি এই সমস্ত কিছুই তাকে বলিনি। সেদিনই তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়)। শেখ মুজিব বললেন, এই কাজ কর কেন, আর্মিতে যেতে পারনা? বললাম, আর্মিতে শতকরা কয়জন বাঙালি নেয় জানা আছে আপনার? কেরানী ছাড়া কাউকেই নেয়না-জানেন আপনি? মুজিব বললেন, আর্মিতে তোমারে নেয়না, এইবার পল্টনে চিৎকার করব। উঠে আসার আগে বললাম, আপনার সঙ্গে দেখা হল সেজন্য ধন্যবাদ, পরে আবার দেখা হলে সেজন্যও ধন্যবাদ। তবে উনি দাঁড়িয়ে আমার সাথে হাত মিলিয়েছিলেন।

এরপর একদিন গ্রামে আমার নামে চিঠি গেল তোমাকে কোহাট যেতে হবে। আমার চৌদ্দ পুরুষে কোহাটের নাম শুনি নাই। ম্যাপেও নাই। এক অবাঙালি সার্জেন্টকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোহাট কোন দেশে? বলল, এ দুনিয়াতেই কোথাও আছে— 'চিন্তা মাত করো।'

কোহাটে ISSB ফাইনাল সিলেকশন বোর্ড বসেছিল। আমি বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হই। আমাদের মূল ট্রেনিং হয়েছিল কাকুলে। ১৯৫৪ সালের জুলাইয়ের দিকে কাকুলে ট্রেনিং এর জন্য গেলাম। ১৯৫৭ সালের ৭ই মে ২১ বালুচ রেজিমেন্ট-এ কমিশন লাভ করি। তখন এই রেজিমেন্ট পেশোয়ারে ছিল। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এই রেজিমেন্ট সিলেটের লাঠিটিলায় ছিল। তখন এই রেজিমেন্টের সঙ্গে ভারতীয়দের যে সমস্ত ছোট খাট সংঘর্ষ হয় তাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। ১৯৬৫ সাল হতে গ্রেফতার (আগরতলা মামলায়–সম্পাদক) হবার আগ পর্যন্ত আমি ক্যাপ্টেন পদে ২১ বালুচ রেজিমেন্টের এ্যাডজুটেন্ট ছিলাম। শুনেছি একাত্তর সালে এই রেজিমেন্ট পেশোয়ারেই ছিল।

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ আগরতলা মামলা তুলে নেবার পর ১৪ ডিভিশনের এ্যাডমিনিসস্ট্রেটিভ অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তুমি কোথায় যাবে? (কোথায় বদলী নিতে ইচ্ছুক)। তার কাছ থেকে একটা সাদা কাগজ চেয়ে নিয়ে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানকে উদ্দেশ্য করে লিখলাম (কারণ কমিশনপ্রাপ্তি বা পদত্যাগে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর লাগে)—

Honourable President,

I hereby resign my commission and I hope it will be accepted.

(তখন মহামান্য লিখতে হত না বা না লিখলেও চলত। Honourable লিখলেই যথেষ্ট হত)।

তিন মাস পর আমার আবেদন গ্রহণ করা হল।

আগরতলা মামলা সম্বন্ধে একটু বলব। এটা ২০০ ভাগ (২০০%) সত্যি ছিল। এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া বাঙালি জাতির ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। উল্লেখ্য কোনো ষড়যন্ত্র মামলা ফৌজদারী ধারায় সংঘটিত হলে Penal Cod-এর ১২১ ধারা আর যদি সংঘটিত না হয় তবে ১২১-A ধারা মতে হয়। এখন প্রশ্ন, যদি কর্নেল ওসমানী আমাদের আলোচনা শ্রবণ করেন (যা পাকিস্তানিরাই মামলার দলিলপত্রে উল্লেখ করেছে)— তাহলে এই মতে ওসমানী কোন ধারায় পড়েন এবং পাকিস্তানিরা আমাদের মত তাকে কেন গ্রেফতার করেনি? এছাড়া আমরা সবাই গ্রেফতার হবার পর পাকিস্তানিরা যখন কোনো সাক্ষী খুঁজে পাচ্ছিল না তখন যিনি (আসামী) রাজসাক্ষী হতে ইচ্ছুক ছিলেন, সংহতির নামে আগরতলা মামলা বেচে খাচ্ছেন।

ঊনসত্তরের ২২শে ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা তুলে নেয়া হল। তারপর ৫/৬ মাস পর্যন্ত বেকার রইলাম। ঘোরাঘুরি করতাম। তারপর আমি সিলেটে আসলাম। সিলেটে এসে ধারকর্জ করে লাকড়ি জ্বালানী কাঠ খরিদ করে বিক্রি করতাম। এরপর একটা জমি খরিদ করে ধানচাষ করাতাম। স্ত্রী, পাঁচ ছেলেমেয়ে নিয়ে কষ্ট করে চলতে হত।

এ সময় কিছু কিছু মানুষ আমার (আগরতলা মামলার আসামী) সঙ্গে দেখা করতে আসত বা দেখতে আসত। কেউ করুণা, কেউ ঠাট্টা, কেউ তিরস্কার করত— তোমরা দেশটা ডুবায়ে দিলা। তখন কোনো উত্তর দিতাম না। কেউ বলত এখন আর্মিতে থাকলে কত কী করতে পারতি...।

আমি সমর্থক ছিলাম স্বাধীনতার। কোনো পদলেহী দলের সদস্য বা সমর্থক ছিলাম না।

আমি মোহাম্মদের (সা.) মতো একজন কমিউনিস্ট। উনি যেমন একটা খেজুর ভাগ করে খেতেন আমিও অনুরূপ ভাবে খেজুর ভাগ করে খাওয়ায় বিশ্বাসী।

আমার আপন দুই ভাই মুক্তিযোদ্ধা ছিল।

আবদুস সাত্তার একাত্তর সালে আর্মি মেডিকেল কোরের সৈনিক ছিল। মুক্তিযুদ্ধে একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে রংপুর, ময়মনসিংহ বাঘমারা অঞ্চলে যুদ্ধ করে।

আবদুর রফিক- আমার তত্ত্বাবধানে মেঘালয় সেক্টরে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে

যুদ্ধ করেছে। বর্তমানে এরা দুজনেই সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা যা করে তাই করে (কৃষিকাজ-সম্পাদন)।

আমার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের একটাই মাত্র কারণ তাহলো এদেশের সাধারণ মানুষের মুক্তি। ২৫শে মার্চের ২/১ মাস আগে থেকেই স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনগণ— সবাইকে আসন্ন বিপদের কথা বলেছি যে যুদ্ধ হবে। মিটিং, মিছিল বাদ দাও- যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নাও। আমার কথায় কেউ কান দেয়নি। কিছু যুবক ছেলে বলল, আপনি যে বলেন যুদ্ধ হবে যুদ্ধতো বুঝি না। একজনের হাতে একটা লাঠি দিলাম তারপর তাকে বললাম তুমি আমাকে বাড়ি দাও। ও বাড়ি দিবার পর আমি তাকে একটা বাড়ি দিলাম। বললাম, এভাবেই যুদ্ধ হবে তবে আরো আধুনিক উপায়ে।

আওয়ামী লীগ অফিসে (সিলেট শহর) গেলাম মার্চের ৭ তারিখে। দেখলাম নেতা, পাতিনেতা, গাজী নেতা, আর কিছু ইট ব্যারিষ্টার বসে বসে চা পান করছেন। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, সাহেবরা কী করছেন? এখানে দেখা যায় উৎসব হচ্ছে। আমি একটা কথা বলে যাচ্ছি— আজকে ৭ তারিখ, সময় ঘনিয়ে আসছে— যুদ্ধ হবে। তখন বোধহয় কোনো নেতা, পাতিনেতা, কাউকেই পাওয়া যাবে না।'

ঘুরে ফিরে যাচ্ছি। এক ইট ব্যারিষ্টারের কণ্ঠ কানে আসল আগরতলায় ছিলতো, স্ক্রু নাই (হাত মাথার কাছে নিয়ে ইঙ্গিত দিয়ে দেখাল)। কিন্তু সামরিক বাহিনীর কিছু রক্ত শরীরে ছিল তাই আবার ফিরে আসলাম। তাকে বললাম, এই শোন— তুই যদি বেঁচে থাকিস আর আমি যদি বেঁচে থাকি তবে এই সিলেটের মাটিতেই আবার দেখা হবে। তখন জিজ্ঞাসা করব কার স্ক্রু ছিল।

যুদ্ধ শেষ হলে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই হোক সিলেট ফিরে আসলাম। লোকমুখে শুনলাম যে ইট ব্যারিস্টার আর এক ঘুষখোর ম্যাজিস্ট্রেটের রুমে বসে তার সাথে আলাপ করছে। আমি তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার ওয়াল্টার রিভলবার হাতে নিয়ে বললাম— এই কি সেই ইট ব্যারিস্টার? সে ঘাড় ঘুরালো। বললাম এই কুকুরের বাচ্চা, এটাতে ১০টা গুলী আছে, তোর জন্য কয়টা লাগবে? এই ৯টা মাস যখন পাঞ্জাবীরা তোর মা বোনদের নিয়ে টানাটানি করেছে তখন তুই কই ছিলি? ম্যাজিস্ট্রেটও ভয়ে কাঁপতে লাগল। বললাম, তোরও টাইম আসতেছে, তবে একটু পরে।

২৫শে মার্চের সারা দিন মধ্যরাত পর্যন্ত সিলেট শহরের বিভিন্ন অংশে অবস্থানরত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহবান জানাই। রাতে আমার বালুচরের বাসায় ভাত খেতে বসলে আমার ঘরের চালে গুলী পড়ে। ঘর থেকে বের হয়ে সাদীপুর হয়ে টিলাগড় চৌরাস্তায় উঠি। সাথে একটা ব্যাগে আমার রিভলবার ছিল। তখন রাত প্রায় আড়াইটা। পূর্বদিক থেকে একটা জীপ দ্রুত বেগে আসছিল। রিভলবার হাতে নিয়ে দ্রুত রাস্তার পাশে আত্মগোপন করলাম। গাড়িটার গতি হ্রাস হয়ে আসে। এরপর উত্তর দিকে মোড় নিয়ে আবার গতি বাড়ার আগেই দ্রুত আরোহীর প্রতি গুলী ছুড়লে তা চালকের মাথায় বিদ্ধ হয় এবং গাড়ি উল্টে যায়, অপর আরোহী আহত হয়। দৌড়ে গিয়ে জীবিত হানাদারের প্রতি আরো একটা

বুলেট ব্যয় করে তাদের একটা চাইনীজ স্টেনগান ও একটা রাইফেল তুলে নিয়ে ডিগ্রী কলেজের সীমানা দেয়াল টপকে পালাই। পরে অনেক স্থান ঘুরে বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে ২৭শে মার্চ ভারত পৌঁছি।

পরে যে অঞ্চল ৫ নম্বর সেক্টর হয় সেটা আমি প্রথম সংগঠিত করি। সিলেট, সুনামগঞ্জ মহকুমার (যা পরবর্তীতে ৪ ও ৫নম্বর সেক্টর হয় বা পরিষ্কার করে বলতে গেলে ভারতের আগরতলা থেকে মহিষকলা পর্যন্ত এলাকা আগস্ট পর্যন্ত কোনো বাঙালি অফিসার এ অঞ্চলে ছিল না। আমি ও বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ছিলাম। তারপর কয়েকজন আসেন, আসেন মানে বর্ডার পর্যন্ত এসে চেহারা দেখিয়ে যাওয়া। যুদ্ধ চলাকালে আমি মেজর পদে প্রমোশন পাই। হরিপুর, শ্রীপুর, হেমু, ডাউকীসহ ৪ ও ৫নং সেক্টর এলাকায় আমি অসংখ্য অপারেশন করেছি। এরমধ্যে জুলাই মাসে করা জৈন্তা অপারেশন আমার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অপারেশন।

জৈন্তা অপারেশনের বর্ণনা

তখন জুলাই মাসের মাঝামাঝি। জৈন্তাপুর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমার পরিবার তখন তামাবিল সীমান্ত থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার ভিতরে সকাপুঞ্জিতে। প্রায় ৮০০ সৈন্য মুক্তাপুরের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে আমি বাসাতে যাই। রাত তিনটায় গুলীবিদ্ধ হয়েছি— স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। এরপর স্ত্রীকে জাগলে রান্না করে খাওয়ান।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে একটা গাছের আড়ালে থেকে আমি মেশিনগান চালাচ্ছিলাম। সাথে একজন নেপালী। গাছ ভেদ করে একটি গুলী আমার গলায় আর নেপালীর দুই উরুতে দুটি গুলী লাগে। তাকে কাঁধে করে বহন করে নিচ্ছি এক হাত দিয়ে, আমার নিজের ক্ষতস্থান ধরে রেখেছি অন্য হাতে। সীমান্তের কাছাকাছি এলে ভারতীয় সৈন্যরা এসে সাহায্য করে। আমি তখন অজ্ঞান হয়ে যাই। আমাকে শিলং হাসপাতালে পাঠানো হয়। এটাই আমার কাছে স্মরণীয় অপারেশন।

বক্তব্য শেষ করার আগে 'বীরত্ব উপাধি' প্রদান নিয়ে দুয়েকটি কথা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি কোনো উপাধির জন্য যুদ্ধ করিনি। যারা আমার আশে-পাশে ছিল তাদের কমাণ্ড আমি মানিনি কারণ তারা সবাই অসৎ ছিল। অসৎ ব্যক্তিদের রিকমেণ্ডেশনে কিছু পাওয়া আল্লাহর কাছে অন্যায়। এবং পাইনি বলে আমার কোনো দুঃখ নাই কারণ বহু মুক্তিযোদ্ধাই উপাধি পায়নি।

আমার অধীনে যারা ছিল তাদের মধ্যে আমি যাদের রিকমেণ্ড করেছিলাম তারা প্রায় কেউই উপাধি পায়নি। কিছু চাটুকার উপাধি পেয়েছে, কীভাবে পেল তা আমি জানিনা যেহেতু আর্মির নিয়মানুসারে যে কমাণ্ডার থাকে তার অনুমতি বা অনুমোদন লাগে।

আমি যে অঞ্চলে ছিলাম সে অঞ্চলে যেসব যোদ্ধা উপাধি পেয়েছেন তারা যদি আমার দস্তখত করা কাগজ (citation) দেখাতে পারেন তবে আমি সেটা স্বীকার করে

নেব। আর এর পরিবর্তে যারা এই উপাধি পেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ যেমন খুন, রাহাজানি, বিচারাধীন মানুষকে বিনা বিচারে বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া, অন্যান্য নানা প্রকার লুটতরাজ ইত্যাদি নানা অভিযোগ মুজিব নগর সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে (এমনকি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের কাছেও) আছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ লোকের জীবন গেল। এদের সবাই সিভিলিয়ান ছিল। একটা সিভিলিয়ানও কি বীর শ্রেষ্ঠ খেতাব পাবার উপযুক্ত ছিল না? এতবড় অন্যায় এই জাতির কোনোদিন সহ্য করা উচিত না। এ নিয়ে এখন অনুসন্ধান করা উচিত যে কে বা কারা এ সমস্ত উপাধি পাবার যোগ্য ছিল এবং কারা রিকমেণ্ডেশন করার যোগ্য ছিল।

(মেজর এম এ মোত্তালিবের এ বক্তব্য ১৯৮৭ সালের। এ দ্রোহী সৈনিক ১৯শে অক্টোবর ১৯৯১ মৃত্যুবরণ করেন।)



ব্রিগেডিয়ার এম. এ. মতিন, বীর প্রতীক

আমার জন্ম মৌলভীবাজার জেলার রসুলপুর গ্রামে ১৯৪২ সালের ২৭শে জানুয়ারি। পিতা মরহুম মৌলভী এম. এ. মিয়া ছোট-খাট জোতদার ছিলেন। মাতা সফিনা খাতুন গৃহিণী। আমরা দুই ভাই, এক বোন। আমিই সর্বকনিষ্ঠ।

আমি গভর্ণমেন্ট জুবলী হাইস্কুল, সুনামগঞ্জ (১৯৫২-৫৯) থেকে ম্যাট্রিক এবং সুনামগঞ্জ কলেজ থেকে আই.এ পাশ করি (১৯৬১)। তারপর চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে বি.এ পড়ার সময় ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে যোগদান করি। ১৯৬৫ সালের ১৮ই এপ্রিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৪র্থ ব্যাটেলিয়ানে (৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল) কমিশন লাভ করি।

আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলাম না। তবে আওয়ামী লীগের বাঙালি জাতীয়তাবাদের মনে প্রাণে সমর্থক ছিলাম।

আমার বড় ভাই এম.এ মুনীর সাবরুমের কাছাকাছি কোনো এক যুব শিবিরের রিলিফ অফিসার ছিলেন। আপন চাচাত ভাই সিরাজুল হক ৭নম্বর সেক্টরে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সরাসরি যুদ্ধ করেছেন। স্বাধীনতার আগে ও পরে তিনি বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আরেক ভাই এর ছেলে মুজিবুর রহমান ৪নম্বর সেক্টরে কর্মরত ছিলেন। তিনি বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

আমি ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের ভাওয়ালপুর ক্যান্টনমেন্ট হতে বদলী হয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের একটি কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে কুমিল্লা সেনানিবাসে যোগ দিই। তখন আমি ক্যাপ্টেন। আমাদের সাথে এই ব্যাটেলিয়ানে অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর শাফায়াত জামিল ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিন, ক্যাপ্টেন আবদুল গাফ্‌ফার হাওলাদার, লে. মাহবুবুর রহমান, লে. ফজলুল কবীর ও লে. হারুনুর রশীদ।

২৩শে মার্চ দিবাগত রাত ১১/১২টার দিকে আমার ব্যাটম্যান আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বলল যে মেজর খালেদ মোশররফ আমাকে ডাকছেন। অফিসারস্ মেস

থেকে তার সাথে বেরিয়ে এলাম, অন্ধকারের মধ্যে সে আমাকে হাঁটিয়ে একটা কাঁঠাল গাছের নীচে নিয়ে গেল। সেখানে যেসব অফিসার ও জেসিও উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন, খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিল, আবদুল গাফফার হাওলাদার, সুবেদার মেজর ইদ্রিস মিয়া, হাবিলদার মুনীর, হাবিলদার শহীদ হাবিলদার আবু শামা, হাবিলদার বেলায়েত। এরাই ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলকে একত্রিত করে বিদ্রোহ ঘোষণা করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আমি ১৯৬৯ হতে দু'বছর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলাম বলে এই ব্যাটেলিয়ান (৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল) হতে বিচ্ছিন্ন ছিলাম।

মেজর খালেদ সেখানে আমাদের ২/৩টা কথা বললেন। যেমন, শেখ সাহেবের সাথে পাকিস্তানিরা যে আলোচনা চালাচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভাঁওতা... পাকিস্তানিরা জনগণের আন্দোলনকে দমিয়ে দেবার জন্য সময় নিচ্ছে to build up their army here. যদি আমাদের জাতীয় সত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তবে সশস্ত্র আন্দোলন ছাড়া পথ নেই। পরিস্থিতি যদি আরও খারাপ হয় তবে অস্ত্রাগার খুলে অতিরিক্ত অস্ত্র জনগণকে দিয়ে দেয়া হবে।

তিনি সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন যদি পাক আক্রমণ হয় তবে কী করতে হবে। তবে আমি ছাড়া বাকি সবাই বোধ হয় তা আগে থেকেই জানতেন। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানিদের নাকের ডগায় বসে ঠাণ্ডা মাথায় এ ধরনের সিদ্ধান্ত একমাত্র খালেদ মোশাররফই দিতে পারতেন।

পাক ব্রিগেড কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি এটা টের পেয়ে আমাদের বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। পাকিস্তানিরা জানত মেজর খালেদ মোশাররফ মনে প্রাণে জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তাই তাকে একটা কোম্পানি নিয়ে শামসেরনগর যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। ২৫শে মার্চ দুপুরে তিনি শামসেরনগর রওনা দেন। তার সাথে ছিলেন লে. মাহবুবুর রহমান। বাকি ব্যাটেলিয়ান ঐ রাতে কুমিল্লা হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রওনা হয়।

খালেদ মোশাররফ রওনা হবার আগে চুপচাপ আমাদের বলে যান যেন অতিরিক্ত সমস্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ রসদপত্র (খাবার, জ্বালানী) বহনের ট্রাকের ভিতর লুকিয়ে নিয়ে যাই। কোনো কিছুই যেন বাদ না থাকে। এছাড়াও উনি একটা সাংকেতিক বার্তা দিয়ে গেলেন। বাক্যটা মনে নেই তবে তা বিচিত্র ধরনের বাক্য ছিল। আমরা কোনো কিছু করে ওয়্যারলেসে ঐ সংকেত জানালে তিনি যেন আমাদের সাথে যোগদান করতে পারেন।

২৬শে মার্চ সকালে আমরা যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কাছে আসি তখন দেখলাম জনগণ রেলওয়ের বগি, গাছ ইত্যাদি দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছে। তখন যাদের এসব কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে দেখেছি তারা হলেন তাহের উদ্দিন ঠাকুর, আব্দুস কুদ্দুস মাখন, সাচ্চু মিয়া (স্থানীয় নেতা)। ওরা কিছুতেই ব্যারিকেড সরাচ্ছিলেন না। আমরা কয়েকজন বুঝালাম যে, আমরা বাঙালি, বাঙালি মারতে আসিনি। দরকার হলে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব।

আমাদের এক সেন্ট্রীর নাম ছিল মুনীর। তার একটি ট্রানজিস্টর ছিল। ২৭শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতারে মেজর জিয়ার ঘোষণা শুনে সে এবং আরও ২/১ জন সৈনিক উত্তেজিত

হয়ে দৌড়ে আমাদের কাছে এসে যা বলেছিল তা আজো স্পষ্ট মনে আছে— "স্যার, আর অপেক্ষা করার সময় নাই। যদি আপনারা কোনো সিদ্ধান্ত না নেন তবে আমরা নিজেরাই বেরিয়ে গিয়ে কিছু করার চেষ্টা করব।"

ব্যাটেলিয়ান কমাণ্ডার লে. কর্নেল মালিক খিজির হায়াত খান (অবাঙালি) ও মেজর সাদেক (অবাঙালি) নেওয়াজকে বন্দি করা হয়। নিরাপত্তার জন্য প্রথমে তাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলে রাখা হয়। জনগণ তাদের উপর ক্ষেপে ছিল তাই পরে তাদের ভারত পাঠিয়ে দেয়া হয়। মেজর খালেদ মোশাররফ ঐ বার্তা শোনার পর দুপুরের দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসেন ও নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এভাবে ২৭শে মার্চ ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন জায়গায় (প্রধানত দুইটা অবস্থান ও একটা ব্রীজে) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেয়া হয় যেন কুমিল্লা হতে পাক বাহিনী আক্রমণ করতে না পারে আর গোকর্ণঘাটে প্রতিরক্ষা নেয়া হয় যেন ঢাকা হতে কোনো আক্রমণ না আসে। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে থাকার সময় ২য় ইস্ট বেঙ্গলের সাথে যোগাযোগ হল। তখন তার সিও ছিলেন মেজর শফিউল্লা। মেজর সিআর দত্ত ছুটিতে সিলেট ছিলেন। তার সাথেও যোগাযোগ হয়। তবে চট্টগ্রামের সাথে কোনো সরাসরি যোগাযোগ হয়নি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কয়েকদিন কেটে যায় আলোচনায়। কীভাবে সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত তা খালেদ মোশাররফ জানতেন। তিনি তার বাহিনীর হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়া চা বাগানে স্থাপন করেন। খালেদ মোশাররফ বুঝতে পেরেছিলেন নিয়মিত বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে। গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার পরিকল্পনা তিনি এখান থেকেই নেন। সেই সাথে দেশের ভিতর বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন।

সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালীর বিওপিতে অবস্থানরত ইপিআর জোয়ানরা নেতৃত্বের অভাবে যুদ্ধে যোগদানের প্রশ্নে কনফিউসড্ ছিল। মেজর খালেদের নির্দেশে প্রচুর পরিশ্রম করে এই ইপিআরদের একত্রিত করার একক কৃতিত্ব লে. মাহবুবের।

৪ঠা এপ্রিল হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা বাগানের ম্যানেজারের বাংলোয় এক সম্মেলন হয়। তাতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, মেজর জিয়ার সাহায্যের জন্য ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল হতে কিছু অফিসার ও সৈন্য চট্টগ্রাম যাবে। কর্নেল ওসমানী সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ২য় ইস্ট বেঙ্গল থেকেও একটি কোম্পানি পাঠানো হয়।

এপ্রিলের ৩/৪ তারিখের দিকে খবর এলো যে, মেজর জিয়ার পক্ষে চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না ও যেহেতু আমরা পুরো ব্যাটেলিয়ান ছিলাম তাই তিনি আমাদের সাহায্য চেয়ে পাঠান। তখনই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় আমাকে আমাদের ব্রাভো কোম্পানিসহ পাঠানো হবে। সঙ্গে কিছু ইপিআর সেনাও থাকবে।

আমি আমার সৈন্যদের নিয়ে আগরতলা সাবরুম হয়ে রামগড় পৌঁছলাম। সেদিন এপ্রিলের ৭ তারিখ। সময় বিকেল ৩/৪টা। রামগড় এসে দেখা হলো মেজর জিয়া, ক্যাপ্টেন রফিক, মেজর মীর শওকত আলী, ক্যাপ্টেন কাদের, এইচ.টি. ইমাম প্রমুখের

সাথে। নীল প্যান্ট, সাদা হাফ শার্ট পরিহিত মেজর জিয়া, ক্যাপ্টেন রফিক নদীর পাড়ে বসে ম্যাপ দেখছিলেন। আমরা সে রাত কাটাই রামগড় স্কুলে।

পরদিন আমার অধীনস্থ সৈন্যদের দু'ভাগ করা হয়। সুবেদার মেজর আব্দুর রহমান ভুঁইয়ার অধীনে রাউজান এলাকায় পাঠানো হয় এক প্লাটুন সৈন্য। কারণ মেজর জিয়ার কাছে খবর আসছিলো যে, ফজলুল কাদের চৌধুরী ও তার ছেলে সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরীর অত্যাচারে কোনো মুক্তিকামী লোক ঐ এলাকায় থাকতে পারছে না এবং ফ. কা. চৌধুরী ঐ এলাকায় পাক সৈন্য আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। যে সব শরণার্থী ভারতের দিকে যাচ্ছিল তাদের কাছ হতে এসব সংবাদ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে সুবেদার আবদুর রহমান ভূঁইয়া রাউজান হতে ফিরে এলে তার ও তার অধীনস্থ সৈন্যদের মুখে ফ. কা. চৌধুরী, সা. কা. চৌধুরী ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের যে রোমহর্ষক অত্যাচারের কাহিনী শুনি তা যে কোনো বাঙালির জন্য কলঙ্কজনক। তাদের অপরাধ শাহ আজিজ হতেও বেশি বলে আমি মনে করি। এ প্রসঙ্গে আরো দুজন লোকের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন যাদের অত্যাচারের কাহিনী আমরা ভারতে থেকেও শুনতে পেতাম। তারা হচ্ছে মওলানা আবদুল মান্নান, কুমিল্লা ও আবদুল আলীম, জয়পুরহাট।

আমাকে পাঠান হয় ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল-সড়ক বন্ধ করে দেবার জন্য। আমরা প্রথমে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেই কুমিল্লা আর ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের মাঝামাঝি জায়গায়। সীতাকুণ্ডের ভেতর দিয়ে এই স্থানে আসার পথে (তখন সন্ধ্যা রাত) অন্তত কুড়িটার মত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পাই। তাদের রাস্তা হতে তুলে অন্যত্র কবর দেই। হয়তো পাকিস্তানিরা আমাদের আসার খবর আগেই পেয়েছিল তাই ঐ দিন বিমান হতে বোমাবর্ষন করে।

আমাকে চট্টগ্রামে মেজর জিয়ার সাহায্যার্থে পাঠানোর সময়ই মেজর খালেদ মোশাররফ সেখানে (চট্টগ্রাম) কীভাবে যুদ্ধ করতে হবে তার ব্রিফিং দিয়ে দেন কারণ আগেই জানা ছিল যে, প্রয়োজনে আমাকে পুরো কোম্পানি নিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পাঠান হবে। মেজর খালেদ বলেছিলেন যে, সমুদ্রের দিক হতেই ওরা (পাক বাহিনী) আসার চেষ্টা করবে। কারণ বাঙালিদের কোনো নৌযান নেই তাই সমুদ্র পথে বাঙালিদের কাছ হতে বাঁধা পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। পাহাড়ের দিক হতে পাক হামলা হবার সম্ভাবনা কম কারণ অচেনা পথঘাট ও সেখানে কী রকম পরিস্থিতি তা ওদের জানা নেই। সামনের দিক হতে ওরা ভান করবে তারা সামনে থেকে আক্রমণ করবে তবে মূল আক্রমণ আসার সম্ভাবনা সমুদ্রের দিকে হতে।

সত্যি সত্যিই তাই ঘটেছিল। প্রথম ডিফেন্স চার দিন ধরে রাখতে পেরেছিলাম। পিছিয়ে গিয়ে সীতাকুণ্ডে পরবর্তী ডিফেন্স নেই। সীতাকুণ্ডে সপ্তাহ খানেক ছিলাম। সীতাকুণ্ডে থাকাকালীন এক দুপুর বেলায় আম গাছের নীচে বসে আকাশবানীতে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠনের সংবাদ প্রথম শুনলাম। এ সংবাদ প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার ভেতর নতুন আশার সঞ্চার করে।

সীতাকুণ্ডের পর মাস্তান নগরে ডিফেন্স গ্রহণ করি। এটাই আমার জীবনের স্মরণীয় ডিফেন্স। মাস্তান নগরে সাত দিন ছিলাম। এই ডিফেন্সে থাকার সময়, সূর্য ওঠার আগে

খুব ভোর বেলায় কিছু গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেয়ে হাবিলদার নজরুল ইসলামকে নিয়ে আমাদের মেশিন গান পোস্টে গেলাম। তার চার্জে ছিলেন হাবিলদার আবু শামা। একটা দীঘির উঁচু পাড়ের ওপর মেশিন গান পোস্টের অবস্থান ছিল যার ফলে সামনের বিরাট এলাকা পোস্ট হতে দেখা যেত।

আমি যাবার পর গোলাগুলির প্রচণ্ডতা বেড়ে যায় ও সারাদিন চলার পর সন্ধ্যার দিকে ট্রেঞ্চে বসে মনে হল যে, আমাদের পেছনেও গোলাগুলি হচ্ছে। আমার ডান ও বামে আমাদের অবস্থান ঠিক আছে কিনা তা জানার জন্য ইপিআর-এর একজন সৈনিককে পাঠালাম ডান দিকে। সে ক্রলিং করে গিয়ে ফিরে এসে জানাল যে, ডান দিকে আমাদের অবস্থানে পাকিস্তানিরা এসে গেছে। তারপর তাকে বাম দিকের অবস্থান দেখতে পাঠালাম। আমার অবস্থানের ৫০/৬০ গজ দূরে বাম দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহা সড়ক। সেই সৈনিকটা ২০/২৫ গজ দূরে গিয়ে আবার ফিরে এসে জানাল যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ওপর পাকিস্তানিরা এসে গেছে।

আমার পকেটে ভারতীয় সিগারেট, মানি ব্যাগে কিছু পাকিস্তানি টাকা ও একটা গ্রুপ ফটো ছিল। ফটোটা বের করে বুক পকেটে রাখলাম। তাতে আমার স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ের ছবি ছিল। কিন্তু মনে মনে কারো চেহারা মিলাতে পারছিলাম না। মার কথা মনে হয়েছিল কিন্তু তারও চেহারা মনে করতে পারছিলাম না। নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলাম যে মারা পড়ব।

তিনটা সিগারেট ধরিয়ে খেলাম— মানে দু'এক টান দিয়ে ফেলে দেয়া। আবু শামাকেও একটা সিগারেট দিলাম যা কখনো কোনো অধীনস্থকে দিইনি। আমি তৃতীয় সিগারেটে টান দেবার সময় আবু শামা বলল, "স্যার দেখি পেছনে যেতে পারি কি না?" এমন সময় ট্যাঙ্কের একটা লাল গোলা এসে আমাদের বাঙ্কারের ছাদ উড়িয়ে নিয়ে যায়। মৃত্যু নিশ্চিত। আবু শামার মতো সাহসী সৈন্য আর দেখিনি। সে বলল, "স্যার আবু শামা বেঁচে থাকতে আপনার কিছু হবে না ইনশাল্লাহ।" সে আমাকে একটা পিস্তল দিল যেন ধরা পড়লে আত্মহত্যা করতে পারি আর নিজের একটা সাব-মেশিনগান (এসএমজি) নিয়ে আমাকে কভারিং ফায়ার দিতে লাগল। আমি পিছনে দৌড় দিলাম। পেছনে ৪০০/৫০০ গজ দূরে একটা নালা ছিল। ওটার কাছাকাছি আসার সময় শুনতে পেলাম যে পাকিস্তানিরা বলছে 'উ শালাকো পাকড়ো, ভাগ যাতা...।' ওরা হয়তো বুঝতে পেরেছিল যে আমিই কমাণ্ডিং অফিসার। তাই আমাকে জীবিত ধরতে চেয়েছিল, গুলিও আমার দূরে দূরে ফেলছিল। আমি দৌড়ে নালাতে পড়ে গিয়ে ৪/৫ মিনিট জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। ইতোমধ্যে আমার সৈন্যরা পিছিয়ে এসে নতুন জায়গায় ডিফেন্স নিচ্ছিল। কিন্তু আমার ড্রাইভার আবুল বশর (সিভিলিয়ান, গান্ধারা ইণ্ডাস্ট্রীতে চাকরি করত) জীপ গাড়িকে মহাসড়কের ওপর একটা বিরাট বটগাছের আড়ালে রেখে আমার সন্ধানে আসছিল। আমাকে নালাতে পড়তে দেখে বশর ও আরেক সৈনিক (নাম মনে নেই, তার বাড়ি সন্দ্বীপ) দৌড়ে এসে আমাকে ধরে জীপে তুলে নিয়ে যায়। ততক্ষণ চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে তাই পাকিস্তানিরা আমাকে আর দেখতে পায়নি। পরে শুনেছিলাম যে, প্রায় প্রচুর পাক সৈন্য মাস্তাননগরে মারা পড়েছিল।

এরপর মীরেশ্বরাই ডিফেন্সে ৪/৫ দিন ছিলাম। এখানে আমাদের বেশ কয়েকজন

হতাহত হয়। তারপর আন্ধারমানিক (জায়গাটা সম্ভবত চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের মাঝামাঝি) বিওপি-তে ছিলাম। আন্ধারমানিকে কয়েকদিন থাকার পর চলে যাই ছাগলনাইয়াতে। সেখানে দেখা হলো ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের সাথে। ওখানেই মেজর খালেদ মোশাররফের সাথে যোগাযোগ হল। খাজা আহমেদ এমএনএ (ডাক নাম খাজা মিয়া) ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গেও দেখা হল।

ছাগলনাইয়াতে কয়েকদিন থাকার পর বেলুনিয়া হয়ে খালেদ মোশাররফের হেডকোয়ার্টার মতিনগরে তার সাথে আবার যোগ দিই।

ভারতে আসার পর আমাকে বিবিরবাজার ডিফেন্সে দেয়া হল। বিবিরবাজারে কয়েকদিন ছিলাম। এর মধ্যেই কর্তৃপক্ষ মেজর খালেদকে একটা সেক্টর অর্গানাইজ করতে বললেন। তখন আমাদের ২ নম্বর সেক্টরকে আটটা সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়।

২ নম্বর সেক্টর আখাউড়া হতে বেলুনিয়া পর্যন্ত ছিল। এর অধীনে ছিলো— সম্পূর্ণ নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা (বাহ্মণবাড়িয়া, সরাইল বাদ), ঢাকা (রূপগঞ্জ ও কিছু এলাকা বাদ), ও ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ মহকুমা। এটা সবচেয়ে বড় সেক্টর ছিল।

প্রথমে আমি এই সেক্টরের স্টাফ অফিসার নিযুক্ত হই। তারপর কে ফোর্স ব্রিগেড গঠন করার পর খালেদ মোশাররফ আমাকে ব্রিগেড মেজর করেন। কারণ মেজর শাফায়াত জামিল ৩য় ইস্ট বেঙ্গলে চলে যাবার পর খালেদ মোশাররফের পর আমিই সিনিয়র অফিসার ছিলাম। আমার কাজ ছিল অপারেশন এবং প্রশিক্ষণ ছাড়া সবকিছু। কিন্তু অপারেশন খালেদ মোশাররফের হাতে ছিল। হেডকোয়ার্টারে যোগ দেবার পর আর সরাসরি অপারেশনে যাইনি।

মতিনগর থেকে আমাদের হেডকোয়ার্টার কয়েক মাইল পেছনে মেলাঘরে নিয়ে আসা হয় কারণ সেখানে (মতিনগর) প্রশিক্ষণের জায়গার অভাব ছিল।

পরে বিভিন্ন সময় যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী ত্যাগ করে এই সেক্টরে যোগ দেন তারা হলেন ক্যাপ্টেন সালেক, ক্যাপ্টেন হায়দার, ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন, ক্যাপ্টেন ইমামুজ্জামান, ক্যাপ্টেন শহীদুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন এ.টি.এম. আবদুল ওহাব, ক্যাপ্টেন মোস্তফা কামাল, ক্যাপ্টেন জয়নুল আবেদীন, লে. আবদুল মালেক, লে. বদরুল হুদা, ক্যাপ্টেন আজিজ পাশা, লে. দিদার, লে. মতিন, ক্যাডেট হুমায়ুন কবীর, ক্যাপ্টেন (ডা.) সীতারা বেগম, লে. মমতাজ হাসান, ক্যাপ্টেন আনোয়ার, ক্যাপ্টেন আশরাফ, লে. জামিল, লে. জিল্লুর রহমান, লে. শাহরিয়ার হুদা, ক্যাপ্টেন শওকত আলী, লে. মোসলেম, লে. আজিজুল ইসলাম, লে. মিজান, লে. মুনির, ক্যাপ্টেন রশিদ ও লে. দিদার।

মেলাঘরে দুজন ডাক্তার লণ্ডন হতে এসে যোগ দেন। এরা হচ্ছেন ডা. জাফরউল্লা চৌধুরী ও ডা. মোবিন। এর আগে থেকেই আরেকজন বাঙালি ডাক্তার বাংলাদেশ হতে যোগ দিয়েছিলেন। তার নাম ডা. নাজিম। তিনি অনেক কষ্ট করেছেন। তাছাড়া ক্যাপ্টেন (ডা.) আখতার আহমেদ ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলে ডাক্তার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বিশ্রামগঞ্জে প্রায় ৩০০ বেডের হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। এর ঘর তৈরির পেছনে ডা. মোবিনের অবদান প্রচুর। আমার মনে আছে ডা. মোবিন গাড়ি করে লোকজনকে

নিয়ে ২০/২৫ মাইল দূরে গিয়ে বাঁশ কেটে নিয়ে আসতেন। কিন্তু সার্জিকাল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি যোগাড় করার ব্যাপারে ডা. জাফরউল্লার অবদান বেশি। তিনি ইংল্যাণ্ড হতে অনেক জিনিস নিয়ে আসেন।

অক্টোবর মাসে আমার যক্ষা রোগ ধরা পড়ে। হেডকোয়ার্টারে ৩/৪ মাস রাতে ঘুমাতে পারিনি। খাবার, বিশ্রামের অভাবের জন্য শরীর খুব দুর্বল ছিল। রোগ ধরা পড়ার পর হাসপাতালে ভর্তি হই। ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীনের খবর হাসপাতালেই পাই। ১৬ই ডিসেম্বর আনন্দ দিয়েছে কিন্তু পুরোপুরি তৃপ্তি দেয়নি। আমরা হিসেব করেছিলাম যে, তিন বছর যুদ্ধ করে আমরাই দেশ স্বাধীন করব। আমরা চাইতাম ভারত সাহায্য করুক কিন্তু সরাসরি হস্তক্ষেপ করুক তা চাইতাম না। আমাদের (নিয়মিত বাহিনীর) সম্মানে একটা ঘা লাগে।

জেনারেল জিয়া মাস্তান নগর ডিফেন্সের কারণে আমার জন্য সর্বোচ্চ বীরত্ব উপাধি সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু পরে 'বীর প্রতীক' উপাধি পাই। কোনো বিশেষ অপারেশন অথবা সামগ্রিক কাজের জন্য এ উপাধি দেওয়া হয়েছে কিনা তা জানা নেই। তবে মনে হয় মাস্তান নগর ডিফেন্সের কারণেই এ উপাধি দেয়া হয়।

একাত্তর সালে আমি কোনো প্রমোশন পাইনি। কারণ আর্মিতে নিয়ম যতদিন স্বাস্থ্য ক্যাটাগরি 'এ' না হবে, মানে হাসপাতালে থাকতে হবে ততদিন প্রমোশন বন্ধ থাকবে। ১৯৭২ সালে মেজর পদে প্রথমে কুমিল্লায় ব্রিগেড মেজর ও পরে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের কমাণ্ডিং অফিসারের (CO) দায়িত্ব পালন করি। ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এডজুটেন্ট জেনারেল ছিলাম। ১৯৭৪ সালে লে. কর্নেল পদে উন্নীত হই ও ভারতে Staff College-এ Higher Command বিষয়ে পড়াশুনা করি। ১৯৭৫-৭৬ সালে আমি আর্মি হেডকোয়ার্টারে ডিরেক্টর, স্টাফ ডিউটি পদে কর্মরত ছিলাম। ১৯৭৬ সালে কর্নেল পদে উন্নীত হই ও ৭৬' সাল হতে ৭৮'-এর মধ্যভাগ পর্যন্ত চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমান্ড্যান্ট ও চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের স্টেশন কমান্ডার ছিলাম। ১৯৭৮ সালে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হই ও '৭৮-'৮১ (মাঝামাঝি) সালে বার্মা, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামরিক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করি।

জেনারেল জিয়ার মৃত্যুর কয়েকদিন পর আমাকে রিটায়ার করানো হয়। তারিখ মনে নেই, মনে করার চেষ্টাও করি না। কাগজপত্রে লেখা আছে।

কিছু স্মরণীয় ঘটনা :

* একদিন মেজর খালেদ মোশাররফ বললেন, "মতিন, তোমার স্ত্রীকে কি বলেছ, যে আমরা যদি মরে যাই তবে তোমার ছেলেকে মুক্তিযোদ্ধা করতে হবে?" বললাম, "স্যার ওটা বলার দরকার হবে না, না বললেও আমার ছেলে বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।"
* অনেক মহিলা, অনেক মেয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একজন ভদ্রমহিলা, ('৭১ এ তার বিয়ে হয়নি, ১৮/২০ বছর বয়স)। এক রাতে আমরা বসে চিন্তা ভাবনা করছি মেয়েদের দিয়ে কী করানো যায়?

এদের অনেকেরই প্রবল ইচ্ছা ছেলেদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার। বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব নয়। প্রশ্ন দেখা দিল তাহলে কীভাবে তাদের অবদান গ্রহণ করা যায়। তাদের বাসস্থান, নিরাপত্তা, টয়লেট, শারিরীক জটিলতা। এসব তাদের জীবনের স্বাভাবিক বিষয় হলেও এ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সমস্যাটি প্রকট হয়ে দেখা দিল। এক রাতে মেজর খালেদ এবং আমরা কয়েকজন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। বোধকরি আমাদের সমস্যাটি তারাও উপলব্ধি করছিল। এক মেয়ে, বয়স ১৮/১৯ তখনো তার বিয়ে হয়নি এগিয়ে এল। সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'স্যার বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য নিজেদের প্রাণসহ সব দিচ্ছেন। স্বাধীনতার জন্য আমরাও সব দিতে প্রস্তুত আছি। মেয়েটি এবার চোখের দৃষ্টি নিচে করে ক'সেকেন্ড চুপ করে রইল। টপ টপ করে চোখ থেকে পানির ফোটা মাটিতে পড়ছে। বলল আবার, 'আমাদের সম্ভ্রমও'।

* জুন মাসে খবর পেলাম যে আমার স্ত্রী এক জায়গায় আছে। তাকে আনবার জন্য পাঠালাম শিল্পী শাহাবুদ্দিন (এখন ফ্রান্সে নাম করা চিত্রশিল্পী) ও আরেক জনকে (নাম মনে নেই, পরে সেনাবাহিনী হতে মেজর হিসেবে অবসর করেছে)। তারা ও আমার স্ত্রী চট্টগ্রাম হতে ছাগলনাইয়া দিয়ে ভারত আসে, ১৪/১৫ মাইল এক নাগাড়ে হেঁটে। তাতে আমার মেয়ে যে আমার বড় ছেলের ছোট ছিল, অসুস্থ হয়ে যায় ও ভারতে কিছুদিন পর মারা যায়।

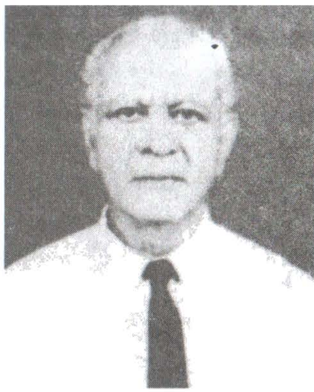
* জুলাই মাসে নারায়ণগঞ্জ টানবাজার থানা অপারেশন করা হয়। সেই অপারেশনে নারায়ণগঞ্জেরই এক হিন্দু ছেলে (টানবাজার বাড়ি) ছিল ফিরে আসার সময় এক রাজাকারের গুলিতে মারা যায়। ছেলেটার বাবার নারায়ণগঞ্জে ছোটখাটো ব্যবসা ছিল। তিনি আমাদের ক্যাম্পের পাশে এক রিফিউজী ক্যাম্পে থাকতেন। মেজর খালেদ মোশাররফ আমাকে বললেন যেন ওকে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করি আর তাকে সান্ত্বনা বাণী শোনাই। ভদ্রলোককে মেলাঘরে ডেকে পাঠালাম। ওকে সান্ত্বনা দিলাম, তবে লক্ষ করলাম উনি আমার কথাগুলো ঠিকমত শুনছেন না। জিজ্ঞসা করলাম, "দাদা কী চিন্তা করছেন?" তিনি বললেন, "আমি চিন্তা করছি ভগবান কেন আমাকে একটা ছেলে দিল, আরেকটা দিলে তো মুক্তিযুদ্ধে পাঠাতাম।"

* অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ। রাত প্রায় ১২টা, অফিসে বসে কাজ করছি। এমন সময় মেজর খালেদ মোশাররফ বেলুনিয়া হতে ফিরলেন। আমি তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। উনি বলেলেন, মতিন, 'হারিকেন নিয়ে আস, বাথরুমে যাব।' বাথরুম পাহাড়ের নিচে প্রায় ১০০ গজ দূরে ছিল। ঘরের ভেতর লোক বসে ছিল তাই আমার মনে হলো তিনি আমার সাথে নির্জনে কথা বলতে চান। তার সঙ্গে যাচ্ছি, আমার হাতে হারিকেন। জঙ্গলের মতো এক জায়গায় থেমে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মতিন, বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হয় তবে কে আমাদের শত্রু হবে?' আমি বললাম, 'ভারত তো বাংলাদেশের তিন দিকে ঘেরা,

ভারত এখন আমাদের আশ্রয়, অস্ত্র, সাহায্য এবং সহায়তা করছে। ভারত তো আমাদের শত্রু হতে পারে না।' তিনি সিগারেট খাচ্ছিলেন। সিগারেটটা মাটির ওপর ফেলে দিয়ে বুট দিয়ে মাটিতে কয়েকটা আঘাত করে বললেন, 'This is the country which will be our greatest enemy.'

* অক্টোবরের শেষ দিকে বিবির বাজারে এক হিন্দু ভদ্র মহিলা পাকিস্তানিদের গুলিতে ভীষণ ভাবে আহত হন। তাকে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে আনা হয়। কিন্তু ভদ্র মহিলার অত্যাধিক রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। যে ডাক্তার তার পাশে ছিলেন তিনি ভদ্র মহিলাকে সান্তনা দিচ্ছিলেন, কারণ অপারেশন বা রক্ত দেয়া সম্ভব ছিল না। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ভদ্রমহিলা ডা. মোবিনের হাত ধরে বলেছিলেন, 'দাদা, আমিতো মরে যাব কিন্তু আপনারা দেশটাকে স্বাধীন করে যাবেন।'

(বিগ্রেডিয়ার এম.এ. মতিন ১৯শে আগস্ট ২০০৯ সালে ইন্তেকাল করেন)



কর্নেল সালাউদ্দিন মোহাম্মদ রেজা, পিএসসি

১৯২৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম শহরে আমার জন্ম হয়। আমার পৈত্রিক নিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর অঞ্চলের রূপদী ভোলানগর (দেওয়ানবাড়ি) ও পরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মোলভীপাড়ায়। আমার পিতার নাম মো. আবদুল্লাহ। তিনি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে ছিলেন— প্রথমে ১৯০৭ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকুরিতে যোগদান করে সর্বশেষ ১৯৩৭ সালে রাজশাহী ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে অবসরগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭১ সালের ১৮ই মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইন্তেকাল করেন। আমার মাতার নাম রাহাতুননেসা। তিনি ১৯৬৭ সালে ইন্তেকাল করেন। আমরা মোট ৬ ভাই, ২ বোন। আমার স্থান ৭ম। আমার ছোট এক ভাই।

আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা হাই স্কুলে লেখাপড়া আরম্ভ করি। পরে বরিশাল জেলা স্কুল, চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পড়াশুনা করি। ১৯৩৯ সালে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্সটিটিউসন স্কুল, হুগলী হতে আর্টস বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করি (৫টি বিষয়ে লেটারসহ স্টার)। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বেঙ্গল ও আসাম প্রদেশে ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নাম্বার পাওয়াতে দুটি স্বর্ণ পদক লাভ করি।

১৯৪১ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হতে আই. এ পরীক্ষায় ৫ম স্থান অধিকার করি। ১৯৪৪ সালে একই কলেজ হতে ইতিহাস বিষয়ে অনার্স পরীক্ষায় সম্ভবত 2nd Class 1st স্থান লাভ করি। যতদূর স্মরণ হয় সেবছর কেউ উক্ত বিষয়ে ১ম শ্রেণী লাভ করেনি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা সিটি ল কলেজ হতে তিয়াত্তর অথবা চুয়াত্তর সালে (আমার রিটায়ারমেন্টের পর) এলএলবি ডিগ্রী লাভ করি।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন চাকুরিরত অফিসার ছিলাম। আমি ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে পাকিস্তান সেনবাহিনীতে যোগদান করি এবং ১৯৪৮ (২৫ নভেম্বর ১৯৪৮-সম্পাদক) সালে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি (PMA), কাকুল থেকে সেকেণ্ড লেফ্‌টনেন্ট হিসেবে পদাতিক বাহিনীতে রেগুলার কমিশন লাভ করি।

বাঙালি মুসলমানদের ভিতর প্রথম আমিই PMA হতে পাশ করি এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পার্মানেন্ট পোস্টিং পাই। ১৯৪৭ সালে সেকেণ্ড লেফ্‌টেনেন্ট হিসেবে প্রথমে 1st ও পরে 2nd East Bengal Regiment-এ কর্মরত ছিলাম। পরে ১৯৫৯ সালে Command & Staff College হতে psc ডিগ্রী লাভ করি।

১৯৪৭ সালের শেষ দিকে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি, কাকুলে ভর্তির জন্য সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড ঢাকায় আসে। তেজগাঁয় তাদের হেডকোয়ার্টার ছিল। প্রায় হাজার খানেক ছেলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। বাঙালি ছাড়াও ইউপি, পাঞ্জাব, করাচী ও অন্যান্য জায়গা হতেও অনেকে পরীক্ষা দিতে ঢাকা এসেছিল। তাছাড়া অনেক বিহারীও ছিল। অবাঙালিদের যুক্তি ছিল যেহেতু পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান একই দেশ তাই যে জায়গাতেই বোর্ড বসুক এতে যেকোনো পাকিস্তানি অংশ নিতে পারবে।

শত শত ছেলের মধ্যে প্রায় ৬০/৭০ জনকে select করা হয়। এদের মধ্যে মাত্র চারজন বাঙালি ছিল। আমি ছাড়া বাকি ৩জন—আগা ইউসুফ (আমার কলেজ বন্ধু, মেজর), মাহফুজুর রহমান (মেজর), মাহমুদুর রহমান মজুমদার (ব্রিগেডিয়ার)।

Selection-এর সময় প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত অথচ খেতে দেওয়া হতো ঠাণ্ডা ডাল আর রাবারের মত রুটি। এই খাওয়া নিয়ে আমাদের গ্রুপ ট্রেস্টিং অফিসারের নিকট আপত্তি করায় তিনি উদ্ধত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ঢাকার নবাবের ছেলে যে এ খাবার খেতে আপত্তি করছ? উত্তরে বললাম, আমি আমার বাপেরই ছেলে, আশা করি তুমি নিজ সম্বন্ধেও অনুরূপ দাবি করতে পারবে। রাগে উন্মত্ত হয়ে তিনি আমাকে সোজা করার শাসানি দিয়ে হয়ত চেয়ারম্যান, জেনারেল হাবিবুল্লাহর অফিসের দিকেই গেলেন। এটা নিয়ে কেউ আমাকে আর কিছু বলেনি।

সে সময় এই ব্যাপারে (selection) নিয়ে তৎকালীন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করি। তাকে বললাম মাত্র ৪ জন বাঙালি নেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, "আর্মিকা standard তো lower নেহি কিয়া যা সাকতা। বললেন পাকিস্তান আর্মিতে বাঙালিদের প্রতি কোনো বৈষম্য করা হয় না এই কিছুদিন আগেই তার ভাতিজা খাজা ওয়াসিউদ্দিন কর্নেল পদে প্রমোশন পেয়েছেন। মজার কথা এই বাঙালি ভ্রাতুষ্পুত্র পরে লেফ্টানেন্ট জেনারেল পদে উন্নীত হন। ১৯৬৯ সালের Promotion Conferance-এ আমার বিরুদ্ধে তিনি একমাত্র ভেটো দান করেন। যদিও আমার সঙ্গে তার কোনো পরিচয়ই ছিল না, হৃদ্যতা ছিল কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেসব বাঙালি জেনারেল, এয়ার মার্শাল যেমন, চৌধুরী, রুদ্র, মুখার্জী, মজুমদার সুনাম অর্জন করেছিলেন তাদের নাম উল্লেখ করে বললাম যে বাঙালিদের standard এত তাড়াতাড়ি কীভাবে নষ্ট হয়ে গেল। তখন বললেন, ইয়ে তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কা মামলা হ্যায়, হামতো ইস্ট বেঙ্গলকা প্রাইম মিনিস্টার। তো ফের আগর আপকা লিয়ে কোই সুপারিশ কা জরুরাত হ্যায় ম্যায় উনলোককো বোল দেঙ্গে...।

তবে কাকুলে traning period-এ কখনো (৪৭-৭১) বাঙালিদের প্রতি কোনোরকম উৎকট বৈষম্য করা হয়নি। অন্তত তাই আমার বিশ্বাস যদিও একাডেমীতে আমার সাথে মারামারিও হয়েছে। বাঙালি ক্যাডেট কাকুলে Sword of Honourও

পেয়েছে (যেমন কর্নেল কাইয়ুম চৌধুরী)। যারা বাঙালি ক্যাডেটদের প্রতি একাডেমীর instructor-দের বৈষম্যমূলক আচরণের কথা বলে তারা হয় অতিরঞ্জন করে অথবা নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকার প্রয়াসে এই মিথ্যার আশ্রয় নেয়। যারা পরীক্ষায় ফেল করত বা যাদের অন্য কোনো দোষের জন্য বের করে দেওয়া হয়েছিল তাদের মুখেই শোনা যায় যে, হাবিলদার রাইফেলের বাঁট দিয়ে কাঁধে মেরেছে... বাঙালি বলে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়েছে.... আমার এইসব (সৈনিক পেশা) ভাল লাগে না... ইত্যাদি।

অতঃপর একজন নবীন সামরিক অফিসার হিসাবে আমার দুটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করছি—

১৯৪৯ সালের ঘটনা। পূর্ব পাকিস্তানে ১৪ ডিভিশনের (একমাত্র ডিভিশন) নতুন GOC (General Officer Commanding) মেজর জেনারেল আয়ুব খান তেজগাঁ সিপাইদের স্কুলে একটা মিটিং ডাকেন (আয়ুব খান, লোকাল মেজর জেনারেল Boundary Commission থাকার সময় দুষ্কর্মের জন্য মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাকে দুচোখে দেখতে পারতেন না এবং তার চাকরি চলে যাবার অবস্থা হয়। 'আলীগড় গ্রুপ'-এর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের হাতে পায়ে ধরে আয়ুব সে যাত্রা থেকে রক্ষা পান and he came here on a punishment posting as a commander of a nominal division with a local Major General's rank। শুধু আয়ুবই না ১৯৭০ পর্যন্ত বেঙ্গল রেজিমেন্ট অথবা পূর্ব পাকিস্তানে কারো পোস্টিং হলে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হতো যে তাকে punishment হিসেবে এখানে পাঠানো হয়েছে। East Paskistan was the dumping ground of Pakistan Army. যাক, একটা ডিভিশনে সাধারণত ন'টা পদাতিক ব্যাটালিয়ান থাকে। তখন মাত্র ২টা ব্যাটলিয়ন ছিল— 4 Punjab and newly formed 1st East Bengal Regiment। সেই মিটিং-এ সব আর্মি অফিসার, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারি ও কিছু সিভিলিয়ান উপস্থিত ছিলেন। সর্বকনিষ্ঠ লেফটেনেন্ট হিসেবে আমিও সেই close door meeting-এ ছিলাম। উপস্থিত Civil Service Officer-এর মধ্যে ফারুক (ICS) এবং বাঙালি civilian-দের ভেতর মৌলানা আক্রাম খাঁ ছাড়া অন্য কারো নাম মনে নেই এবং এই মিটিং ডাকার উদ্দেশ্য কী ছিল তা এতদিন পর স্মরণ নেই। সম্ভবত political কারণ ছিল।

প্রথমে আইয়ুব খান অনেকটা এই ধরনের বক্তৃতা দিলেন... এই দেশের অবস্থা মোটেও ভাল না। বাঙালি মুসলমান— যাদের পূর্ব পুরুষ হিন্দু, কলকাতার দিকে তাকিয়ে আছে। আর থাকবেই না বা কেন? এদেশেতো কোনো ভদ্রলোক নেই। অনেক আগে পাঠানেরা যখন বাংলা দখল করেছিল তখন তারা অল্প সংখ্যা ছিল। তাদের রক্ত বর্তমানে বাঙালিদের সাথে মিশে গিয়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে— you are bleeding us white, এই ধরনের চলতে থাকলে we will drop you like a hot potato" অনেকটা এই ধরনের বাঙালি বিদ্বেষী nonsense কথাবার্তা। (আয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কিত যে কোনো বক্তৃতায় মোটামুটি এ ধরনের কথাই বলতেন)।

ফারুকী তার বক্তৃতায় বললেন, আমি জেনারেল আয়ুবের কথা confirm করি।

Gentlemen আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে এদেশের মুসলমানেরা পাকিস্তানকে পাকিস্তান উচ্চারণ না করে 'হিন্দুস্থানের' মতো 'পাকিস্থান' উচ্চারণ করে। এদের নজর কলকাতায় দিকে। সময় হলেই এরা...। They are unreliable and are not really in the favour of the establishment of Pakistan"।

আক্রাম খাঁ বক্তৃতার প্রথমেই বললেন, "আমি আমার বড় ভাই জেনারেল আয়ুব খানকে বলতে চাই পাঠানদের কথা সত্যি। আমার পাঠান পূর্ব পুরুষ বোগরা খাঁ, ছোগরা খাঁ ফ্রন্ট্রিয়ার থেকে এদেশে settle করেছিলেন। বাঙালিদের বিরুদ্ধে এ ধরনের কথা বলে আয়ুব খানদের খুশি করার চেষ্টা করলেন and the funny thing is that বোগরা খাঁ কোনো মানুষের নাম হলেও বোগরা খাঁ-ছোগরা খাঁ নাম দুটি উর্দু রূপকথাতেই (বাচ্চাদের ভয় দেখানোর জন্য) একত্রে উচ্চারিত হয় যেমন বাংলা রূপকথার হবুচন্দ্র-গবুচন্দ্র বাস্তবে কারো কারো নাম হয় না। আর পরে জেনেছি আক্রাম খাঁর পূর্ব পুরুষেরা এদেশেরই রবিঠাকুরের পরিবারের পতিত ব্রাহ্মণ ছিলেন।

কয়েক বছর পরের অভিজ্ঞতা। পূর্ব পাকিস্তানের সব GOCই civil administration-এর ওপর প্রত্যেক মাসে মাসে রাওয়ালপিন্ডিতে political রিপোর্ট দিতেন। কেন দিতেন তার কারণ আমার জানা নেই। চীফ সেক্রেটারী GOC-র নিকট তার রিপোর্ট দেবার পর তাতে নিজস্ব বক্তব্য প্রদান করে পাঠিয়ে দিত। জেনারেল ইউসুফের (আয়ুবের পর 14 Division-এর GOC) ADC থাকাকালে এসব secret paper পড়ে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। East Pakistan was always ruled by the army.

আমি মুক্তিযুদ্ধের আগে আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলাম এবং ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পূর্বে I was in touch with Sheikh Mujib in connection with the preparations for an armed rising against what we considered to be an alien and hostile occupation force.

আমার ছেলে তালাল রেজা (১৫ বছর) মুক্তিযোদ্ধা ছিল। বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত কোনো ট্রেনিং ক্যাম্পে তাকে ট্রেনিং-এর জন্য ভর্তি নেওয়া হয়নি। CPB ও মুজাফফর ন্যাপ পরিচালিত ট্রেনিং ক্যাম্পে (আসাম) সে কমেণ্ডো ট্রেনিং গ্রহণ করে। আমার তের বছরের অন্য ছেলেটি (সাদ রেজা) আগরতলাস্থ কোনো এক ক্যাম্পে গিয়ে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে বলা হয়, তোমাকে ট্রেনিং-এর জন্য নেওয়া যাবে না, তোমার বাবাতো আওয়ামী লীগে নেই। ছেলে বলেছিল, আমার বাবাতো আর্মি অফিসার তিনি তো কোনো রাজনৈতিক দলেই থাকতে পারেন না।

আমার বড় মেয়ে ইফফাত রেজা Presidency College-এ ভর্তি হয়ে লেখাপড়া টিকিয়ে রাখার সুযোগ ছেড়ে শরৎ বোসের বাসায় Collation & Propaganda Office-এ মাসে ত্রিশ টাকা নিয়ে কর্নেল এসি ভোরার অফিসে-এ কাজ করত।

আমার ছোট ভাইও একজন মুক্তিযোদ্ধা। একাত্তরের সালের এপ্রিল মাসে তিনি বর্ডার ক্রস করে আগরতলায় আমার কাছে আসেন। কিন্তু আমাকে না পেয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফিরে যান। ভারতে যাবার অপরাধে, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে থাকায়

ও আমার ভাই হওয়াতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাকে বন্দী ও নির্যাতন করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের পাশের বাসায় পূর্ব পাকিস্তানের কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের আমীর বাস করতেন। তারাই ভদ্রতা করে তাকে পাকিস্তানিদের কবল হতে উদ্ধার ও আমাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা ব্যাহত করে। এবং মুক্তিযুদ্ধের পর ওসমানীর স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট (লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় যা বাজারে কিনতে পাওয়া যেত) ও মাখন কুদ্দুসের সাহায্য ও তদবীরের বদৌলতে তিনি সরকারিভাবে একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সুনাম অর্জন করেন ও ভাল চাকুরি পান।

বাঙালি প্রীতিতে ও পাকিস্তানি বর্বরতার বিরুদ্ধে জেহাদ হিসেবেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমরা অল্প কয়েকজন একাত্তরের বহু বছর আগে থেকেই এ ধরনের চিন্তা করতাম। আমরা চেয়েছিলাম পাকিস্তানের শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে এদেশে some sort of socialist economy কায়েম করতে। এদেশ হতে শ্রেণীবৈষম্য দূর করতে। ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান, আমেরিকা ইত্যাদি শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে এদেশকে একটা আদর্শ নিরপেক্ষ তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার চিন্তা আমাদের ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম প্রধান দেশগুলি অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ইত্যাদির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস ছিল।

সম্ভবত সত্তরের ডিসেম্বরের শেষ দিকে অথবা একাত্তরের জানুয়ারিতে প্রথম দিকে আওয়ামী লীগের ২জন এম.পি লে. কমাণ্ডার এমএম ইসলাম এবং লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান আমাকে ধানমণ্ডিতে শেখ সাহেবের বাসায় নিয়ে যান। তখন রাত ৭/৮টা বাজে। তোফায়েল আহমেদ সেখানে ছিলেন। শেখ সাহেব তোফায়েলকে সেখান থেকে সরিয়ে দেন। কিছু বাক্যালাপের পর শেখ মুজিব বললেন, আপনারা ৪৮ ঘণ্টার মতো পাকিস্তান আর্মিকে আটকিয়ে রাখতে পারবেন কি? ততক্ষণে নাকি বর্ডার দিয়ে ইণ্ডিয়ান আর্মি ঢুকে পড়বে। অস্ত্র-শস্ত্র, টাকাপয়সা, বেতার যন্ত্র জাতীয় কম্যুনিকশনের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সবই নাকি ওরা দিবে। শেখ সাহেব তার মাথার উপর হাত ঘুরিয়ে বললেন, আমি ঐ দিকে চলে গিয়ে হাজার হাজার লোকজন সহ নেমে আসব। এমনভাবে বললেন যে আমার মনে হলো তিনি সম্ভবত গাড়ো পাহাড়ের দিকে চলে যাবেন। মূলকথা-বর্ডার দিয়ে ভারতীয় বাহিনী ঢুকে পড়লে নাকি ঢাকা, যশোর, চট্টগ্রাম ইত্যাদি ক্যান্টনমেন্টের পাক সৈন্যরা বর্ডারে ছড়িয়ে পড়বে ফলে ভারতীয় অস্ত্রের সাহায্যে ঢাকা দখল করা বাঙালিদের জন্য সম্ভব হবে।

আমি তাকে বললাম যে পাকিস্তান আর্মি এত বোকা নয় যে তাদের nerve centre, ঢাকা ফেলে সবাই বর্ডারে চলে যাবে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এই যে অস্ত্র-শস্ত্র, অফুরন্ত টাকা পয়সা, বেতার যন্ত্র এগুলো কারা কোথায় দেবে আর কারাইবা কোথায় গ্রহণ করবে? কারা ইনস্ট্রাক্টর, লিয়াজোঁ হিসেবে আছেন আর এগুলো নিয়ে কোথায় রাখা হবে অর্থাৎ আগে থেকে তৈরি করা cache's entry points, safe house-এর ব্যবস্থা আছে কিনা এবং এগুলো কোন প্রশিক্ষিত দল ব্যবহার করবে ইত্যাদি— এগুলো সব ঠিক আছে? Chain of command, leadership structure, কম্যুনিকেশন নেটওয়ার্ক

গঠন করা হয়েছে? শেখ সাহেব বললেন, হ্যাঁ সব সব রেডি আমি নিরাপত্তার খাতিরে আর বেশি প্রশ্ন করলাম না। পরে জেনেছি এগুলো সত্য ছিল না।

যাক, শেখ মুজিব বললেন, আপনি যে বলছেন এগুলো (armed restistance) organize করতে হবে কর্নেল ওসমানীকে সঙ্গে রাখলেই তো ভাল হয়। বললাম, উনিতো এখন সিলেটে তার নির্বাচনী বিজয় উদযাপন করছেন। শেখ মুজিব আমাকে নির্দেশ দিলেন ওসমানীর সঙ্গে একত্রে কাজ করার জন্য।

এর কিছুদিন পর উপরোক্ত দুজন এম.পি বনানীতে (ওসমানী যেখানে থাকতেন) বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ নিয়ে গেলেন যে এসব ব্যাপারে একত্রে কাজ (detailed plan programme) করব। আমি আমার বাড়িতে বসে ওদের (MP) জন্য অপেক্ষা করছি অনেকক্ষণ পর তারা আমার বাড়িতে এলেন। একজন ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, স্যার আপনি ঠিক বলেছিলেন ওসমানী একটা...। কর্নেল ওসমানী নাকি সব শুনে ওদের বলেছেন, আমি এ সবের মধ্যে নেই। ওরা (পাকিস্তান আর্মি) এসব কিছু করলে আল্লাহ্‌র বিচারে শাস্তি পাবে এবং ওসমানী সাহেবের করণীয় কিছু নেই। মোট কথা উনি আমার সঙ্গে কাজ করতে রাজি নন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র কেইসের সওয়াল জবাবের ধাক্কা উনি তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

প্রথম সাক্ষাতের ১৫/২০ দিন পর শেখ সাহেব আবার একদিন আমাকে খবর দিলেন। দিনের বেলায় তার বাসায় গেলাম। উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন যে জয়দেবপুরে নাকি পাকিস্তানিরা সমস্ত বাঙালি সৈন্যাদের ঘিরে মেরে ফেলেছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, জয়দেবপুর ঢাকার এত কাছে, কাউকে পাঠিয়ে খোঁজ খবর নিলেইতো সব জানা যেত। আপনার কাছে কি পাঠিয়ে খোঁজ নেবার মত কোনো লোক নেই? বললেন, না নেই। তাকে বললাম যে, পাকিস্তানিরা একটা ব্যাটালিয়ন আক্রমণ করে তাদের হাত দেখাবে না। যদি military action শুরু করে তবে সারাদেশে একই সময় একই সঙ্গে আরম্ভ করবে। আমার আর্দালীকে পাঠিয়ে দিলাম খোঁজ নেবার জন্য। সে জানাল কোনো রকম অঘটনই দেখেনি। আমি শেখ সাহেবকে আমার বিস্তারিত লিখিত পরিকল্পনা দিলাম। কাগজগুলো নিয়ে তিনি বললেন, তাজউদ্দিন সাহেবকে দিতে পারতেন।" তখন East Pakistan-এ বাঙালি সৈন্যদের হাতে প্লেন ট্যাঙ্ক না থাকলেও fire power-এ আমরা পাকিস্তানিদের চেয়ে ৪/৫ গুণ বেশি ছিলাম। বাঙালি officers and troops armed police, EPR, আনসার, পুরনো PNG (Pakistan National Guard সম্পাদক) ও মুজাহিদ পার্সোনেলদের যদি ঠিকমত motivate করিয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে নামান যেত তাহলে পাকিস্তানিদের পরাজিত করা কোনো কঠিন কাজ ছিল না (আমার plan-এ এসব ব্যাপারই ছিল)। একাত্তর ও পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতার আলোকে এখন বলতে পারি আমার সেই পরিকল্পনা কার্যকর হবার বিন্দুমাত্র সম্ভবনা ছিল না। কারো লড়বার মনোবল, অর্গানাইজেশন, ইচ্ছাও ছিল না। নিজের গা বাঁচাতেই সবাই ব্যস্ত ছিল। আর প্রস্তুতির লেশমাত্রও ছিল না। মৃত্যুঝুঁকি মাথায় নিয়ে আমি ইপিআর, ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ানগুলিকে চিঠি পাঠিয়েছি। সতর্ক থাকতে বলেছি personal arms, battalion weapson কখনো না ছাড়তে। আমি নিজে কয়েকটা

ব্যাটালিয়নের অফিসার এবং জেসিওদের সদা সতর্ক থাকার জন্য বলেছি। এমনকি বাঙালিদের সতর্ক করে দেবার জন্য কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে massenger হিসেবে আমার স্ত্রীকে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলাম কারণ কোনো রাজনৈতিক দল আমাকে একটি massenger- ও দিতে সক্ষম হয়নি। তৎকালীন একজন ছাত্রনেতাকেও সতর্ক করে দিয়েছিলাম এবং মিলিটারী action হলে কীভাবে resist করতে হবে তাও লিখিতভাবে তাদের দিয়েছিলাম। কেউই আমার কথা শোনেনি।

ইপিআর পিলখানায় (Headquarter Wing) দুজন বাঙালি জুনিয়র ক্যাপ্টেনকে বহুবার সতর্ক করে দিয়েছি ও কী করা উচিৎ যে সম্পর্কেও উপদেশ দিয়েছি। হয়ত সুযোগের অভাবেই তারা নিষ্কৃত রইলেন। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। EPR troops, যারা আজ এখানে কাল ওখানে ক্যাম্প করে থাকতো (২৫শে মার্চের আগে) তাদের বলেছি, বেশিরভাগই আমার দুএকটা কথা শুনে এদিক সেদিক তাকিয়ে সরে পড়ত। ভাবখানা যেন, I hear no evil-এরাও কিছু করেনি তবে নিজেরা প্রাণে বেঁচেছে হয়ত।

ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিজে গিয়েছি। সেখানে আমার প্রিয় জুনিয়র অফিসার শাফায়াত জামিল আমাকে আশ্বাস দিল কুমিল্লার কমাণ্ডো গ্রুপকে অনায়াসেই কাবু করা যাবে!

আমি বেশিরভাগ জেসিও level-এ চেষ্টা করেছি সতর্ক হয়ে সিপাইদের সাথে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করার জন্য, তাছাড়া জেসিওরা সৈন্যদের সঙ্গেই থাকে। এদের মনোভাব আগেই উল্লেখ করেছি। সহযোগীদের সাথে তত যোগাযোগ করিনি। প্রমোশন, নেকদৃষ্টি নিরাপত্তাই এদের প্রধান কাম্য ছিল...। পাকিস্তানিরা যত খারাপই হোক যে কোন মূল্যে বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতে জানত ও সামান্য লোভে আপনজনকে betray করত না।

মেজর মালেকের পরামর্শে এক বাঙালি লে. কর্নেলের ঢাকার বাসায় গিয়ে সংগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করায় তিনি সন্ত্রস্তভাবে বলে উঠলেন, "স্যার আমি নতুন কর্নেল (লে. কর্নেল) হইছি, আমার চাকরিটা নষ্ট করার জন্য বুঝি লোকে আমার সম্বন্ধে বলতেছে যে আমি revolt করব। মনে পড়ল এই অফিসারের প্রমোশনের জন্য তার অনুরোধে আমি মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে (Staff College-এ আমার instructor ছিলেন) ধরেছিলাম।

কার্জন হলের দক্ষিণ দিকে যে হলগুলো ছিল তারই কোনো একটাতে (নাম মনে নেই) ছাত্রনেতা আবদুল কুদ্দুস মাখন থাকতেন। তাকে এ সম্বন্ধে একটা চিঠি লিখে আমার ব্যাটম্যানকে দিয়ে পাঠিয়েছিলাম (বোধ করি মার্চ মাসে)। ২৫শে মার্চের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া SDO-র বাড়িতে দেখা হতেই তাকে বললাম, তোমরাতো কোনো ব্যবস্থাই নাওনি। তুমি কি আমার চিঠি পাওনি? বেশ ক্রুদ্ধস্বরে উত্তরে বলল, না, আমি কোনো চিঠি ফিঠি পাইনি। অন্যদের কাছে পরে শুনেছি তুমি বলে সম্বোধন করাতে নাকি অত্যন্ত আপমানিত বোধ করেছেন। অথচ তার বাবা আবদুল আলীর সাথে আমি ছোটবেলায় ফুটবল খেলেছি। যাক, দেশ স্বাধীন হবার প্রায় ছয় মাস পর আমার বাড়িতে সাচ্চু মিয়া, কুদ্দুস মাখন এলেন। আমাকে দেখিয়ে সাচ্চু মিয়াকে ইনি বললেন, চিঠি

লিখে ইনিইতো আমাকে আগে থেকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ইনার জন্যইতো...!! স্বাধীনতার পর মাখন কুদ্দুসের সাহায্যেই আমার ছোট ভাই চাকরি পায়।

যেদিন সাহেবজাদা ইয়াকুব লে. জেনারেল টিক্কা খানকে চার্জ দিয়ে চলে যান, আমি শেখ মুজিবের বাসায় যাই। প্রথমেই তাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাকে অশুভ সংবাদ দেওয়াতে তিনি অভদ্রভাবে বলে উঠলেন, আমার কথা কখনো সত্য হতে পারেনা— আমি কোনো খবরই রাখিনা— সাহেবজাদা ইয়াকুবই ইস্টার্ন কমাণ্ডের অধিনায়ক হিসাবে আছেন। আমি বললাম শেখ মুজিবের বাড়ি হতে তিন চার মাইল দূরের শত্রু শিবিরের প্রধান কার্যাবলীর সঠিক সংবাদ রাখতে যারা অক্ষম তারা যেন দেশকে অস্ত্রের সংগ্রামের হঠকারিতায় না ফেলেন। তাজউদ্দিন সাহেব কথাটা ভুলে যাননি ও পরবর্তীকালে Provisional Govt. এর President সৈয়দ নজরুল ইসলাম যখন কলকাতায় তাদের cabinet meeting-এ আমাকে তার Military Secratary করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দস্তখত করেন, তাজউদ্দিন সাহেব President-কে উপেক্ষা করে আমার এই পদ কার্য্যকরী হতে দেননি। সৈয়দ সাহেবকে বলায় তিনি বললেন, আপনি তাজউদ্দিন সাহেবকে ধরুন। আমি এই হাস্যকর প্রস্তাবে রাজী হতে পারিনি।

পাকিস্তানিরা যখন জাহাজে করে অস্ত্র আনছিল তখন আমি রিয়ার এডমিরাল এম, এইচ, খানের ছোট ভাই খসরুকে (চাটগাঁয়ে ওদের কয়েকটা জাহাজ ছিল) বলেছিলাম যেন দেশের জন্য ওদের কিছু জাহাজ sacrifice করে। দেশ বাঁচলে পরে পুষিয়ে দেয়া যাবে। পোর্টের কাছে জাহাজ ডুবিয়ে দিলে পাকিস্তানিদের অস্ত্র বোঝাই জাহাজ পোর্টে ভিড়তে পারত না (হয়তো অস্ত্র খালাস রোধ করা সম্ভব ছিল না তবে দেরি করিয়ে দেওয়া যেত)। খসরু এটা শেখ মুজিবকে বলে মুজিবের অনুমতি চাইলেন। কর্নেল ওসমানী সেখানে ছিলেন and he violently opposed it (খসরুর মুখে শুনেছি)। এটা খুবই বিশ্বাস্য কারণ কুমিল্লার কসবা অঞ্চলে কোনো এক আওয়ামী লীগারের বাড়িতে আত্মগোপনকারী (গোঁফ কামানো অবস্থায়) কর্নেল ওসমানীকে যখন সিগন্যালের কর্নেল বাহার খোলাখুলিভাবে মুক্তিযুদ্ধে শামিল হওয়ার জন্য বলেন ও প্রসঙ্গক্রমে বলেন, এইতো আমাদের কর্নেল রেজাও নিজ বাড়িঘর ছেড়ে আমাদের সাথে আছেন। ওসমানী সাহেব আকুলস্বরে বলেছিলেন, Bahar, please see that Reza does not take a lead over me.

২৫শে মার্চের বেশ কয়েকদিন আগে রাজারবাগে বাঙালি পুলিশের রাইফেল ইত্যাদি নিয়ে ডিউটি ছেড়ে গোশাঘরে ছিল। তখন Eastern Command, GHQ-র নিকট advise চাইল কীভাবে tackle করা উচিত। GHQ থেকে যে নির্দেশ এসেছিল তাতে এই ধরনের বলা হয়েছিল, smash them to pieces with all available force এটা জেনে আমার বন্ধু একেএম সিদ্দিকীকে (ভাসানী ন্যাপ করতেন, ডিসেম্বরে আল বদরদের হাতে শহীদ হন) বললাম যেন ভাসানীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন (শেখ মুজিবের সাথে আলাপের পর আওয়ামী লীগের উপর আর আস্থা রাখতে পারছিলাম না) ভাসানী সাহেব তখন তার কোন এক ব্যবসায়ী সাগরেদ, জলিলের ওয়ারীস্থ বাসায় অবস্থান করছিলেন। সিদ্দীকী ভাসানীকে আমার কথা বললেন... পুলিশদের যেন অস্ত্রসহ

ছোট ছোট দলে বের হয়ে যাবার জন্য বলা হয় নাহলে পাকিস্তান আর্মি চারদিকে মেশিনগান ইত্যাদি বসিয়ে বের হবার সব পথ বন্ধ করে প্রচণ্ড আক্রমণ করবে, কেউই বাঁচতে পারবে না। ভাসানী সব শুনে সিদ্দীককে (হেনা) বললেন, ওকে এখানে এনোনা, চারদিকে CID-র লোকে ভরা।

পাকিস্তান আর্মি একটা গণহত্যাযজ্ঞ শুরু করবে, এটা ভাবিনি। তবে কিছু military action নিতে পারে তার আশঙ্কা হয়েছিল বাঙালি পুলিশদের ব্যাপারে GHQ থেকে যে নির্দেশ এসেছিল তা শুনে। তাছাড়া সেই সময় আমার পাকিস্তানি (অবাঙালি) উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক দুই একজন বন্ধু-বান্ধবেরা কথা প্রসঙ্গে বলতো—তোমরা যদি মনে করো যে লড়াই করতে পারবে তবে কর, না হলে শুধু শুধু খোঁচাখুচি করোনা, এক পাঠান অফিসারের বক্তব্য ছিল, ফ্রন্টিয়ারে সারাজীবন বন্দুক নিয়ে আমরা চলি তবুও পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে সাহস পাইনি। তোমরা যদি মনে কর যে জিততে পারবে তাহলেই লড়াই কর...। আর সে সময় বেসামরিক পোশাকে সৈন্য এবং যে সব উচ্চপদস্থ বিশেষজ্ঞ অফিসারদের (যেমন commando expert মেজর জেনারেল আবুবকর ওসমান মিঠ্ঠা, ব্রিগেডিয়ার আরবার প্রমুখ) পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছিল যাদের বেশিরভাগই আগে এখানে চাকরি করেছিল এবং পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে পরিচিত ছিল।

Crack down আসন্ন মনে করে ও কোনোরকম জাতীয় অবরোধের লক্ষণ না দেখে আমি ২২ বা ২৩শে মার্চের সন্ধ্যায় মুসিলম লীগের সুপণ্ডিত শাহ আজিজুর রহমান (জিয়ার প্রধানমন্ত্রী, তার সাথে আমার কৃষ্ণনগরেই পরিচয় ছিল) ও DIG কিবরিয়া সাহেবকে ফোন করে অনুরোধ করলাম যেন অন্তত সমস্ত আনসারকে ট্রেনিং-এর নামে রাইফেলসহ প্রত্যেক শহরের আশে পাশে মোতায়েন করা হয় যাতে পাকিস্তানিরা বুঝতে পারে যে surprise আক্রমণ করা যাবে না।

২৫শে মার্চের ২/৩ দিন আগে থেকেই রাতে নিজের বাসায় থাকতাম না। ওয়ারীতে আমার বন্ধু এডভোকেট সিদ্দীকের বাড়িতে থাকতাম। ২৭শে মার্চ কারফিউ কিছুক্ষণের জন্য lift করাতে আমি গাড়ি করে গুলশানে আমার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। এয়ারপোর্টের (তেজগাঁ) দেয়ালের উপর কয়েকজন পাক সৈন্য দাঁড়িয়ে ছিল। তারা হাত নেড়ে আমাকে অভিনন্দন জানায়। হয়তো ভেবেছিল (আমাকে দেখে) যে কোন loyal পাকিস্তানি/অবাঙালি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছে।

গুলশান পার্কের ভিতর একটা ইপিআর ক্যাম্প ছিল। সেখানে খালি হাতে সৈনিকদের এদিক সেদিক ঘোরাফিরা করতে দেখলাম। গাড়ি থেকে নেমে ইপিআরের একজন সুবেদারকে বললাম, আপনারা খালি হাতে কেন ঘোরাঘুরি করছেন? যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে সব weapon নিয়ে নদী পার হয়ে জয়দেবপুরের দিকে চলে যান, আমাদের সৈন্যরা আছে সেখানে পথে তাদের সাথে যোগ দিন। আমি Civil dress-এ ছিলাম। আমাকে চিনতে পারেনি। সে বেশ একটা ডাটের সাথে উত্তর দিল, We have been disarmed. আমি অবাক হয়ে গেলাম এদের কাণ্ডজ্ঞান দেখে। বাঙালি সৈন্যদের সাথে যোগ দেওয়া ওদের পক্ষে খুবই সহজ ছিল কারণ তাদের ওপর কোনো গার্ড ছিল না।

একটু সামনে ডিআইটি মার্কেটে গেলে পরিচিত দোকানদারদের প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম— স্যার আপনি ওদের (EPR) সাথে কোন সাহসে কথা বললেন? ওরা যে আপনাকে পাকিস্তানিদের কাছে ধরিয়ে দেয়নি আপনার ভাগ্য! পুরো ব্যাপারটা প্রতক্ষ্যদর্শী দোকানদারেরা খুলে বলল। ২৬শে মার্চ সকালে ২/৩ গাড়ি পাকিস্তানি সৈন্য এখানে আসে। তাবুর ভিতর অনেকক্ষণ দুপক্ষের কথাবার্তার পর পাকিস্তানিরা চলে যায়। বিকেলের দিকে পাকিস্তানিরা এসে তাবুর এককোনায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে কয়েক রাউণ্ড গুলি ছোড়ে (কাউকে আঘাত করার উদ্দ্যেশ্যে না) সঙ্গে সঙ্গে সব ইপিআর হাত তুলে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে সারেণ্ডার করে। পাকিস্তানিরা সমস্ত অস্ত্রগুলো তাদের গাড়িতে করে নিয়ে যায়। অর্থাৎ সকালে ঠিকঠাক করেই বিকেলে নাটকের অবতারণা করা হয় যাতে পরবর্তীতে কেউ দোষ দিতে না পারে। পরে শুনেছিলাম ২/১ দিন পর এই ইপিআরদের তুলে নিয়ে মীরপুর/টঙ্গীর ওদিকে কোনো এক ব্রীজের কাছে গুলি করে নাকি হত্যা করা হয়।

সেই রাতেই পরিবারসহ লেক পার হয়ে গুলশান ডিআইটি মার্কেটের সরকার স্টোর্স এর মালিকের বাড়িতে উঠি। তার ছেলেকে গাইড হিসেবে নিয়ে সেই রাতে জয়দেবপুরের দিকে রওয়ানা দেই। গুলশান লেক পার হয়ে রাস্তায় পৌছে সরকার সাহেব প্রমুখ কয়েকজন আওয়ামী লীগের লোক খুশি হয় আমাকে বলল তারা নাকি কিছুক্ষণ আগেই ড. কামাল হোসেনকে পথ দেখিয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌছে দিয়েছেন। পরে ২৫শে মার্চের সন্ধ্যায় ড. কামাল হোসেনের গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু কথা শুনেছিলাম। যাক, জয়দেবপুর হতে ভৈরব বাজার এবং সেখানে হতে ট্রেনের ট্রলী যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌছি।

মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর শফিউল্লাহ তখন তেলিয়াপাড়াতে (ভারতীয় বর্ডারের ৫০ গজের মধ্যে) থাকত। যতদূর মনে পড়ে শাফায়াত জামিল স্টেশনে এসে দেখা করে। খালেদ যদিও সেই সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া SDO-র বাসায় বসে ছিলেন, স্টেশনে আসেননি ও তাকে আমি বললাম যে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেই থাকব কারণ সিংহভাগ বাঙালি সৈন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে আছে (এটা এক আশ্চর্যের কথা! প্রায় সব সৈন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে থাকত কিন্তু অফিসারেরা সৈনিকদের সঙ্গে থাকতেন না, তেলিয়াপাড়ায় চলে যেতেন) তিনিও দেখলাম আমার তেলিয়াপাড়া যাওয়াটা পছন্দ করছেন না। কারণটা পরে বুঝলাম যখন তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও ইণ্ডিয়ান আর্মি অফিসারদের সাথে দহরম-মহরম করার ব্যাপারটা আমার নিকট অস্বীকার করেন।

পরে তেলিয়াপাড়ায় এক কনফারেন্সে (৪ঠা এপ্রিল) রিটায়ার্ড কর্নেল ওসমানী, এমএনএ আমার প্রস্তাবিত প্ল্যানকে (সিলেট-চিটাগাং Belt-এর পাকিস্তান আর্মির পকেটগুলো eliminate করা-for continuous free zone & farm base for further operations and the show the world that we are in effective state of forming a government. এটা বোধকরি আমাদের সাধ্যের বাইরে ছিল না) অশ্লিষ্ট ভাষায় নাকচ করে সর্ব মেজর শফিউল্লাহ, খালেদ মোশাররফ, নূরুল ইসলাম প্রমুখকে নেপোলনীয় হুকুম দেন দূর্গবৎ সুরক্ষিত কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করার

জন্য। বলাবাহুল্য আমার অনুজপ্রতীম দূরদর্শী রেজিমেন্টাল কমরেডরা active service-এ তাদের সিনিয়রকে সমর্থন না করে আওয়ামী লীগের এমএনএ প্রাক্তণ কর্নেল ওসমানীর দিকে থাকাই নিরাপদ মনে করেন। বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপস্থিত সমস্ত অফিসারদের কোনো support না পেয়ে আমি বিরক্তির সাথে এই conference ত্যাগ করি, কর্নেল ওসমানী ও তার দলের লোকদের প্ররোচনায় ভারতীয় অফিসাররাও আমাকে সন্দেহের চোখে দেখত। এই কনফারেন্সে তিনি আমার র‍্যাঙ্ক উপেক্ষা করে আমাকে 'Mr.' সম্বোধন করেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ তেলিয়াপাড়ায় এদেরই একজন সিভিল ড্রেসে স্যুইসাইডাল ভঙ্গিতে (আরো অনেকের মতো এই বীর যোদ্ধা পরিবার পাকিস্তানিদের হাতে রেখে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে এসেছেন!) সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমাকে বললেন স্যার, "এই যে পাকিস্তানিরা রেডিওতে বলছে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসার কথা এবং কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না, আপনি কী বলেন? ফিরে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?" তাকে বললাম, "আমি ফিরে যাবার জন্য আসিনি। তোমাকেও উপদেশ দিচ্ছি ফিরে না যেতে। গেলে হয়তো পাকিস্তানিরা তোমার মুণ্ডই রাখবে না। কথাপ্রসঙ্গে আবার বললেন, 'আমরা তো একটা গভর্নমেন্ট ছেড়ে চলে এসেছি। আমি এখন কোনো অথরিটি স্বীকার করিনা, কেউ আমাকে যুদ্ধ করার জন্য হুকুম দিতে পারে না। এই অফিসার মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেই কাটিয়েছিলেন।

বস্তুত বেঙ্গল রেজিমেন্টের আমার এই কমরেডরা সমস্ত বিষয়ই আমার নিকট হতে গোপন রাখত, বোধ হয় কারো পরামর্শে। আশুগঞ্জে আমাদের heavy concentration of troops and weapons সত্ত্বেও কোনো প্রকার resistance না দিয়ে (একটা গুলিও না ছুড়ে) পালিয়ে সরাসরি ইণ্ডিয়ান বর্ডারে পশ্চাদপসরণ কেন করা হল... officers leaing the rout-ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কর্নেল রবের উপস্থিতিতে শফিউল্লাহকে এটা জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে বললেন যে তাদের Indian Army-র মুরুব্বীদের নির্দেশেই এই কাপুরুষোচিত কাজ করা হয়েছে। ইণ্ডিয়ানরা নাকি হুকুম দিয়েছে যে লড়াই-বিগ্রহ ভারতীয় ভূমি হতেই করা হবে। এটা সত্য নয় যে আশুগঞ্জ থেকে বিনাযুদ্ধে প্রস্থান করার সময় কোনো অফিসার আহত হয়েছিলেন। কোনো কোনো বইতে আরও অনেক অসত্য কথার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে যে দুইজন অফিসার আহত হয়েছিলেন। আমি মাত্র তিনজন walking wounded-একজন নায়েব সুবেদার ও দুইজন other ranks-কে অতি সামান্য জখম অবস্থায় দেখি।

কয়েকঘণ্টা পর মাধবপুরে আমাদের লোকদের একত্র করি ও ইণ্ডিয়ান ব্রিগেডিয়ার ভিসি পাণ্ডেকে জিজ্ঞাসা করি এই রকম অসামরিক পলায়ন কি তারই হুকুমে হয়েছে? তিনি বললেন যে অবশ্যই উনি একটা নিয়মিত fighting withdrawl-এর কথাই বলেছিলেন এবং সমস্ত ভারি অস্ত্র— medium & heavy machine gun, antitank recoilless weapons, mortar ইত্যাদি ফেলে উর্দ্ধশ্বাসে পালানোর পরামর্শ দেন নাই। ঠাট্টা করে আরও বললেন, you see Colonel, these are young officers and they want to live. আমি যখন প্রস্তাব করি যে সেই রাতেই আমি নিজে lead

করে আশুগঞ্জ এলাকা counter attack করব (ফেলে আসা ভারতীয় অস্ত্র উদ্ধারের জন্য) শফিউল্লাহ বললেন, স্যার আপনার বয়স হয়েছে। আমরাইতো আছি। আমিই যাব। ব্রিগেডিয়ার পাণ্ডের সঙ্গে কথা বলছিলাম, একটু পরেই শফিউলাহ এসে বললেন যে মাত্র একজন জোয়ান (সিপাহী) এই নৈশ আক্রমণে অগ্রসর হওয়ার জন্য volunteer করেছে।

এই অদ্ভুত কথা শুনে Indian Brigadier-এর সামনে মাথা হেঁট করে রইলাম ও রাগে আমার Ragimental Badge of Rank খুলে ফেললাম। একটু পরেই পাণ্ডে সাহেব তার Indian demolition team নিয়ে সরাইল ও মাধবপুরের কাছে পুল উড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন অথচ এই ব্রীজ উড়ানোর কথাটা আমার নিকট চেপে রেখেছিলেন।

আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসার পর রিটায়ার্ড কর্নেল রব আগরতলা হতে আমাকে বলে পাঠালেন, মুক্তিযুদ্ধ চলছে, টাকা পয়সার দরকার।" আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ব্যাঙ্ক হতে দেড় কোটি টাকার উপর উঠিয়ে তৎকালীন ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিনের উপর ভার দিয়ে টাকাগুলো আগরতলা পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিন পথ থেকে ফিরে এসে বলল, স্যার প্রাণে বেঁচে গেছি। মোটকথা টাকাগুলো পথেই লুট করে নেওয়া হয়েছে। দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কলকাতায় বাংলাদেশ হাই কমিশনার হোসেন আলী সাহেবের কাছে রিপোর্ট দিয়েছিলাম। কিন্তু 'ভাগ' অনেক উপরে পৌছায় বা অন্য কোনো কারণে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি।

আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছেড়ে আসার আগেই মাহবুব, জাহাঙ্গীর (আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রনেতা)-এরা প্রচার করে আমি leftist। ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌছে কিছু ছেলেকে active দেখতে পাই। এরা আমার কাছে অস্ত্রশস্ত্র চায়। আমি SDPO (Sub-Divisional Police Officer) সম্পাদককে বললাম যদি এদের চরিত্র সম্বন্ধে অভিযোগ না থাকে তাহলে যেন ট্রেনিং এর জন্য রাইফেল ইস্যু করা হয়। তখন জানতাম না ছেলেগুলো ন্যাপ সমর্থক ছিল। আর জানলেও আমার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হত না। কে কোন পার্টির তা আমার কাছে বড় ছিল না, কে স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাই বড় ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার টাউন হলে যে মিটিং ডেকেছিলাম—বোধ করি এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে, তাতে মাহবুব আমাকে সরাসরি বলল, এই ছেলেদের যে আপনি অস্ত্র দিয়েছেন সেগুলি আমাদের বুকের উপর তাক করা হবে, কেননা এরা বামপন্থী ও আওয়ামী লীগের নয়। আমি বললাম, তোমরা চাইলে নিশ্চয়ই তোমাদেরকেও অস্ত্র দেওয়া হবে কারণ দেশের জন্য লড়ার অধিকার প্রত্যেকেরই দল নির্বিশেষে আছে। কিন্তু তোমরাতো রিভলবার ছাড়া চাওনা। পরে দিল্লিতে মিসেস গান্ধীর principal secretary শ্রী হাকসারও আমাকে বলেছিলেন, আওয়ামী লীগত চায় ভারতীয় সরকারই যুদ্ধ বিগ্রহ করে তোমার দেশ স্বাধীন করে ওদের হাতে উঠিয়ে দিতে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটা ঘটনা যা সারাজীবন আমার মর্মপীড়ার কারণ হয়ে থাকবে, না উল্লেখ করে পারছি না। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসে খালেদ-শফিউল্লাহ্‌র মুখে শুনলাম যে নিরাপত্তার জন্য ভৈরববাজার-আশুগঞ্জ এসব অঞ্চলের বিহারী (অবাঙালি) ব্যবসায়ীদের

পরিবারসহ রেলওয়ে গোডাউনে এনে আটকে রাখা হয়েছে। তাদের টাকা পয়সাও আটকিয়ে রাখা হয়েছে। পাকিস্তান আর্মি যেদিন আশুগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে (মাত্র ২টা প্লেন দিয়ে) স্ট্র্যাফিং ও রকেটিং করছিল তখন খালেদ-শফিউল্লাহ এবং স্থানীয় নেতারা আমার কাছে পরামর্শ চাইল কী করা যায়? বললাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলের ছোটখাট হাজতীদের ছেড়ে দিয়ে বিহারীদের আপাততঃ সেখানে রেখে পরে সেখান থেকে ইণ্ডিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

যেদিন আমাদের সব লোকজন আশুগঞ্জ-ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে কোনোরকম যুদ্ধ না করেই পালিয়ে যায় এটা সেদিনের ঘটনা। ওরা পালিয়ে যাবার ঘণ্টা দুই পরে জীপে যাবার সময় দেখলাম ২টা ছেলে (সম্ভবত ন্যাপের ছাত্র সংগঠনের সদস্য) টলতে টলতে এগিয়ে আসছে তাদের চোখ রক্তলাল। আমাকে দেখে বলল, আপনার আদেশ মান্য করেছি।" অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি আদেশ? বলল, আপনি যে হুকুম দিয়েছেন বিহারীদের শেষ করে দিবার জন্য...।

লাশ সরিয়ে রক্ত ধুয়ে মুছে ফেলনি? ওরা না সূচক উত্তর দিল। স্পষ্ট বোঝা গেল ছেলে দুটো চরম ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেছিল। এ সব শিক্ষিত ছেলেকে মিথ্যা করে আমার নাম না বললে তারা এ ধরনের পৈশাচিক কাজ কখনও করতনা। ওদের আর কিছু না বলে অন্য দিকে চলে গেলাম।

শহরে আমার বন্ধুবান্ধবেরা বলল যে, আমরা শুনে প্রথমেই বুঝেছিলাম তুমি এধরনের কোনো অর্ডার দিতে পারনা, এটা তোমার অর্ডার না। কিন্তু ওরাতো (নেতা) তোমার নাম ভাঙিয়ে এই ধরনের জঘন্য কাজ করিয়ে নিল। সেদিন শিশু, মহিলা বৃদ্ধসহ প্রায় দেড়শ নিরপরাধ অবাঙালিকে সেখানে হত্যা করা হয়েছিল। যাক যা হবার হয়ে গেছে। পাঞ্জাবীরা এসে এই দৃশ্য দেখল ও তাৎক্ষণিক রাগে বেশ কিছু লোক খুন ও স্টেশনের আশেপাশে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিল।

পরে শুনেছি ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহ খান (পাঠান, যে নিজের চেষ্টায় বাংলা শিখেছিল, ৪/৫টা রবীন্দ্রসংগীতও গাইতে পারত—মেঘের কোলে রোদ হেসেছে... ইত্যাদি) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌলভীদের ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, কে এর জন্য দায়ী? তোমলোগ কিউ রোখা নেহি, তোমলোগ কেয়া কিয়া— জানাজা পাড়াহায়থা?... এরা নাকি চোরের মতো উত্তর দিয়েছিল, জ্বী হুজুর হামলোতা গায়েবী জানাজা পাড়হায়াথা।

দেশ স্বাধীন হবার পরপরই পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র পড়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে অন্যান্য জায়গার অবাঙালি হত্যার কাল্পনিক অভিযোগ থাকলেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এই সত্য ঘটনার উল্লেখ সেখানে ছিল না।

এপ্রিলের শেষ দিকে আগরতলা শহরে থাকাকালীন শফিউল্লাহ এবং আরও কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। শফিউল্লাহ জিজ্ঞাসা করল, স্যার কেমন আছেন? বললাম, দেখতেই পাচ্ছে, তোমরা জীপে করে ঘুরে বেড়াচ্ছ আর আমি পায়ে হেঁটে। আচ্ছা, শফিউল্লাহ বলতো তোমরা আমার রেজিমেন্টাল কমরেড হওয়া সত্ত্বেও আর্মি হতে অনেক আগে রিটায়ার্ড করা কর্নেল ওসমানীর মতো একজন আওয়ামী লীগের এমএনএর সঙ্গে মিলে আমার বিরুদ্ধচারণ কেন করছ? আমিইতো তোমাদের মধ্যে

সিনিয়রমোস্ট আর্মি অফিসার। তোমরা কি জেনারেল— টেনারেল হবে ভাবছ নাকি? শফিউল্লাহ উত্তরে বলল, "তাতো হবোই স্যার। শফিউল্লাহ এই দূরদর্শী উক্তি তখন আমার কাছে বাতুলতা মনে হলেও অদৃষ্টের পরিহাসে দেড় বছরের মধ্যে তা সত্যিই ঘটেছিল।

আগরতলায় জিয়াকে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। অবশ্য সেই বিশৃঙ্খল অবস্থায় কারো উপর কারো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কতগুলো অভিযোগের ফলে জিয়াকে তুরাতে posting-এ পাঠানো হয়।

ওসমানী কলকাতা গিয়ে আমার সম্বন্ধে প্রচার শুরু করলেন— He is a Pakistani spy. His wife is urdu speaking. He is planted as an intelligence agent. Indian Govt. verify করে তা নাকচ করে দেয়। এটা এপ্রিলের ঘটনা। ভারত সরকারের কোনো কোনো সংস্থার কর্মতৎপরতা ও দক্ষতার নমুনা দেখে অবাক হই। এমনকি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ইউনিয়ন পর্যায়ের যে কোনো অতি সাধারণ নেতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদিও তাদের জানা ছিল।

আগরতলা হতে কলকাতা এসে আমি পার্টির (মুজাফফর ন্যাপ ও কমুনিস্ট পার্টি কম্বাইণ্ড) মিলিটারী এডভাইজার হিসেবে পার্টির সামরিক দিক সংগঠিত করি। আগেই বলেছি জুন/জুলাই মাসে সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক ক্যাবিনেট মিটিং-এ আমাকে প্রেসিডেন্টের মিলিটারী সেক্রেটারী পোস্ট-এ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কিন্তু তাজউদ্দিন সাহেব তা ব্লক করে দেন।

ইন্দিরা সরকার সমর্থক CPI-র প্রচেষ্টায় জনাব মনি সিং ও প্রফেসর মুজাফফরকে (সি.পি.বি ও এন.এ.পি নেতা) Joint action committee-তে আওয়ামী লীগের সাথে নেওয়া হয় ও মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে এই যুগ্মপাটি প্রায় কুড়ি হাজার সুশিক্ষিত যোদ্ধা ময়দানে পাঠায় যার মধ্যে আমার পনের বছরের ছেলেও ছিল। বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত ক্যাম্পে আওয়ামী লীগের বাইরের ছেলেদের প্রতি চরম বৈষম্য ও মারাত্মক দুর্ব্যবহারের অভিযোগ শুনেছিলাম তবে সত্যাসত্য যাচাই করতে পারিনি।

সল্ট লেক সিটির শরণার্থী শিবিরগুলোতে গিয়েছিলাম। সেখানকার অমুসলমান শরনার্থীরা নিজেদের শুধু হিন্দু বলেই পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করত ও ভারতীয়দের সহানুভূতি আকর্ষণ করার জন্য মুসলমানদের দ্বারা কাল্পনিক জুলুমের ঘটনা শোনাত। এক ক্যাম্পের মুসলমান মেয়েদের উপর পাইকারী পাশবিক অত্যাচারের দৃষ্টান্তও ছিল। CPML ও CPM এই মুক্তিযুদ্ধকে সত্যিকারের People's War মনে করতনা যদিও কাজী জাফর সাহেব CPM-এর অফিসেই বেশিরভাগ থাকতেন। বেশ সংখ্যক পশ্চিমবঙ্গবাসীর আন্তরিকতা, শুভেচ্ছা ও সাহায্য অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। ৯ই আগস্ট ভারত-রাশিয়ার চুক্তি সম্পাদনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় সরকার আমাদের বিশেষ কোনো সাহায্য করেনি। তারপর আমাদের কিছু কিছু অস্ত্র দিতে লাগল।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস আমার আর্থিক সহায়তা পার্টিই দিয়েছিল তাই কিছু উল্লেখ করলাম না। বাংলাদেশ সরকার এক পয়সাও দেয়নি। প্রফেসর মুজাফফরের মারফত ভারতীয় সরকার আমাকে Indian Army-তে same rank-এ (লে. কর্নেল) চাকরিতে

যোগ করার প্রস্তাব দেয় ও আমার পার্টিও সেটা মেনে নেয় কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। মে, জুন, জুলাই, আগস্টে মূলত কলকাতায় এবং কিছু সময় বর্ডারের দিকে ছিলাম। ডিসেম্বরে ইণ্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হবার পর বাংলাদেশ সরকার যে যেখানে আছে— সব আর্মি পার্সোনেল কে রিপোর্ট করতে বললে আমি কলকাতায় বাংলাদেশ আর্মি হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করি।

ডিসেম্বরের ২০/২১ তারিখে প্রফেসর মুজাফফর আহমেদসহ আগরতলা থেকে কুমিল্লা হয়ে জীপে করে ঢাকায় আসি। দেখলাম ভারতীয়রা কোনো ক্যান্টনমেন্টেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। তাদের যুক্তি ছিল এরা ঢুকলে উত্তেজনার সৃষ্টি হবে, prisioners of war-দের সঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। আমার ধারণা লুটপাটের সুবিধার জন্যই এটা করা হয়েছিল। ওসমানী সাহেব ঢাকায় এসে মিন্টু রোডে তার হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে প্রচণ্ড কড়া ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (বিভিন্ন মহলে যা বিস্ময় ও প্রচুর হাসির খোরাক জুগিয়েছিল!) সহ সেখানেই বসে রইলেন। ক্যান্টনমেন্টে ঢোকার সাহস, ঝুঁকি কেউ নিলনা। জানুয়ারী মাসে আমি প্রথমে গিয়ে স্টেশন হেডকোয়ার্টার স্থাপন করি। ওসমানী সাহেব তারপর তার হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন আমার যতটুকু মনে পড়ে।

১৯৭২ সালে আমার ৮ বছরের জুনিয়র শফিউল্লাহকে Army Chief of staff পদে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং স্বভাবতই আমি পদত্যাগ করি। কারণ army Service আমি কোনোদিনই বেতনভোগী পেশা হিসাবে গণ্য করি নাই, self-respect ও honour বিহীন উর্দিধারী নিজেকে an officer and a gentleman বলতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস। আমি ১৯৫২ সালে ক্যাপ্টেন, ১৯৫৭ সালে মেজর, ১৯৬৫-তে লে. কর্নেল এবং ১৯৭২ সালে কর্নেল পদে উন্নীত হই এবং একই বছর এপ্রিল/মে মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হতে পদত্যাগ করি। বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছি।

(কর্নেল সালাউদ্দিন মোহাম্মদ রেজা ১৮ই মার্চ ২০০৩ সালে ইন্তেকাল করেন।)



কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম

১৯৪০ সালের ১লা মার্চ জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা জনাব আবুল হাসান মোহাম্মদ করিমুল্লা একজন সরকারি চাকুরে ছিলেন (সর্বশেষ পোস্টিং অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী, জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান গভর্নমেন্ট)। তিনি ১৯৬৪-৬৫ সালে চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করেন। আমার মাতা লায়লা জোহরা বেগম একজন গৃহবধূ। আমার ভাই-বোনদের সংখ্যা আট। চার ভাই, চার বোন। ভাইদের মধ্যে আমি দ্বিতীয় এবং ভাই-বোনদের মধ্যে তৃতীয়।

আমি ১৯৫০ হতে ১৯৫৪ পর্যন্ত ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল এবং ১৯৫৪ হতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত হবিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে পড়াশোনা করি। তারপর ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত ঢাকা কলেজে Arts-এ (মাধ্যমিক ১ম ও উচ্চমাধ্যমিক ২য় বিভাগ) এবং ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Philosophy তে অধ্যয়ন করি। কিন্তু তৃতীয় বর্ষ অনার্সের ছাত্র থাকাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন বাদ দিয়ে আমি সামরিক বাহিনীতে যোগ দেই।

আমি ১৯৬১ সালের ২১শে নভেম্বর সামরিক বাহিনীতে যোগদান করি। Pakistan Military Academy (কাকুল)-এ আমি আড়াই বছর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। আমি ১৯৬৪ সালের ১৯শে এপ্রিল East Bengal Regiment-এর ৪র্থ ব্যাটালিয়ানে কমিশন পাই এবং একই সাথে Punjab University থেকে graduation (Bachelor of Arts) ডিগ্রী লাভ করি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক ছিলাম তবে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলাম না। এবং ১৯৬১ সালে ছাত্র ইউনিয়নের Pannel-এ ঢাকা হলে (ঢা: বি:) Asst-Athletic Secretary নির্বাচিত হই।

এক কথায় বাঙালিদের স্বাধীনতার জন্যই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেই। ছাত্রজীবনে রাজনীতি সচেতন ছিলাম। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে বুঝতে পারি তারা কীভাবে আমাদের বঞ্চিত করছে, প্রভূত্ব করছে। নিজেদের মধ্যে যাই থাক বাঙালিদের

শোষণের বেলায় পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বেলুচ, পাঠান, বিহারী সবাই একজোট অর্থাৎ পাকিস্তানি হয়ে যেত। তারা মনে করত আমরা নীচু জাতের মানুষ, নীচু মুসলমান। তারা আমাদের জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে সমালোচনামুখর ছিল। বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানিদের এই আচরণ, মনোভাবের জন্য আমাদেরই কিছু মেরুদণ্ডহীন, নতজানু, অনুগত রাজনীতিবিদ, এলিট এবং বুদ্ধিজীবী দায়ী ছিলেন। এদেরই জন্য ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় বাংলাদেশ তার ন্যায্য বিরাট ভৌগলিক অংশ থেকে বঞ্চিত হয় এবং এদেরই জন্য আমরা পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হই।

১৯৬৭ সালে আমি জয়দেবপুরে ছিলাম। একদিন এক সামরিক এক্সারসাইজ শেষে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ৭/৮ জন অফিসার কাছাকাছি করাটিয়ার পন্নী সাহেবদের বাসায় বেড়াতে গেলাম। আমি ছাড়া বাকি সবাই ছিল পাঞ্জাবি। এতগুলো অফিসার দেখে ওরা খুবই খুশি হলেন। একসময় বৃদ্ধ পন্নী সাহেব গল্প করবার সময় পাঞ্জাবীদের তুষ্ট করার জন্য বললেন যে তারা এখানকার না। ইরান-তুরান থেকে এদেশে এসেছেন কাজেই অফিসার ও এদের উৎস একই। বাসাতে উর্দু কথাবার্তা চলে এমনকি তাদের বিয়ে বাঙালিদের সাথে হয় না। বাঙালিরা দু-এক পুরুষ আগে মুসলমান হয়েছে। বাঙালিদের...ইত্যাদি। বক্তা মনে করল আমিও তাদের একজন। লক্ষ করলাম পাঞ্জাবীরা কথাগুলোয় খুবই আনন্দ পেল।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খা শহরে ছিলাম (পুরো শহরে আমিই একমাত্র বাঙালি)। এ.আর.এস দোহা সম্পাদিত 'Interwing' পত্রিকায় গণঅভ্যুত্থানের সব খবরাখবর পেতাম। শেখ সাহেব, তোফায়েল এদের বক্তৃতা আমাকে অনুপ্রাণিত করে, উজ্জীবিত করে।

একাত্তরের মার্চের পূর্বে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কিন্তু পাকিস্তানি সরকার তাদের দূরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা কার্যকর করার সুবিধার জন্য ব্যাটালিয়নকে মার্চের ১ তারিখে ছড়িয়ে দেয়। আমাদের কোম্পানির নাম ছিল ডেল্টা কোম্পানি এবং ১লা মার্চে ভারতীয় সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমাকে আমার কোম্পানিসহ পাঠানো হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে। এছাড়াও চার্লি কোম্পানিকে পাকিস্তানি মেজর সাদিক নেওয়াজের নেতৃত্বে আমার সাথে পাঠানো হয়। ২৩শে মার্চ নক্সাল অনুপ্রবেশ ঠেকানোর মিথ্যা অজুহাতে মেজর খালেদ মোশাররফকে একটি কোম্পানি দিয়ে শামসেরনগর পাঠিয়ে দেয়া হয়। হেডকোয়াটার থেকে সকল কোম্পানিকে নির্দেশ দেয়া হয় সম্ভাব্য ভারতীয় অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে।

৩রা মার্চের পর দেশের পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে যায়। সে সময় রেডিওতে একটা দেশাত্মবোধক গানের (পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে...) সুর কিছুক্ষণ পর পর বাজানো হত যার আবেদন আমার মতো অনেকেরই রক্তে আগুন ধরিয়ে ছিল দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য। মারাঠা বর্গীদের মত পাকিস্তানি তস্করদের পরাভূত করে জাতিকে শোষণ এবং শাসনের জোয়াল থেকে মুক্ত করার জন্য বহু বাঙলির মত আমিও শাসনের জোয়াল থেকে মুক্ত করার জন্য বহু বাঙালির মতো আমিও অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে স্বাধীনতার পর ঐ গান রেডিও, টিভি হতে সুকৌশলে উঠিয়ে নেয়া

হয়, আর কখনো শুনিনি। আর সে সময়ের সবচেয়ে উদ্দীপনাময় শ্লোগান ছিল— বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর; তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৮ই মার্চ রেডিওতে শুনি। তখন মনে করেছিলাম যে সে ভাষণে তার স্বাধীনতা ঘোষণা করা উচিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে মনে করি ও বুঝি যে তিনি ঠিকই করেছিলেন রাষ্ট্রনায়কের পরিচয় দিয়েছিলেন। একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে। এদিকে সমগ্র বাঙালির সাথে একাত্ম হয়ে আমরাও ঐ দিন অস্ত্রহাতে প্রস্তুত ছিলাম বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে যোগদান করতে। ৭ তারিখ আশাহত হয়েছিলাম।

একাত্তর সালে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেতনা ও মানসিকতা ছিল। তবে পাকিস্তানিরাই যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। তারা আক্রমণ না করলেও হয়তো আমরা যুদ্ধ করতাম যদি শেখ সাহেব প্রচ্ছন্ন নির্দেশ দিতেন। শুধু একটা ঘোষণার দরকার ছিল। সাধারণ সৈন্যরাতো তৈরিই ছিল (অফিসারদের তুলনায়)। লে. কবির, লে. হারুন, আমি ও মেজর খালেদ মোশাররফতো মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। অবশ্য আমি ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কথাই বলছি, অন্যদের কী চিন্তা চেতনা ছিল তা বলতে পারব না। তবে স্বাধীনতা উত্তর কালের কোনো চিন্তা ভাবনা তেমন ছিল না। হয়তো যুদ্ধ আরো বেশিদিন হলে সময়ের সাথে সাথে ঐ ধরনের চিন্তা চেতনাও মাথায় আসতো।

মার্চ মাসের সম্ভবত্ ৭/৮ তারিখের দিকে (বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর) তৎকালীন একজন সিনিয়র বাঙালি অফিসার লে. কর্নেল সালউদ্দিন মোহাম্মদ রেজা কোনো নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে ২/১ দিনের ছুটিতে ঢাকা হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে আমাদের ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। তিনি সে সময় ঢাকায় আর্মি রিক্রুটিং ইউনিটের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। একসময় তিনি ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আর্মস এবং এ্যামুনিশন কী পরিমান আছে। সামনে দিন আসছে এগুলো কাজে লাগবে... ইত্যাদি। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র, সৈনিকদের সতর্কতা মনোবল দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হন। পরে ২৮শে মার্চ তিনি ঢাকা হতে অতিকষ্টে পায়ে হেঁটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসেন। কিন্তু শুধুমাত্র ওসমানীর ব্যক্তিগত আক্রোশের জন্য তাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি।

৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট তখন সিলেটের খাদিম নগরে ছিল। ১১ই মার্চ আমাকে নির্দেশ দেয়া হয় যে রসদ (রেশন) বোঝাই ট্রাক এসকর্ট করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে সিলেটে ঐ ব্যাটালিয়নে পৌঁছে দিতে হবে। কুমিল্লা হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমার কাছে রসদ আসতে সময় লাগে ২ দিন আর ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে সিলেটে এই ১২০ মাইল পথ যেতে আমার সময় লাগে ৩ দিন। আমার সাথে ১ প্লাটুন (৩৫ জন) সৈন্য ছিল। রাস্তায় ৫/৬ মাইল পর পরই বিশাল বড় বড় গাছের ব্যরিকেড সাধারণ মানুষ পাকিস্তানিদের জন্য রসদ নিয়ে যেতে দেবে না। আমি ও আমার সৈন্যরা সংগ্রাম কমিটির সদস্য ও সাধারণ লোকদের বুঝালাম যে রসদ না পৌঁছে দিতে পারলে আমাদের বন্দী করে কোর্ট মার্শাল করা হবে। সময় হলে আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকব। দেখলাম যে আমার সৈন্যরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের সহজেই বুঝাতে সক্ষম হল।

মার্চের ১৬ তারিখে আমরা সিলেট পৌঁছে দেখি ৩১ পাঞ্জাবের অধিনায়ক তার সৈন্যদের নিয়ে ব্রিফিং (দরবার) করছেন। সেখানে আমাদের যেতে দেওয়া হল না। আমাদের সব অস্ত্র তাদের অস্ত্রাগারে জমা দিয়ে সৈন্যদের লাইনে ও আমাদের অফিসার্স মেসে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়।

আমাদের জোয়ানরা পাকিস্তানিদের মতলব মার্চের প্রথম হতেই বুঝতে পারছিল। সিনিয়র এনসিওরা আমাকে বলল যে, স্যার আপনি বলেন যে আমরা অপারেশনাল এরিয়া থেকে আসছি। আমাদের অস্ত্র আমরা নিজেরাই ছোটখাট অস্ত্রাগার বানিয়ে রাখব। আমি পাকিস্তানিদের এ সিদ্ধান্ত জানালে তারা বেশি উচ্চবাক্য করল না।

আমাকে বলা হয়েছিল যে তোমার জন্য একটা অর্ডার আসছে। আনঅফিসিয়ালি আমাকে বলা হয় যে সিলেটের বিভিন্ন চা বাগানে কর্মরত অবাঙালি অফিসারদের পরিবার এসকর্ট করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে হবে। তবে তাদের এক জায়গায় জড়ো করতে সময় লাগছে এবং সে পর্যন্ত আমাদের ৩১ পাঞ্জাবের সঙ্গে থাকতে বলা হল।

পরদিন (১৭ই মার্চ) আমার প্রতি অর্ডার জানতে চাইলাম। কিন্তু কেউই কিছু বলল না। কুমিল্লায় আমাদের ব্যাটালিয়নের অধিনায়কের সঙ্গেও আমাকে টেলিফোনে কথা বলতে দেয়া হল না। শেষে কুমিল্লায় আমাদের বাঙালি সুবেদার মেজরের (সুবেদার মেজর ইদ্রিস) সাথে টেলিফোনে বাংলায় কথা হলো (অন্যান্য বাঙালি অফিসারদের সঙ্গে কথা বলিনি) তাকে বললাম, সুবেদার মেজর সাহেব কিছু বুঝতেছেন? এরা আমাকে কোনো অর্ডারও দিচ্ছে না, যেতেও দিচ্ছে না। সুবেদার মেজর উত্তর দিলেন, স্যার সবই বুঝতেছি। আপনি কিছু বলবেন না, আমি সিও সাহেবকে বলব যেন আপনাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিয়ে আসেন। অধিনায়কের উপর একজন সুবেদার মেজরের প্রচুর প্রভাব থাকে। সিও বিভিন্ন প্রশাসনিক আদেশ কার্যকর করার জন্য তার পরামর্শের প্রতি যথেষ্ট নির্ভরশীল তাছাড়া আমাদের সিও কিছুটা দুর্বল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ফলে সিও কুমিল্লা ব্রিগেড কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরে আসার নির্দেশ দেন। ১৯শে মার্চ আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফিরে আসি।

২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় ৪র্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বাকি একটি কোম্পানি ও ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার কুমিল্লা হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে আসে তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে একটি ব্যতীত সবগুলো কোম্পানি একত্রিত করে, শুধুমাত্র মেজর খালেদ মোশাররফের কোম্পানি তখনও শমসেরনগর ছিল।

আমরা ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় সব বাঙালি অফিসার ও সৈন্য তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলাম। মেজর খালেদ মোশাররফ ২৩শে মার্চ রাতে শমসেরনগর যাবার পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেস্ট হাউজে রাতের খাবারের সময় আমাকে বলেন যে, পাকিস্তানিরা পার্লামেন্ট বসতে দেবে না। ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। একটা গণহত্যা চালানোর প্রস্তুতি চলছে। অস্ত্রের মাধ্যমে বাঙালির রাজনৈতিক বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা চলছে। আমাদের সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। বেসামরিক পোশাকে পিআইএ-র বিমানে করে বেশ কিছু পাকিস্তানি ব্যাটালিয়ন ঢাকায় এনেছে এবং অস্ত্রশস্ত্রও এসেছে জাহাজে করে। ক্র্যাকডউন হবেই এবং তা হলে বাঙালি সৈন্যদের তাৎক্ষণিক সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেবে। তাই তারা আগেই

বাঙালি সৈন্যদের অস্ত্রহীন করে ফেলার চক্রান্ত করছে। কী হবে এবং আমাদের কী করণীয় এ সম্বন্ধে তার এই চেতনাটা বাঙালাদেশে চাকুরিরত মোটামুটি সব অফিসারদের মধ্যেই অনুপস্থিত ছিল। যার ফলশ্রুতিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্বে (২৫শে মার্চ থেকে ১৫ই জুন পর্যন্ত) মাত্র ২৫ থেকে ৩০ জন বাঙালি অফিসার (পাক সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত) মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন যদিও তখন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ১৫০-২০০ জন বাঙালি অফিসার কর্মরত (চাকুরিরত, বিভিন্ন কারণে অস্থায়ী ডিউটি, ছুটি ভোগরত ও অন্যান্য) ছিলেন। এ ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কিছু কিছু বাঙালি অফিসার বিভিন্ন কাজে ঢাকায় এসে আবার পাকিস্তানে ফিরে যান। এই দিক দিয়ে অফিসারদের তুলনায় সাধারণ সৈন্যদের মধ্যেই চেতনা বেশি ছিল। এই চেতনা ও দূরদৃষ্টির অভাবেই বহু বাঙালি অসহায়ভাবে বন্দী ও পরবর্তীতে নিহত হন।

মেজর খালেদ মোশাররফ ২৩শে মার্চ রাতে শমসের নগর যাওয়ার পথে আমাকে একটা নির্দিষ্ট Wireless frequency দিয়ে বলেন কোনো কিছু হলে ঐ Frequcncy তে Wireless set এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে। তারপর ২৫ তারিখে ক্র্যাকডাউন হলো। ২৬শে মার্চ Wireless set দিয়ে random scanning করার সময় আমরা পাকিস্তানি আর্মির একটা স্টেশনের সঙ্গে আরেকটা স্টেশনের উর্দু কথপোকথন শুনতে পাই। সেখানে বলা হচ্ছিল :

১. আরো tank ammunition দরকার।
২. হেলিকপ্টরে air lift দরকার। এবং
৩. Heavy casually হয়েছে ইত্যাদি।

এছাড়াও সেই দিন বিকেলে রেল লাইন দিয়ে পায়ে হেঁটে এবং লঞ্চে হাজার হাজার লোক ঢাকা থেকে পালিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে আসে। তখন বুঝতে পারলাম যে ঢাকাতে কোনো সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে।

সেদিন (২৬শে মার্চ) বিকাল ৪টা দিকে মেজর খালেদ মোশাররফের সাথে যোগাযোগ হলে তাকে সব খবরগুলি দেই। তিনি শুধু একটা কথাই বললেন, আমি রাতের অপেক্ষায় আছি।

আমি বুঝতে পারলাম তিনি বিদ্রোহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলেশহীন ভাবে নিয়ে ফেলেছেন। শমসেরনগরে যাবার পর তার Withdrawl route পাকিস্তানিরা ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিল। তাই তিনি চা বাগানের ভিতর দিয়ে বিকল্প রাস্তায় পরদিন ২৭ তারিখে বেলা প্রায় ২টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেন। পথে তার এত সময় লাগার কারণ ছিল দুটি। প্রথমত রাস্তাগুলো ছিল ভীষণ আঁকাবাঁকা এবং সেগুলি বড় বড় গাছ ফেলে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, (ব্রাহ্মণবাড়িয়া— শমসেরনগর) এই ১২০ মাইল রাস্তা মেজর খালেদ মোশাররফকে অত্যন্ত সন্তর্পনে আসতে হয় শত্রু বিমান থেকে দেখতে না পায় সে ভয়ে।

২৬ তারিখ রাত ৯টার দিকে অত্যন্ত সাহসী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ৩ জন এনসিও আমার কাছে আসে। (হাবিলদার বেলায়ত, হাবিলদার শহিদ ও হাবিলদার মনির) ঐ ৩ জন আমার কাছে এসে বলল যে তারা আজ রাতে আমার তাঁবু পাহারা দেবে। দেশ ও

জাতির প্রয়োজনে আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা তাদের কাছে ঐ মুহূর্তের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব বলে তারা মনে করে। আমি তাদের বারণ করতে পারলাম না। এখানে উল্লেখ্য যে, হাবিলদাররা কখনও পাহারা দেয়না, এটা সিপাহীদের কাজ। আমি তাদের এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তারা বলে যে, "পাঞ্জাবীদের মতিগতি ভালো না! আজ রাতে আবার যদি তারা এখানে ঘেরাঘুরি করে তবে আমরা তাদের মেরে ফেলবো।" লেফটেনেন্ট কবিরও অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং পরামর্শ আমাকে সেই সংকটময় মুহূর্ত গুলোতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে প্রচণ্ডভাবে সাহায্য করে। এই দুটি অত্যন্ত জুনিয়র অফিসারের ভূমিকা এবং কর্তব্যবোধ এবং জাতির প্রতি দায়িত্ববোধ আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। সর্বোপরি আমার সহধর্মিনী রাশিদা (আমার পরিবার ৭ তারিখে কুমিল্লা থেকে ঢাকায় চলে গিয়েছিল কারণ ক্যান্টনমেন্টে কোনও একটা ভয়ানক কিছু ঘটার আশংকায়) ২৪ তারিখ ঢাকা থেকে বহুকষ্টে টেলিফোনে যোগাযোগ করে আমাকে সর্তক করে বলেছিলেন প্রস্তুত থাকতে এবং প্রয়োজনে পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ করতে। একজন গৃহবধূর এই চেতনা এবং দায়িত্ববোধের প্রতিফলন তাৎক্ষনিকভাবে আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। আমার সিদ্ধান্ত আমি অত্যন্ত সঠিকভাবে নিয়ে ফেলি, শুধু সময়ের অপেক্ষায় রইলাম।

রাতে (২৬শে মার্চ) আমি আমার সৈনিকদের বাসস্থান এলাকায় যাই। পাকিস্তান আর্মীতে অফিসার ও সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে অনেক ব্যবধান ছিল তাই সৈন্যরা কেউ অফিসারদের সাথে সহজে কোনো মনের কথা বলত না। যাই হোক সৈন্যরা তখন সেখানে তাস খেলছিল। আমাকে দেখে তারা উঠে দাঁড়াল এবং কয়েকজন আমার কাছে এসে বলল, স্যার, বাংলাদেশে যে কী হইতাছে তাতো জানেন। আমরাও সব বুঝি, জানি এবং খেয়াল রাখি। সময় মতো সিদ্ধান্ত দিয়া দিয়েন, না দিলে আমগোরে পাইবেন না। যার যার অস্ত্র নিয়া যামুগা। জাতির দুভার্গ্য যে অফিসারদের সকলে এদের মতো এত চেতনা, সতর্কতা এবং দায়িত্ববোধ সম্পন্ন ছিলেন না বা সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। পারলে হয়তো মাত্র ২০০/২৫০ জন সৈন্য দিয়ে পাকিস্তানিদের পক্ষে চট্টগ্রামে আমাদের ২৫০০ সৈন্যকে কাবু করা সম্ভব হত না এবং এত ক্ষতিগ্রস্তও হতে হত না। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে প্রায় সমস্ত জায়গায় পাক সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যদের প্রয়োজনীয় চেতনা, সতর্কতার এবং পরিকল্পনার অভাবে প্রথমে আক্রান্ত হয়ে অনেক ক্ষয়ক্ষতির মাঝে বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। এতে আমাদের অপরিসীম ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল, আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের অনেক ভাল ভাল অফিসার এবং সৈনিকদের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরেই আমরা হারিয়ে ছিলাম।

২৭শে মার্চ সকাল বেলা খবর পেলাম যে, সিও সব অফিসারদের নিয়ে সকাল ৮টায় কনফারেন্স করবেন। আমার বুঝতে অসুবিধা হল না যে কী হতে যাচ্ছে কারণ শেষ রাতেই কোম্পানীগঞ্জ টেলিফোন অপারেটরের (এক অজ্ঞাত দেশপ্রেমিক) কাছ থেকে খবর পেয়ে গেছি যে কুমিল্লা হতে ১৪ ট্রাক সৈন্য আসছে। তখন আমি, লে. হারুন, লে. কবীর ও সেই তিনজন (এনসিও) গিয়ে মালিক খিজির হায়াৎ খান ও সাদেক নেওয়াজকে বন্দী করলাম ও বিদ্রোহের ঘোষণা দিলাম, পাকিস্তানিদের বললাম, 'You

have declared war against the unarmed people of our country, You have perpetrated genocide on our people. Under the circumstances we owe our allegience to the people of Bangladesh and the elected people's representative, You all are under arrest, you personal safety is my responsibility but do not try to influence others.' সিও লে. কর্নেল খিজির হায়াৎ ও মেজর সাদেক নেওয়াজ চুপচাপ চেয়ারে বসে পড়লেন। আমরা যখন সিও-র তাঁবুর এর দিকে যাচ্ছিলাম সব সৈনিকরা চুপচাপ বসে বসে তাদের ammunition load করছিল এবং আমাদের কর্মকাণ্ড এর উপর লক্ষ রাখছিল। আমার সৈনিকদের সেই ঘটনার পরই প্রথম জয় বাংলা শ্লোগান দিল যা তারা এতদিন বেসামরিক ব্যক্তিদের মুখেই শুনে আসছিল। ৬০০ সৈনিকের সম্মিলিত কণ্ঠের এই শ্লোগান শুনে কয়েকজন পাকিস্তানি ও বিহারী পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু কয়েক মাইলের মধ্যেই তারা জনতার হাতে ধরা পরে ও নিহত হয়।

এর কয়েক মিনিট পর সেখানে প্রায় ১০/১৫ হাজার লোক চলে আসে। তারা বন্দি ৩ জন পাকিস্তানি অফিসার ও ৩/৪ জন সিগন্যালম্যানকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। একজন একটা বন্দুক দিয়ে আকাশে গুলি করতে করতে আমার দিকে আসতে থাকে। উদ্দেশ্য, পাকিস্তানিদের হত্যা করা। সম্ভবত তিনি ছিলেন একজন ইঞ্জিনীয়ার, আমি তাকে স্টেন গানের এর বার্ট দিয়ে প্রতিহত করি এবং তাদেরকে বলি যে এরা যুদ্ধবন্দি, সুতরাং এদেরকে হত্যা করা যাবে না। Geneva Convention মোতাবেক এদের প্রতি আচরণ করতে আমরা সকলে বাধ্য।

দুপুরের দিকে আমি SDPO-কে (Sub-Divisional Police Officer) ডাকলাম এবং তার হাতে এদের তুলে দিয়ে বললাম এদের যেন কেউ মারতে না পারে। এদের যদি কিছু হয় তবে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু তিনদিন পর তিনি আবার আমার কাছে এদের (পাকিস্তানি) নিয়ে এসে কান্না ভেজা গলায় বললেন, যে, স্যার আমাকে মারবেন না। আমি এই তিনদিন এদের তিন চারটা থানায় নিয়ে গেছি protective custody-র জন্য, কিন্তু সেখানে যাই প্রায় ২০/২৫ হাজার লোক এদের মারার জন্য জমে যায়। এর ৩/৪ দিন পর আমরা তাদেরকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পণ করি।

বিদ্রোহের পরপর তাৎক্ষণিকভাবে সাধারণ সেপাইদের মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ করা যায়নি তবে কিছু সিনিয়র জেসিও অসুস্থ হয়ে পড়ে আবার কারো কারো তীব্র জ্বর দেখা দেয়। দুই একজন অফিসারেরও এ রকম অবস্থা হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে তারা স্বাভাবিক হয়ে উঠেন এবং সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

বিদ্রোহের বিশৃঙ্খল অবস্থা কাটিয়ে বেলা প্রায় ১ টার দিকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ততক্ষণে পাকিস্তানিরা সব জেনে গেছে ফলে যে কোনো মুহূর্তে বিমান হামলার সম্ভাবনা ছিল। তাই আমি আমার সৈন্যদের আশে পাশের গ্রামগুলোর বাঁশঝাড়ের আড়ালে চলে যেতে বলি। এমন সময় খালেদ মোশাররফ তার অধীনস্থ একশত troops সহ সেখানে উপস্থিত হন এবং আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন এবং ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দায়িত্বভার আমার কাছে থেকে গ্রহণ করেন।

এখানে একটা ভুল ধারণার (যা কেউ ইচ্ছায় অথবা ভুল করে সত্য বলে চালানোর চেষ্টা করছেন) নিরসন হওয়া প্রয়োজন। ২৭শে মার্চ চট্টগ্রাম রেডিওর প্রচার শুনেই ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে (হঠাৎ করে, কোনো প্রস্তুতি ছাড়া আপনা আপনি)। ২৭শে মার্চ চট্টগ্রাম রেডিওর প্রচার আমরা শুনিইনি এবং রেডিও শুনবার মতো অবস্থাও তখন ছিল না, নিজেদের সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। কখন তা প্রথম প্রচারিত হয় তাও জানতাম না। বস্তুত ২৭শে মার্চ সকালে আমরা অস্ত্র হাতে তুলে নেই এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা দেই। চট্টগ্রামের সশস্ত্র প্রতিরোধের খবর ২৮/২৯শে মার্চ টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমে শুনি। মেজর জিয়ার বিদ্রোহের ঘোষণা আগে শুনলে হয়তো আরো বেশি অনুপ্রাণিত হতাম।

মুক্তিযুদ্ধকালের পুরো নয় মাস নিয়মিত বাহিনীতে ৪র্থ বেঙ্গল এবং ৩য় ইস্ট বেঙ্গলে ছিলাম। এপ্রিলের ১৭/১৮ তারিখ পর্যন্ত আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছিলাম এবং তারপর বর্ডার এলাকায় চলে গিয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। মে মাসের ১৫ তারিখে আমাকে ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার ও ব্যাটালিয়ানটি পুনর্গঠন করার দায়িত্ব দেয়া হয়। ৩য় ইস্ট বেঙ্গল জুলাই মাসের শেষার্ধে ‘Z Force’ এর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আমি ৩য় বেঙ্গলের কমান্ডার হিসাবে রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট জেলার বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

২৭শে মার্চ-১০ই মে তেলিয়াপাড়া চা বাগানে ২য় ও ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের হেডকোয়াটার স্থাপন করা হয়। সম্ভবত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কর্নেল ওসমানী তেলিয়াপাড়ায় এক সামরিক সম্মেলনে আসেন (আসলে ঠিক সম্মেলন না, অনেকটা সমাবেশের মত)। আমাদের অনেক অফিসারই সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের প্রথমেই কর্নেল ওসমানীর নিকট হতে পাকিস্তানি কমেণ্ডো কর্তৃক তার বাড়ি আক্রমণ, কুকুর হত্যা এবং ঢাকা হতে ভারত আগমন ইত্যাদি বিষয় সবিস্তারে শুনতে থাকি। এক সময় পাক বিমান হামলার আশঙ্কায় তিনি দ্রুত সম্মেলন ত্যাগ করেন।

আমরা এপ্রিল মাসের ১৭/১৮ তারিখ পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছিলাম। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের সাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিঙ্গারবিল, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি এলাকায় পর পর বেশ কিছু প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। এখানে আমাদের জনবল ও রসদপত্রাদির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। ২৪/২৫ তারিখে পাকিস্তানিরা আখাউড়া, সিঙ্গারবিল, গঙ্গাসাগর দখল করে নিলে আমরা রনকৌশলগত পশ্চাদপসরণ করে সীমান্ত এলাকায় চলে গিয়ে উত্তরে তেলিয়াপাড়া থেকে দক্ষিণে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত প্রায় ৮/৯টি অপারেশনাল ক্যাম্প স্থাপন করি।

এই প্রতিরোধ যুদ্ধগুলোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল গঙ্গাসাগর-আখাউড়া যুদ্ধ। এই যুদ্ধেই সিপাই মোস্তফা কামাল শহীদ হন এবং বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত হন। তাকে বীরশ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করার জন্য অধিনায়ক হিসেবে আমিই সুপারিশ করি।

মে মাসের তিন বা চার তারিখে যখন আমি মতিনগর (ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্ভক্ত) ছিলাম তখন একজন ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক আমার সাথে দেখা করতে আসেন। পরে জানতে পারি যে তিনি ফ্লাইট

লেফটেনেন্ট নুরুল কাদের। আমাদের বিভিন্ন খোঁজখবর নিয়ে তিনি আমাকে জানালেন যে তিনি ওপারে (পূর্ব পাকিস্তান) ফেরত গিয়ে আরো কয়েকজনকে বিমান বাহিনীর বাঙালি অফিসার তার সাথে করে নিয়ে আসবেন। তিনি বললেন, "Trust me, you will get eight to ten Air Force officers." যদিও এরকম অনেকেই আসতেন কিন্তু যুদ্ধে যোগদান না করে আবার ফেরত চলে যেতেন। তাই তাকে ফেরত যাবার অনুমতি দেইনি। কিন্তু মেজর খালেদ মোশাররফ আমাকে বললেন, দাওনা পাঠিয়ে। তার এই কথায় আমি ফ্লাইট লেফটেনেন্ট কাদেরকে ফেরত যেতে দিলাম এবং এর প্রায় দু'দিন পর বিমান বাহিনীর অফিসারদের একটি বড় দল নিয়ে এলেন ফ্লাইট লে. নূরুল কাদের। ফ্লাইট লেফটেনেন্ট কাদেরই প্রথম বিমান বাহিনীর অফিসার যিনি মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সাথে যোগদান করেন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকার, উইং কমান্ডার বাশার, ফ্লাইট লে. সদরুদ্দিন এবং ফ্লাইট লে. সুলতান মাহমুদ এই গ্রুপেই আসেন। খন্দকার সাহেবই কাদেরকে পাঠিয়েছিলেন খোঁজখবর নেওয়ার জন্য তাদের চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানসে।

১০ই মে-১৫ই জুলাই : উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ১০ই মে আমি আগরতলা হতে কলকাতা যাই ও কর্নেল ওসমানীর কাছে রিপোর্ট করি। আমি কলকাতা হতে জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে জীপ চালিয়ে হিলি যাই। পথে আমরা বহু ক্যাম্প পরিদর্শন করি। ২/৩ দিনের এই পরিদর্শন কর্মসূচির যাত্রাপথে জীপে যাবার সম্পূর্ণ সময়টাতে জেনারেল ওসমানী আমার কাছে আমাদের ব্যাটালিয়নে কয়টা পিস্তল ও কয়টা স্টেনগান আছে সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। তাছাড়া M.B.M.L (Manual of Bangladesh Military Law) কীভাবে নতুন করে সাজানো হবে সে সম্পর্কেও আমাকে বলেন। যুদ্ধ পরিচালনা এবং পরিকল্পনার কোনো সূত্রও ঐ কয়দিনের আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারেনি। ওসমানী সাহেবের আচার-আচরণে আমি অত্যন্ত নিরাশ হয়েছিলাম। তাকে মনে হয়েছিল একজন বাতিকগ্রস্ত, ভীত সন্ত্রস্ত (পাকিস্তানি কমাণ্ডোদের ভয়), মৃত্যুভয়ে ভীত একজন পলায়নকারী সৈনিক। প্রতিমুহূর্তেই তিনি ছিলেন উত্তেজিত এবং ভয়ানক রকমের আক্রমনাত্মক একজন সৈনিকের আসল রূপ প্রকাশ পায় চূড়ান্ত সঙ্কটময় মুহূর্তে। কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত এই ভদ্রলোক এই তিনদিনেই অসংখ্যবার পদত্যাগ করেছিলেন জনসমক্ষে (আমরা প্রায় শতাধিক কাম্প পরিদর্শন করি ও কর্নেল ওসমানী প্রায় ত্রিশটি ক্যাম্পে বক্তৃতা করেন। প্রতিটি কাম্পেই খাওয়া-দাওয়া, নেতৃত্বের কোন্দল, ট্রেনিং ইত্যাদি হাজারো সমস্যা ছিল। ক্ষুদ্র থেকে জটিল যে কোনো সমস্যা তার সামনে তুলে ধরলেই উচ্চারিত হতো— I resign. ফলে এরপর ভয়ে আর কেউ কোনো কথা বলার সাহস পেতনা। এই তিনদিনের কমপক্ষে হলেও ৩০ বার তাকে resign করতে শুনেছি।

১৫ই মে আমরা হিলি পৌঁছি। এসময় কর্নেল ওসমানীর কাছে প্রথম জানতে পারি যে আমাকে ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তখন ৩য় বেঙ্গল মাত্র ১২১ জন সৈন্য ছিল। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয় যেন উত্তরবঙ্গ ঘুরে ইপিআর, পুলিশ, ছাত্র বেছে নিয়ে এই ব্যাটালিয়ানটিকে পুনর্গঠিত করি। আমি সমস্ত উত্তরবঙ্গ ঘুরে মোট এক হাজার লোক সংগ্রহ করে এই জনবল কমে যাওয়া ব্যাটালিয়ানকে একটা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের উপযোগী ইউনিট (১১০০ জন) সংগঠিত করি।

দিনাজপুর-হিলি সীমান্ত এলাকায় পাক প্রতিরক্ষা অবস্থানের উপর পেট্রোলিং, রেইড ও এ্যাম্বুশের মাধ্যমে ৩য় ইস্ট বেঙ্গলের ট্রেনিং শুরু হয়।

১৫ জুলাই-১০ই অক্টোবর আমরা ভারতের তুরা পাহাড়ে হেডকোয়াটার জেড ফোর্সের অধীনে সমবেত হই। জেড ফোর্সের এর কমাণ্ডার ছিলেন লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান। এসময়ে ৩য় ইস্ট বেঙ্গলের উল্লেখযোগ্য অপারেশনগুলো—

৩১শে জুলাই-২রা আগস্ট : প্রায় ৪০০ সৈন্যসহ বাংলাদেশের অনেক অভ্যন্তরে ঢুকে আমরা বাহাদুরাবাদ ফেরীঘাট ও দেওয়ানগঞ্জ শত্রু অবস্থান রেইড করি। তিনদিনের এই অভিযানের আমাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল অতি সামান্য।

৫ই আগস্ট-১০ই অক্টোবর : রৌমারী থানা এবং দেওয়ানগঞ্জ থানার কিছু অংশ মুক্ত করি। এখানে শত্রুর সঙ্গে বেশ কিছু পাল্টাপাল্টি যুদ্ধে আমাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এটাই বাংলাদেশের একমাত্র অঞ্চল যেখানে পাকিস্তানিরা আর কখনো ঢুকতে পারেনি। ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এটা মুক্তাঞ্চল ছিল এবং বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপিত হয়।

২রা অক্টোবর-৫ই অক্টোবর প্রায় ৪০০ লোকসহ ময়মনসিংহের বকসীগঞ্জ পাকিস্তানি অবস্থান রেইড করি।

৮ই অক্টোবর—প্রায় ২০০ সৈন্যসহ রংপুরের চিলমারী ঘাট রেইড করি।

১৩ই অক্টোবর-১৮ই অক্টোবর প্রায় ৮০০ সৈন্যসহ সিলেটের ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ও দোয়ারা বাজার দখল করি। এখানে মেজর মীর শওকত আলী এবং অধীনস্ত ৫ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের সহায়তা করে।

২২শে অক্টোবর-২৭শে নভেম্বর প্রায় ৪০০ যোদ্ধাসহ আমরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সিলেটের সালুটিকর বিমান বন্দর এবং গোয়াইনঘাটের আশে পাশে অবস্থান গ্রহণ করি এবং অনবরত রেইড ও এম্বুশ পরিচালনা করি।

২৮শে নভেম্বর : আমরা সিলেটের ছোটখেল (গোয়াইন ঘাটের উত্তরে) আক্রমণ চালাই ও দখল করি। এই যুদ্ধে আমি গুলিবিদ্ধ হই ও আমাকে শিলং মিলিটারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অপারেশন।

২৮শে নভেম্বর-১৩ই ডিসেম্বর শিলং মিলিটারি হাসপাতালে অস্ত্রপ্রচার উত্তর চিকিৎসায় ছিলাম।

১৩ই ডিসেম্বর-১৬ই ডিসেম্বর ১৩ই ডিসেম্বর হাসপাতাল থেকে থেকে বেরিয়ে আমার অগ্রগামী ব্যাটালিয়নকে খুঁজতে থাকি। অবশ্য তখনও আমার ক্ষত পুরোপুরি ঠিক হয়নি। ১৫ তারিখে সিলেটের লামাকাজী ফেরীঘাটের কাছে আমার ব্যাটালিয়নকে পাই এবং আবার ৩য় ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ড গ্রহণ করি। আমরা পলায়নরত পাকিস্তানিদের ধাওয়া করে সিলেটের পশ্চিম অক্ষ হয়ে ১৬ তারিখ সকালে শহরের পশ্চিমাঞ্চল দখল করি।

১৬ই ডিসেম্বর আমি খুব আনন্দিত ছিলাম কারণ সর্বস্তরের জনগণের দুঃখ-কষ্ট শেষ হয়েছে। অবশ্য তাত্ত্বিকেরা (যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে বসে যুদ্ধরত ছিলেন এবং আমাদের যুদ্ধরত রনক্লান্ত সৈনিকদের মনোবল এবং মনোভাব জানতেন না) অন্যান্য জাতির উদাহরণ টেনে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কথা বলে থাকেন।

মুক্তিযুদ্ধের পর আমি যখন সিলেট শহরে ছিলাম তখন সিলেট শহরে আমার জানা মতে কোনো চুরি, ডাকাতি, খুন বা রাহাজানির মতো ঘটনা ঘটেনি যদিও সেখানে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার সমাবেশ ঘটেছিল এবং এরা প্রত্যেকেই ছিল সশস্ত্র। স্বাধীনতার পর দেশের অন্যান্য স্থানেও এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। অথচ সকল মুক্তিযোদ্ধারা যখন তাদের অস্ত্র জমা দিয়ে দিলেন ঠিক তখন থেকেই এইসব হাইজ্যাকিং, খুন এবং ডাকাতির মতো সমাজবিরোধী কাজ ভীষণভাবে প্রকট হয়ে উঠে। সেই সময় সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের এইসব কাজের জন্য দায়ী করা হতে থাকে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে (যেমন নাটক, চলচ্চিত্র) সুকৌশলে দেখানো হতে থাকে যে মুক্তিযোদ্ধারা হতাশাগ্রস্ত এবং তারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। এমনকি কিছু কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, স্বাধীনতা যুদ্ধে যার বা যাদের ভূমিকা ছিল বিতর্কিত তারা মুক্তিযোদ্ধাদের আবার মানুষ হবার আহবান জানানোর ধৃষ্টতা প্রকাশের সাহস পায়। সমাজের বিভিন্ন স্তরে দুএকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে কালিমা লেপনের এক ঘৃণ্য চক্রান্ত চলতে থাকে। এই চক্রান্তের রেশ আজও শেষ হয়ে যায়নি।

আমার দেখা মতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্রসমাজ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত ছিল। অন্য যে কোনো বাহিনী বা গোষ্ঠী থেকে ছাত্রদের ত্যাগ ও অবদানের অনেক অনেক শীর্ষে।

আগস্টের একটা ঘটনা। তখন ৩ ইস্ট বেঙ্গল রৌমারী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে অপারেশনে ছিল। ইপিআর এর ৩টা লঞ্চ আমাদের দেওয়া হয়েছিল। লঞ্চে যমুনার চর রাজীবপুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় আমরা দেখলাম যে চরে প্রায় ৫০০-৭০০ ছেলে এক ইন্সট্রাকটরের অধীনে শুধু P.T করছে। তখন প্রায় দুপুর ১২টা। তীরে লঞ্চ ভিড়ানো হলে দেখলাম ছেলেদের বয়স ১৫ থেকে ২২ বছরের ভিতর। ইন্সট্রাকটর (হয়তো কোনো স্কুলের ড্রিল শিক্ষক) বললেন যে ছেলেদের সবাই স্কুল কলেজের ছাত্র। পাবনা-সিরাজগঞ্জ এলাকা থেকে এসেছে। এরা youth camp এ ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। জিয়া ছেলেদের খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। ইন্সট্রাকটর বললেন যে ছেলেদের খাওয়া দাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত নেই, অনেকেই ৩/৪/৫ দিন ধরে না খেয়ে আছে কিন্তু ইয়ূথ ক্যাম্পের ভর্তিতে যেন বাদ না পড়ে তাই এই চরম কষ্ট স্বীকার। বাঙালি যুব সমাজের এত আত্মত্যাগ, তীতিক্ষা, এত মনোবল! আমরা ফেরত গিয়ে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়াটার এবং জেড ফোর্স হেডকোয়াটার থেকে কিছু রেশন পাঠিয়ে দিলাম যেন অন্তত বেঁচে থাকে তারা। পরে জেড ফোর্স হেডকোয়াটার থেকে তাদের জন্য আরো কিছু রেশন দেওয়া হয়েছিল। [ইয়ূথ ক্যাম্পে প্রাথমিক ট্রেনিং এর পর ট্রেনিং ক্যাম্প পাঠানো হতো। সেখানে এদের অস্ত্র শস্ত্র গেরিলা ট্রেনিং দেওয়া হতো।]

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের আরেকটা ঘটনা। মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে জিয়া আর আমি যাচ্ছিলাম হালুয়াঘাটের বিপরীতে আমাদের অবস্থান ঢালুতে। প্রায় ৪০ মাইল পাহাড়ি পথ। জীপ আমি চালাচ্ছিলাম। দেখলাম মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে বহু যুবক লাইন করে পায়ে হেঁটে ঢালুর দিকে যাচ্ছে। তাদের জিজ্ঞাসা করাতে বলল যে তারা ভর্তির জন্য মহেন্দ্রগঞ্জ ইয়ূথ ক্যাম্পে গিয়েছিল কিন্তু ওখানকার কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে যে মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে

আর লোক নেবার মতো অবস্থা নেই, ঢালু ক্যাম্পে গেলে হয়তো নিতে পারে। তাই ইয়ূথ ক্যাম্পে ভর্তির আশায় তারা ঢালু যাচ্ছে। এদের বহুদিন কোনো খাওয়া-দাওয়া নাই। শরীর খুবই দুর্বল। বেশ কয়েকজনের প্রচণ্ড জ্বর—অন্যেরা এদের কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। এরকম কয়েকজনকে আমাদের জীপে তুলে ঢালুতে পৌঁছে দেই। [তখন ইয়ূথ ক্যাম্পগুলোতে ভর্তির জন্য প্রচণ্ড ভিড় লেগে থাকত। কোনো ক্যাম্পে যদি ১০০০ জনের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা, দেখা যেত ১৫০০ জন ট্রেনিং নিচ্ছে। কিন্তু ১০০০ জনের নির্দিষ্ট রেশনেই ১৫০০ জনকে চলতে হতো। ফলে ভর্তিচ্ছু অতিরিক্তদের বিদায় করে দেয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকত না। আমার ব্যাটালিয়নে সবসময়ই ১৩০০-১৩৫০ জন লোক ছিল এবং একসময় তা প্রায় ১৮০০ জন অতিক্রম করে যদিও আমি মাত্র ৯০০ জনের রেশন পেতাম।]

আমার ব্যাটালিয়নেও বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সিপাই হিসেবে যুদ্ধ করেছে। জানতাম না। তারাও কোনোদিন নিজেদের পরিচয় বলেনি, পাছে বের করে দেওয়া হবে— সম্ভবত এই ভয়েই। স্বাধীনতার পর কারা কারা আর্মিতে থাকতে চায় অথবা চায়না জানতে চাইলে তখন শুনি কেউ বলে, 'স্যার, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমুক বিষয়ের অমুক বর্ষের ছাত্র।' আবার কেউ বলে, 'স্যার, আমি অমুক এমএসসি ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছিলাম। পরীক্ষাটা দিতে চাই।'

ওয়াহিদ (পরবর্তীতে ডা. ওয়াহিদ) ৩য় ইস্ট বেঙ্গলের রেজিমেন্টাল মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিল। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের তদানীন্তন ৩য় বর্ষের ছাত্র ওয়াহিদ আমাদের অসাধারণ সেবা দিয়েছিল। দিন রাত প্রতিটি সময় যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, চিকিৎসা দিয়েছে। যুদ্ধের পর আবার পড়াশুনায় ফিরে যায়।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে টেলিফোন অপারেটরদের গৌরবজনক ভূমিকা জনগণের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। তাদের ভূমিকার মূল্যায়ন কখনই করা হয়নি এবং মূল্যায়নের চেষ্টাও হয়নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সেই প্রথম প্রহরে যখন অন্যান্য সব যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ছিল তখন টেলিফোন অপারেটরগণ জীবনের অসামান্য ঝুঁকি নিয়ে খবরাখবর আদান-প্রদান করে প্রতিরোধ সংগ্রামকে জোরদার সমন্বিত করতে অতুলনীয় সাহায্য করেন। দেরীতে হলেও এখন তাদের অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে আমাদের স্বীকার করে নেওয়া উচিত।

মে মাসের ৯/১০ তারিখে আগতলায় কর্নেল রবের রুমে (হেডকোয়ার্টারে) মেজর জিয়াকে প্রথম দেখি। ইউনিফর্ম পরিহিত, খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা এক অফিসার স্যালুট করে কর্নেল রবের কাছে ক্ষুব্ধ স্বরে তারা বদলীর জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তখন জানতে পারি ইনিই মেজর জিয়াউর রহমান।

জেড ফোর্স কামান্ডার তৎকালীন লে. কর্নেল জিয়া (৮ম ইস্ট বেঙ্গল) সাহসী এবং সক্রিয়। মে থেকে অক্টোবর প্রায় সাড়ে চার মাসে তার সাথে ছিলাম। তিনি আমাদের সমস্যাগুলো বুঝতেন যুদ্ধের ক্রান্তিকালেও তিনি সৈনিকদের সাথে থাকতেন। জিয়া যে কোনো ঝুকি নিতেন। মেজর আমিনুল হকের ব্যাটালিয়ান (৮ম ইস্ট বেঙ্গল) দিয়ে নকশী

বিওপিতে যে আক্রমণ চালানো হয় সে সময় আমি জিয়ার কাছে ছিলাম। আমাকে বললেন, Let us go to see 8 East Bengal attacking Noksi BOP at night. আমরা যেখানে ছিলাম সেটা যুদ্ধক্ষেত্রের আওতার মধ্যে ছিল। He could have been seriously wounded/killed at any time during the course of attack, since enemy shells and MG fire were falling all around us. আমরা মাটিতে আশ্রয় নেই। In fact as a brigade commander he need not have come at all to participate in a attack or share the fate of a attacking troops comprising of a company strength only.

আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে যুদ্ধ অনেকদিন হবে। তাই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সৈনিকদের রক্ষা কর‍্যা ও তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়। তখন বাংলাদেশে পাকিস্তান আর্মির সাড়ে চার ডিভিশন, প্রায় ৩৬টার মতো ব্যাটালিয়ন ছিল। এদের সাথে সরাসরি যুদ্ধ (conventional war) করতে হলে আমাদের কমপক্ষে সমপরিমান নিয়মিত বাহিনী দরকার ছিল। অথচ আমাদের তখন ৮টা ব্যাটালিয়ন ছিল। গেরিলারা ক্রমাগত গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তান আর্মিকে দুর্বল ও পর্যুদুস্ত করে দেবে, তাদের morale নষ্ট করে দিবে এবং যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আমাদের নিয়মিত সেনাবাহিনী বাংলাদেশে ঢুকে পড়বে (যেমন ভিয়েতনাম যুদ্ধে হয়েছে)। এজন্য কম করে হলেও আমাদের ৪০টা (চল্লিশ) ব্যাটাললিয়নের দরকার ছিল। আমরা তাই প্রচলিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নিয়মিত সৈন্য হারাতে চাইতাম না।

প্রচুর সৈন্য নিহত এবং আহত করে একটি শত্রু অবস্থান কয়েকদিনের জন্য দখলে রেখে আবার তা পরিত্যক্ত অবস্থায় শত্রুর নিয়ন্ত্রণে রেখে আসার কোনো অর্থই ছিল না। কিন্তু ভারতীয় অফিসাররা ঠিক এটাই চাইতেন। আমি প্রচলিত যুদ্ধ করি। তারা এটা চাইতো যেন প্রাপ্তিটা তাদের হয়। তাদেরতো এ ক্ষেত্রে হারানোর কিছু ছিল না। আর পরাজিত হলে ব্যর্থতার দায় মুক্তিবাহিনীর।

ছাতক অপারেশনে ৩য় ইস্ট বেঙ্গলের ১৭ জন সৈন্য শহীদ হয়। পাকিস্তানিরা নদীর ওপার পালিয়ে যায় এবং এপারের সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আমাদের দখলে চলে আসে। একটা যুদ্ধে নিয়মিত বাহিনী কোনো জায়গা তখনই দখল করে যখন সে জানে যে সেটা ধরে রাখতে পারবে। ছাতক হলো সীমান্ত থেকে ১২ মাইল ভিতরে। আমরা জানতাম যে ছাতক ধরে রাখার মতো শক্তি আমাদের নাই— ধরে রাখতে পারব না। তবুও বাধ্য হয়ে আক্রমণ করতে হয়েছিল। অবশ্য বিদেশে খুব প্রচার হয়েছিল যে দেশের সিমেন্ট ফ্যাক্টরিটা মুক্তিবাহিনী দখল করে নিয়েছে। আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম— শুধু শুধু কিছু ভাল সৈন্য হারাতে হল। এদের পূরণ করার মতো কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। ব্যাটালিয়ন জনবল অনেক কমে গিয়েছিল। জিয়াউর রহমান তখন আগরতলায় ছিলেন। জিয়া ফিরলে তাকে কথাগুলো বলেছিলাম। জিয়া আমার সাথে একমত ছিলেন। তিনি থাকলে হয়ত আমাদের এই অপারেশন করতে দিতেন না। পাকিস্তানি মেজর সিদ্দিক সালিক তার বই, Witness to Surrender-এ ছাতক আক্রমণের কথা লিখেছেন এবং বলতে চেয়েছেন যে ভারতীয় এ আক্রমণ করেছিল এবং ৩য় বেঙ্গল তাদের সহায়তা করেছিল

মাত্র। কিন্তু সত্য এই যে আক্রমণ একমাত্র ৩য় ইস্ট বেঙ্গলই করেছিল, একটি ভারতীয় সৈন্যও আমাদের সহায়তায় ছিল না। মেজর মীর শওকত আলী, সেক্টর কমাণ্ডার, আমাদের সাথে এই যুদ্ধে ছিলেন তার তিনটি এফ.এফ কোম্পানি নিয়ে, অসামান্য বীরত্বের জন্য তিনিও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানিদের সাথে বেশ কিছু বাঙালি অফিসারও (পাকিস্তানিদের সাথে কর্মরত) আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু আমাদের সর্বোচ্চ সেনাপতির নেক নজরের ফলে এক মাসের মধ্যে এদেরই একজনকে (উভয়েই একই ইউনিটে কর্মরত ছিলেন) জেল হাজত থেকে বের করে এনে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব পদে বসানো হয় (৭১ সালে মেজর পদে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স (EPCAF) এর রিক্রুটিং অফিসার ছিলেন। পরে এই অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। একইভাবে অন্যান্য প্রায় সকলকেই অত্যন্ত অল্প সময়ের ভিতর গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদে পুনর্বাসিত করা হয়।

ছোটখেল অপারেশনের বর্ণনা

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনীর সঙ্গে আমাকে বহুবার বড় ধরনের সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এরমধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় যুদ্ধ ছিল, ছোটখেল অপারেশন। বাংলাদেশ সীমান্তে পাকিস্তানি বাহিনীর যে কটি দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ছিলো তার মধ্যে সিলেটের ছোটখেল ও রাধানগর ছিল অন্যতম। মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী মাঝে মাঝে ছোটখেল ও রাধানগরে আক্রমণ চালাতো বলে পাকিস্তানিরা দিনে দিনে ওদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে তোলে। কাঁচা মাটির বাংকার রূপান্তরিত করে কংক্রিটের বাংকারে। অর্থাৎ পাকিস্তানিরা তাদের অবস্থান সবদিক দিয়েই নির্ভেজাল ও পাকাপোক্ত করে নেয়। এমনি দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে আমরা বহুবার হামলা চালিয়েছি। এতে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার তথা বেশ কয়েকটি মূল্যবান জীবনও হারাতে হয়।

যাহোক, ছোটখেলের ওপর আমরা চরম আঘাত হানি ২৮শে নভেম্বর ভোরে। আমি ৩য় ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার হওয়া সত্ত্বেও আমাকে না জানিয়ে ভারতীয় বাহিনীর সেক্টর কমাণ্ডার কর্নেল রাজ সিং ২৬শে নভেম্বর আমার কোম্পানি কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন নূরুন্নবী খানকে ছোটখেলে পাকিস্তানের সুদৃঢ় ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালাতে নির্দেশ দেন। যুদ্ধ পরিচালনা নিয়ে কিছুদিন থেকেই কর্নেল রাজ সিংয়ের সঙ্গে আমার মতবিরোধ চলছিল। শুধুমাত্র জেদের বশবর্তী হয়েই রাজ সিং মুক্তিবাহিনীকে ছোটখেল আক্রমণ চালানোর নির্দেশ পাঠান। মাত্র আগেরদিন রাধানগর ও ছোটখেলে হামলা চালিয়ে ভারতীয় ৪/৫ গুর্খা রেজিমেন্ট চরম ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটে এসেছে, সেখানে একদিন পরেই মুক্তিবাহিনীকে আক্রমণ চালাতে বলার কোনো যুক্তি নেই।

২৬শে নভেম্বর রাতে গুর্খা রেজিমেন্ট রাধানগর ও ছোটখেলের ওপর হামলা চালায়। গুর্খা রেজিমেন্টের সঙ্গে আমাদের দুটো প্লাটুনকে আক্রমণে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ভোর রাতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করা আর্টিলারি ফায়ারের আশ্রয়ে গুর্খাদের একটি কোম্পানি রাধানগর হাইস্কুল ও অন্য কোম্পানি ছোটখেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের দুটো প্লাটুনের মধ্যে একটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সুবেদার বদিউর রহমান, অন্য

প্লাটুনটি ছিলো ক্যাপ্টেন নুরুন্নবীর নেতৃত্বে। প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করে গুর্খারা ছোটখেল হামলায় সফলকাম হয়। এ যুদ্ধে গুর্খাদের পক্ষে নিহত হন ১৭ জন এবং আহত হন প্রায় ৪০ জনের মতো।

রাধানগর হামলায় গুর্খা রেজিমেন্ট সফল হতে পারেনি। যে কোম্পানিটি হামলা চালিয়েছিল, সে কোম্পানির কমাণ্ডার মেজর এসপি সিংসহ প্রায় সবাইকে প্রাণ হারাতে হয়। অবশ্য ছোটখেলও গুর্খারা ছয় ঘন্টার বেশি দখল করে রাখতে পারেনি। পাকিস্তানিদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ছোটখেল ছেড়ে গুর্খাদের পালিয়ে আসতে হয়।

পৃথিবী বিখ্যাত গুর্খা রেজিমেন্টের এমনিভাবে মার খাওয়ার মাত্র একদিন পরই ছোটখেলে হামলা চালানোর জন্য ভারতীয় বাহিনীর কর্নেল রাজ সিং নির্দেশ পাঠান। তার এ নির্দেশ পালন করতে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যু। এটা জেনেও কর্নেল রাজ সিং নিশ্চয়ই মনে মনে চাইছিলেন আমাদেরও একটা কোম্পানি তাদের মতোই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। তার এ ধরনের নির্দেশ আমার রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। মনে মনে শপথ করলাম নির্দেশ যখন এসেছে, তখন হামলা চালাবোই হয় সফলকাম হবো, নয়তো মৃত্যুকে বরণ করে নেব। ভারতীয় বাহিনীর কর্নেলকে বুঝিয়ে বলবো, বাঙালি বীরের জাত। তারা মরলেও বীরের মতই মরবে। পালিয়ে জীবন বাঁচাবে না।

আমি ছুটে গেলাম আমার ডেলটা কোম্পানির কমান্ডার ক্যাপ্টেন নূরুন্নবীর কাছে যাকে কর্নেল রাজ সিং ছোটখেল আক্রমণ চালানোর নির্দেশ পাঠিয়েছেন। একজন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার হিসেবে একটা কোম্পানির সঙ্গে আমার যুদ্ধে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমার একটা কোম্পানির ছেলেদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে আমি তো নিরাপদ দূরত্বে বসে থাকতে পারি না। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম ক্যাপ্টেন নূরুন্নবীর কোম্পানির নেতৃত্ব দেবো আমি নিজে। আমি ক্যাপ্টেন নূরুন্নবীর কাছে জানতে চাইলাম আমাদের সৈন্যরা এ অপারেশনে যেতে রাজি কি-না, আর ওদের মানসিক অবস্থাই বা কেমন? নূরুন্নবী জানাল মাত্র একদিন আগের মারাত্মক অপারেশনের পরে সৈন্যরা খুবই ক্লান্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি সব প্লাটুন কমাণ্ডার ও কোম্পানির সিনিয়র জেসিও সুবেদার আলী নেওয়াজকে ডেকে আনলাম। তারপর বললাম, 'মিত্রবাহিনীর কমাণ্ডার আমাদের জেনে শুনেই আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেছেন। তবে আল্লাহ যদি সহায় থাকে তবে আগুনও পানি হয়ে যায়। এ অপারেশনে আমাদের না গিয়ে উপায় নেই। এটা মুক্তিবাহিনী তথা বেঙ্গল রেজিমেন্ট তথা বাঙালিদের একটা মান সম্মানের প্রশ্ন। আমাদের প্রমাণ করতেই হবে যে, আমরা মাতৃভূমির জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারি। আমি অন্য পাঁচটি কোম্পানি ছেড়ে আপনাদের ডেল্টা কোম্পানির সঙ্গে অপারেশনে যাব।

সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে আগের মত বক্তব্য রাখলাম। বললাম, তোমাদের মরতে পাঠিয়ে তোমাদের ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার পেছনে বসে থাকতে পারে না। তাই আমি থাকব। প্লাটুন কমাণ্ডারের নিজ নিজ প্লাটুন নিয়ে রাত তিনটায় উপস্থিত হতে বললাম। এক পর্যায়ে সৈনিকদের আরও বললাম, অন্য কেউ না গেলেও আমরা তিনজনই (আলী নেওয়াজ, নূরুন্নবী ও আমি) রওয়ানা দেব।

এক সারিতে আমরা রওয়ানা হলাম। শত্রুর অবস্থান মাত্র ৭/৮ শত গজ দূরেই।

পাকা ধান ক্ষেতের ওপর দিয়ে আমরা একশ জন চুপি চুপি এগিয়ে যাচ্ছি। ভোরের আলো তখনও ভাল ভাবে দেখা দেয়নি। শত্রুর অবস্থানের তিনশ গজের মধ্যে এসেই আমি 'জয় বাংলা' বলে সামনের দিকে দৌড় দিলাম। আমার সঙ্গে সবাই একই ধ্বনি দিয়ে বাঘের ন্যায় হুংকার দিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একশটি এসএলআর পেছনের গোরা গ্রামের অবস্থান হতে দু'টি মেশিনগান ও একটি রিকয়েলস রাইফেলের বিকট আওয়াজ এবং সবার 'ইয়া আলী' আল্লাহু আকবর ও 'জয় বাংলা' চিৎকার এক অবর্ণনীয় অবস্থার সৃষ্টি করল। সবার মধ্যে এসে গেলো এক অশরীরি শক্তি। আমরা প্রচণ্ড দাপটে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। অন্যদিকে পাকিস্তানি বর্বর সেনারা সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের রুখে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। কিন্তু আল্লাহ আমাদের সহায়। ইতোমধ্যেই গ্রামে আমাদের লোকজন উঠে গেছে। তারা খড়ের স্তূপে, ছনের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল। একদিকে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, অন্যদিকে পাকিস্তানিদের সঙ্গে আমাদের চলছে হাতাহাতি যুদ্ধ। আস্তে আস্তে আমরা সম্পূর্ণ গ্রাম দখল করে নিলাম। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে পাকিস্তানি সৈন্যদের লাশ। আহত কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্যও অসহায়ভাবে কাতরাচ্ছে। পাকিস্তানিরা সবকিছু পেছনে ফেলে জান নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা গুলি এসে আমার কোমরে বিদ্ধ হলো। আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। দু'জন সৈন্য এসে আমাকে তাড়াতাড়ি কাঁধে করে পেছনে সরিয়ে নিল চিকিৎসার জন্য।

পৃথিবীর বিখ্যাত গুর্খা সৈন্যরা সেখান থেকে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে সেখানে আমরা বাংলার অগ্নিসন্তানেরা বুকের রক্ত ঢেলে বিজয় পতাকা উড়ালাম। আমাদের এ বিজয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে বাঙালিরাও পৃথিবীর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহসী জাতি। যাহোক, কর্নেল রাজ সিং তার হেডকোয়ার্টার থেকে ওয়ারলেসে আমাদের অভিনন্দন জানালেন।

পাকিস্তানিদের মাটির নিচের তিনতলার বাংকারে ৫/৭টা মেয়ের লাশ পাওয়া যায়। ছোটখেলের যুদ্ধে পাকিস্তানিরা কয়েকশ গোলাগুলির বাক্স, তিনশ'টি বেডিং বেশ কিছু আটা, চাল ও ডালের বস্তা, ৪৫টি ছোলা মুরগী, ৩টি মেশিনগানের ব্যারেল, ২টি টেলিফোন সেট, বাইনোকুলার, কম্পাস, ম্যাপের সীটসহ বিপুল পরিমাণ জিনিসপত্র ফেলে পালিয়ে যায়। এমনকি পাকিস্তানিরা সকালে নাস্তার জন্য তৈরি করা গরম পরাটা, সব্জি এবং চা-ও ফেলে রেখে যায়— যা দিয়ে আমাদের সৈন্যরা সকালের নাস্তা সেরে নেয়।

১৯৭৩ সালে আমাকে তৃতীয় সর্বোচ্চ পদক 'বীর বিক্রম' দেওয়া হয়। তবে কোন যুদ্ধের জন্য এটা পেয়েছি তা নিজেও জানি না।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম এবং এখনও করি যে এই রকম জনযুদ্ধে যেখানে ফোর্স/সেক্টর কমাণ্ডারগণ কদাচিৎ বাংলাদেশে ঢুকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তারা কীভাবে প্রকৃত সাহসী যোদ্ধা কারা তা জানতে পারবেন? সুতরাং এই ধরনের যুদ্ধে কোনো পদক দেয়াই উচিৎ ছিল না। পদক বিতরণী কার্যক্রমটি ছিল ওসমানী সাহেবের খামখেয়ালীপনার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। এর মাধ্যমে তিনি অনেকের প্রতি তার ব্যক্তিগত আক্রোশের ঝাল মিটিয়েছিলেন।

পদক বিতরণের পর একটা কথা প্রচলিত হয়েছে যে, শত্রু থেকে যে যত দূরে ছিল

সে তত বড় পদক পেয়েছে। যেমন দেখা যায় যে, দুজন ছাড়া বাকি সব সেক্টর কমাণ্ডার বীর উত্তম পদক পেয়েছে। জিয়া, শফিউল্লাহ ও খালেদ মোশাররফ ছাড়া বাকি সব সেক্টর কমাণ্ডাররা কেবল ডাক বাক্সের কাজ করেছেন। সংশ্লিষ্ট ভারতীয় সেক্টর কমাণ্ডারগণ (যারা সবাই ছিলেন ব্রিগেডিয়ার র‍্যাঙ্কের) ও তাদের স্টাফরাই প্রকৃত যুদ্ধ পরিকল্পনা ও অন্যান্য সবকিছু তদরকী করতেন। সোজা কথায় বলতে গেলে উপরোক্ত তিন জন ছাড়া আমাদের বাকি সেক্টর কমাণ্ডাররা প্রশাসনিক, লজিস্টিক ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছেন। সুতরাং এই অপারেশনাল পদকগুলো প্রশাসনিক লোকদের উপর অর্পন করায় তা এক হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া মাত্র সামান্য কয়েকদিন সেক্টর কমাণ্ডারের দায়িত্ব পালন করে বেশ কয়েকজন 'বীর উত্তম' উপাধিতে ভূষিত হন যারা কোনও যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেননি।

যেমন, জেনারেল ওসমানীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এমনও একজন 'বীর উত্তম' আছেন যিনি এপ্রিলে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে জেনারেল ওসমানীর নিষেধ সত্ত্বেও দুই দিন পর পালিয়ে দেশে চলে যান। অক্টোবরে আবার ফিরে আসেন এবং একজন সেক্টর কমাণ্ডারের অনুপস্থিতির সুযোগে সেক্টর কমাণ্ডার বনে যান এবং পরবর্তীতে ঢালাও উপাধি পান। এই বীর উত্তম সাহেবটি একদিনের জন্যও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শত্রু মোকাবেলার জন্য ঢুকেননি শুধুমাত্র পালিয়ে থাকার সময়টুকু ছাড়া।

আরও কিছু পদক দেওয়া হয়েছে লক্ষহীন গুলিতে আহত ব্যক্তিদের বীরত্বপূর্ণ কোনো যুদ্ধের জন্য নয়— যা নাকি সেই যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি পরিবর্তনের সহায়তা করতে পারতো। উচ্চ পদক পেয়েছেন কিছু ভাগ্যবান একটি বিশেষ জেলার অফিসার হবার সুবাদে আরও পেয়েছেন কয়েকজন ওসমানীর অতি প্রিয়জন হিসেবে কয়েকজন পেয়েছেন যারা নিজেরা নিজেদের কল্পিত Citation লিখে, সেক্টর কমাণ্ডারদের কাছ থেকে সুপারিশ করিয়ে উপরে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। উল্লেখ্য এইসব 'বীর উত্তম'দের অনেকেই একদিনের জন্যও বাংলাদেশে ঢুকে শত্রুর মুখোমুখি হননি।

একমাত্র জেনারেল ওসমানী সেক্টর কমাণ্ডার হবার যোগ্যতাগুলি জানতেন অথবা তিনি কিছুই জানতেন না। সবকিছু যেন চলছিলে আপন তালে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমাদের কাউকেই জানতে দেওয়া হয়নি যে ফোর্স কমাণ্ডাররা সেক্টর কমাণ্ডারের সমতুল্য। পদক বিতরণের সময় (১৯৭৩ সালে) আমরা সবিস্ময়ে জানতে পারি যে ফোর্স ও সেক্টরকে একই মর্যাদায় ধরে পদক বিতরণে একই নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে। যদি সেক্টর ও ফোর্স কমাণ্ডার হবার সুবাদে কেউ 'বীর উত্তম' উপাধি পান তবে তারও উচ্চ পদমর্যাদার অফিসারগণের 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত, তবে কি কেউ একমাত্র জীবিত 'বীরশ্রেষ্ঠ' হবার ইচ্ছা পোষণ করতেন?

মুক্তিযুদ্ধকালীন তিনটি নিয়মিত পদাতিক ব্যাটালিয়নের (১ম, ২য় এবং ৩য় এই তিনটি ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন) কমাণ্ডিং অফিসাররা দুজন সেক্টর কমাণ্ডার (এবং পরবর্তীতে চার জন সেক্টর কমাণ্ডার) থেকে অনেক সিনিয়র ছিলেন। জুনিয়র, নন-ইনফেন্ট্রী এই সেক্টর কমাণ্ডারদ্বয়ের পরিবর্তে এখানে উপরোক্ত তিনজনের যে কোনো দুজনকে ঐ দুটি সেক্টরের কমাণ্ডের দায়িত্ব দেওয়া উচিত ছিল। তাছাড়াও আরও দুটি

সেক্টরের একটির দায়িত্ব দেওয়া হয় একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসারকে এবং অন্যটির দায়িত্ব দেওয়া হয় একজন বিমান বাহিনীর বৈমানিকের উপর। সিনিয়র ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারদের সেক্টরের দায়িত্ব না দিয়ে তাদের উপর অবিচার করা হয়। পদকপ্রাপ্তিতেও তারা পিছিয়ে পড়েন।

পদক বিতরণে রাজনীতিও একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে। যেসব অফিসার সৈনিক জিয়ার অধীনে কাজ করেছিল তাদের উপর অবিচার করা হয় যেহেতু ওসমানী জিয়ার ছায়াকেও ঘৃণা করতেন। (প্রধানত জিয়ার ২৭শে মার্চের রেডিও ঘোষণা ও অন্যান্য কারণে)। একই ভাবে বীরত্ব উপাধি প্রদানের জন্য গঠিত বোর্ডের (যার চেয়ারম্যান ওসমানী) সদস্য শওকত ও মঞ্জুরের প্রভাবের ফলে খালেদ মোশাররফের অধীনস্ত অফিসার ও জোয়ানদের ন্যায্য পদক থেকে বঞ্চিত করা হয়। মঞ্জুর এবং শওকত সব সময়ই খালেদ মোশাররফের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। কারণ তারা কেউই তেজদীপ্ত খালেদ মোশাররফের সমতুল্য ছিলেন না। তাই ভারসাম্য রক্ষার জন্য তারা তাদের অধীনস্তদের এমন সব যুদ্ধের জন্য উপাধি দেয়া হয় যেগুলি জিয়া, শফিউল্লাহ বা খালেদ মোশারফের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতো।

পদক বিতরণী নিয়ে এহেন ন্যক্কারজনক ঘটনাবলী সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করেছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ছিল এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। আমি মনে করি এই ইচ্ছাকৃত ভুলের সংশোধন হওয়া উচিত এবং অবিলম্বে এটা প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিৎ।

আমি ১৯৬৪-৬৮ সাল পর্যন্ত পদাতিক বাহিনীর বেঙ্গল রেজিমেন্টের চতুর্থ ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলাম। তারপর উনসত্তরে পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খাঁতে Military Police School-এ Instructor এবং সত্তরে মুলতানে 10 Military Police Unit-এর উপ-অধিনায়ক ছিলাম। ঐ বছর এপ্রিল মাসে মেজর পদে উন্নীত হই। সত্তরের শেষ দিকে কুমিল্লাতে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে আবার বদলী হই। একাত্তরের মে হতে বাহাত্তরের জুলাই মাস পর্যন্ত ৩য় ইস্ট বেঙ্গল কমাণ্ড করি। দেশ স্বাধীন হবার কিছুকাল পর ৩য় ইস্ট বেঙ্গলকে কক্সবাজার-আলীকদমে মোতায়েন রাখা হয়। আমি ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে লে. কর্নেল ও ১৯৭৩ সালে কর্নেল পদে উন্নীত হই। বাহাত্তরের জুলাই হতে চুয়াত্তরের মার্চ মাস পর্যন্ত রংপুর ব্রিগেড এবং চুয়াত্তরের মার্চ হতে পচাত্তরের নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকা বিগ্রেড কমাণ্ড করি।

এক অবৈধ, অসাংবিধানিক সরকার উৎখাতের অভিযোগে আমাকে ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে সেনাবাহিনী হতে বরখাস্ত করা হয়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, যে প্রেসিডেন্ট আমাকে বরখাস্ত করেছিলেন তার নিয়োগে আমার ভূমিকা ছিল একক এবং মুখ্য।

পরবর্তীকালে ১৯৮০ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হতে অবসরগ্রহণ করি। বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্যেরত আছি।



লে. কর্নেল মো. হাবিবুল্লাহ বাহার

কুমিল্লার মুরাদনগর থানার গাজীপুর গ্রামে আমার জন্মস্থান। জন্মতারিখ ৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৪। আমার পিতার নাম মৃত হাজী ছমিরউদ্দিন। তিনি জমির মালিক (গৃহস্থ) ছিলেন। ১৯৭৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মাতা আবেদুন নেছা। আমার ছোট বেলায় তার মৃত্যু হয়। আমরা চার ভাই, দুই বোন। আমি দ্বিতীয়।

গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে প্রথমে লেখাপড়া করি। তারপর শিমরাইল সেকেন্ডারী স্কুল (কসবা, কুমিল্লা) ও পরে চারগাছ অখিল দত্ত হাই স্কুল (কসবা, কুমিল্লা) হতে ১৯৫১ সনে ২য় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করি (তখন সাইন্স, আর্টস ছিল না)।

১৯৫১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে এ্যাপ্রেনটিস হিসেবে যোগদান করি। তারপর পাকিস্তানের মারী হিল ও রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। সকল যোগ্যতা অর্জন করে কম্পিটিশনে পশ্চিম পাকিস্তানের কোটায় নির্বাচিত হই। ১৯৫৯ সনে অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল, কোহাটে শিক্ষা গ্রহণ করে ১৯৬০ সালে সিগন্যাল কোরে কমিশন প্রাপ্ত হই। তারপর রাওয়ালপিণ্ডি, কোহাট, করাচীতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। ১৯৬৩ সনে ঢাকাতে কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলাম না তবে সচেতন নাগরিক হিসাবে আওয়ামী লীগ ও তার নেতা বঙ্গবন্ধুর ভক্ত ছিলাম। আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার পর আমার স্ত্রী-পুত্র সবাইকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ইস্পাহানী পাবলিক স্কুলে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। আমি রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলাম। ষাট দশকের প্রথম থেকেই আমি দেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতাম, পত্র পত্রিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তাম। লোকজনের মনোভাব দেখলেই বোঝা যেত যে এরা মার্শাল ল মনে প্রাণে মেনে নেয়নি। উনসত্তরে যখন সেকেণ্ড মার্শাল ল জারী করা হল তখন আমি ভবিষ্যতবাণী করেছিলাম যে পাকিস্তান ভেঙে যাবে। কারণ লোকজনের চালচলন, মনোভাব সবই পাকিস্তানের বিপক্ষে ছিল। তবে একাত্তরের মতো যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করতে হবে— এ ধরনের চিন্তা করিনি।

ঊনসত্তরে আমি কোহাট ছিলাম। চিন্তা করলাম কীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে আসা যায়। তখন পোস্টিং ব্রাঞ্চ বাঙালি অফিসার ছিলেন লে. কর্নেল মান্নান সিদ্দিকী। আমি আমার স্ত্রীসহ তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাকে বললাম যে বাড়িতে (দেশে) অসুবিধা, আমাকে পূর্ব পাকিস্তানে বদলী করে দেন। জুলাই মাসে (১৯৬৯) পূর্ব পাকিস্তানে আসি। আসার সময় আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড হতে দশ হাজার টাকা হাউজিং এর বাহানা দিয়ে তুলে নেই।

সত্তরের নির্বাচনের সময় পিণ্ডিতে ছিলাম ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ারের উপর এক মাসের একটা কোর্সে। পাকিস্তানিরা জানতে চাইত ইলেকশনের খবর। বলতাম আওয়ামী লীগ ৯৯.৫০% ভোট পাবে।

যেহেতু আমি হাবিজাবি কিছুই সহ্য করতাম না তাই পাকিস্তানিরা আমাকে বলত এই-ই শেখ মুজিব। এখানে উল্লেখ্য ৭০/৭১ সালে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে যাদের সাথে আলাপ করতাম তাদের তেমন চেতনা ছিল না। চাকরি-বাকরি করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখের সংসার করব এরকমই মনোভাব ছিল। তবে কেউ কেউ পাকিস্তানপন্থী ছিলেন। আমি ২৫শে মার্চে ১৯৭১ সনে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের বিগ্রেড সিগন্যাল অফিসার ছিলাম (তখন ক্যান্টনমেন্টে একমাত্র ৫৩ ব্রিগেড ব্রিগেড ছিল)। ঐ দিন পাকিস্তান আর্মির ২৪ এফএফ রেজিমেন্ট কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে চট্টগ্রামের দিকে রওয়ানা হয়। এই সংবাদ আমি কুমিল্লা এক্সচেঞ্জের মি. আবদুস সুকুর, যিনি এক্সচেঞ্জ সুপারভাইজার ছিলেন তার মারফত নোয়াখালী, ফেনী ও চট্টগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। যার ফলে ফেনীতে একটা কাঠের পুল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং মেজর রফিক যিনি চট্টগ্রামে ইপিআর হেডকোয়ার্টারে এডজুটেন্ট ছিলেন, এমবুশ স্থাপন করে ২৪এফএফ-এর ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার লে. কর্নেল শাহপুর খান বখতিয়ার ও তার সৈন্যদের নিহত করেছিলেন।

২৫শে মার্চ রাত ১২টার সময় ব্রিগেড মেজর সুলতান (পাঞ্জাবী, বালুচ রেজিমেন্টে কর্মরত) আমাকে জানায় যে বাঙালিরা বিদ্রোহ করেছে। তুমি একটা নিরাপত্তা ঝুঁকি। আমাকে বন্দী অবস্থায় সেলে রাখা হয়।

আমার স্ত্রী আমার বন্দী অবস্থার কথা জানতে পেরে মেজর সুলতানকে ফোন করে বলে, "আমার স্বামীকে যদি না ছেড়ে দাও তবে ফোন করে অন্য সব অফিসারকে বলে দিব। ২৬শে মার্চ সকালে আমাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসা হয় ও ৪জন গার্ড বাড়ির ৪ কোনে মোতায়েন রাখা হয়। তারা বাড়ির টেলিফোন লাইন কেটে দেয়। তারপর কোনো খবর পাওয়ার সুযোগ ছিল না। রেডিওতে ভয়েস অফ আমেরিকা, বিবিসি শুনতাম।

২৬শে মার্চ দিন ও রাত নিজ বাসায় বন্দী অবস্থায় থাকি। ২৭শে মার্চ সন্ধ্যার পর আমি পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ বন্দী অবস্থায় ভয়েস অফ আমেরিকা এবং মূলত বিবিসি হতে জেনে গেছি এদেশে কী ঘটেছে। আমি বাঁচতে চাইলাম কারণ আমি ভালো করে জানতাম আমার জীবন মৃত্যু ঝুঁকিতে আছে। স্ত্রীকে বললাম যে বাড়ির সামনে গিয়ে হৈ-হল্লা করতে মানে কান্না কাটি করে সেন্ট্রীদের মনযোগ যেন তার দিকে যায়। আমার বাড়ির পিছনে ধানক্ষেত ছিল। পাকের ঘরের জানালার ফ্লাইপ্রুফ নেট কেটে নীচে নেমে ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে প্রায় ১০০ গজ হামাগুড়ি দিয়ে চলে যাই। তারপর অন্ধকার হয়ে গেল তখন আমি উঠে হাঁটতে লাগলাম। এই এলাকাটা

ক্যান্টনমেন্টের মেইন রোডের খুব কাছে ছিল। তারপরই সিভিল এরিয়া। একজন বেসামরিক ব্যক্তি আমাকে চ্যালেঞ্জ করল। তাকে পরিচয় দিলাম। সে কিছু না বলে চলে গেল।

তারপর উত্তর-পূর্ব দিকে হাঁটতে লাগলাম। রাস্তায় কাদা, পানি ছিল। আলেকার চর বাজারের মাঝখান দিয়ে যে রাস্তা গেছে তা দিয়ে গোমতী নদীর পাড়ে গেলাম। নদীতে পানি কম ছিল। নদী পার হয়ে দেখলাম যে লোকজন কুমিল্লা শহর হতে পালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে আওয়ামী লীগের একজন লোক পেলাম। তার সাথে বুড়িচং চলে গিয়ে তার বাড়িতে রাত কাটালাম। তার নাম মনে নেই। যেহেতু আমি আমার আইডেনটিটি দেইনি ওরা সন্দেহ করে আমাকে বুড়িচং থানায় নিয়ে এলো। থানার ওসিকে আমার পরিচয় দিলাম। তারপর ওখানে অনেক লোক জড় হলো। আমি আর্মির লোক। ওরা (জনগণ) কী করবে? দিক নির্দেশনা পাবার জন্য। যেহেতু আমার হাতে কোনো সৈন্য ছিল না তাই মনে মনে ডিসিশন নিলাম যে যেহেতু আর্মি ক্যান্টনমেন্ট কাছে তাই এই জায়গা হতে দূরে চলে যাওয়াই ভাল।

২৮শে মার্চ বুড়িচং থানায় যখন বসে আছি তখন আমার সাথে থানায় মিলিত হলেন তখনকার ক্যাপ্টেন হায়দার। তার সৈনিক ব্যাটম্যানও তার সাথে ছিল। হায়দার কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কমেণ্ডো ব্যাটালিয়নে ছিলেন, আগে হায়দারের সাথে আমার পরিচয় ছিল না, বুড়িচং-এ প্রথম পরিচয় হয়। আমি বললাম যে, ফোর বেঙ্গলতো ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া আছে, কিছু করা যায় কিনা? ক্যাপ্টেন হায়দার যুক্তি দিলেন যে উনি ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া চলে গিয়ে একটা কোম্পানি নিয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট রেইড করে অস্ত্র উদ্ধার করবেন। আমি মেনে নিলাম।

২৮শে মার্চ রাতে আমি চলে গেলাম কংশনগর বাজার। ওখানে এক আওয়ামী লীগ কর্মীর বাসায় রাত কাটালাম। হায়দারের কোনো খোঁজ খবর না পেয়ে ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে গিয়ে দেখি ওখানে দুই জন জুনিয়র ক্যাপ্টেন গাফফার ও ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিন উপস্থিত, আর কোনো অফিসার ছিল না। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার, সেকেন্ড ইন কমান্ড ও কোয়ার্টার মাস্টার পাঞ্জাবী ছিল ও তাদের ডিসআর্ম করে জেলে রাখা হয়েছিল।

মেজর খালেদ মোশাররফ এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে শামসেরনগর চলে গিয়েছিলেন কাজেই কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট আক্রমন করার জন্য ডিসিশন দেবার মতো কোনো অফিসার ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়ায় ছিলেন না।

২৯ তারিখ (মার্চ) বিকাল বেলা আমরা বসে আছি এমন সময় মি. আবদুল মান্নান (যিনি সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউসের কর্মকর্তা ছিল) ও আরো একজন লোক দুজনে এসে আমাদের বললেন যে ইণ্ডিয়া থেকে আর্মি অফিসার চাচ্ছে। তখন আমি কালবিলম্ব না করে ওদের সাথে রওয়ানা দিলাম। ক্যাপ্টেন হায়দার ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে যোগ দেন।

মি. মান্নান ও তার সঙ্গীর বাড়ি ছিল কসবাতে। ওরা কসবার এম, পি সিরাজুল হকের নির্দেশে ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়ায় এসে আমাদের খবর দেয় (মি. মান্নানরা ইণ্ডিয়া যায়নি,

সিরাজুল হক গিয়েছিল কিনা বলতে পারব না)। তারা সবাই আমার সাথে ইণ্ডিয়া গিয়েছিলেন। তারপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে দক্ষিণ দিকে আসতে লাগলাম। উজনিসার ব্রীজের উত্তর পাড়ে আসার পর দেখলাম যে, পুলের দক্ষিণ পাড়ে পাক আর্মির সম্ভবত ৩১ মর্টার ব্যাটারী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে এডভান্স করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। পুলের দক্ষিণ পাড়ে জনগণ রাস্তা কেটে প্রতিবন্ধক তৈরি করেছিল, তারজন্য তারা আসতে পারছিল না। আমরা এই খবরটা ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঠিয়ে দেই ও ব্রীজ বাইপাস করার জন্য পশ্চিম দিকের মাঠে নেমে যাই। এই ঘটনাটা এখনও মনে পড়ে। তারপর ২৯ তারিখ রাতে একটা গ্রাম রাত কাটাই।

৩০ তারিখ সকালবেলা কসবার দিকে রওয়ানা হই। কসবায় মমতাজ বেগমের (তখন সংসদ সদস্য) বাড়িতে কিছু খাওয়া দাওয়া করি এবং ওখান থেকে সিরাজুল হক সাহেবের একটা ভক্সওয়াগণ গাড়িতে করে সিরাজুল হক সাহেব সহ কমলাসাগর বিওপি (ইণ্ডিয়া) যাই। সেখানে বিএসএফের ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী (বাঙালি এবং বাড়ি ছিল বাংলাদেশে) আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে আগরতলা নিয়ে যান। আগরতলায় সন্ধ্যার সময় আমি ৯১ BSF কমাণ্ডার লে. কর্নেল ব্যানাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

কমলাসাগর বিওপিতে ক্যাপ্টেন চক্রবর্তীর সাথে বিশেষ কথা হয়নি। আমরা সবাই খুব পরিশ্রান্ত ছিলাম। ৯১ BSF এর কর্নেল ব্যানার্জীর সাথে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ হয়েছিল। ওরা সে পর্যন্ত রেডিও, পত্র-পত্রিকা আর কিছু শরনার্থীর কাছ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের খবর জেনেছিল। আলাপের শেষ দিকে কর্নেল ব্যানার্জী ঠাট্টা করে বললেন, "দাদা এবার ইলিশ মাছ খেতে পারব।"

৩১ মারিখ (মার্চ) সকালের দিকে মান্নানসহ আমি থ্রি নট থ্রি, এ্যামুনিশন ও গ্রেনেড নিয়ে কসবা আসি। কসবায় ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের একজন সৈনিককে পাই (তার নাম এখন মনে নেই)। তাকে সহ মান্নানকে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউস এরিয়াতে আর্মস অ্যামুনিশন গুলো দিয়ে পাঠিয়ে দেই এগুলো (আর্মস— অ্যামুনিশন) ব্যবহার করার জন্য লোকটা যেহেতু ইঞ্জনিয়ারিং কোরের ছিল তাই এগুলোর ব্যবহার সম্বন্ধে জানত। ওকে পাঠানো হয়েছিল যেন ঐসব অস্ত্রের ট্রেনিং-ও দিতে পারে। তারপর আমি আগরতলা চলে গেলাম।

১লা এপ্রিল-আগরতলা থেকে রামগড় গেলাম চট্টগ্রামের অবস্থার খোঁজ নিতে। ওখানে গিয়ে দেখতে পেলাম মেজর জিয়াউর রহমান, ক্যাপ্টেন রফিককে যিনি ইপিআরে ছিলেন। রফিকের অবাঙালি ইপিআর সেক্টর কমান্ডারকে এরেস্ট করে ইণ্ডিয়ান আর্মির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। জিয়া, রফিক কাউকেই আগে চিনতাম না।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ- আরও দক্ষিণে সীতাকুণ্ডে গেলাম ট্রুপসদের অবস্থা দেখার জন্য। সীতাকুণ্ড পর্যন্ত জিয়াউর রহমানের ট্রুপসদের লাস্ট পজিশন ছিল। রামগড় থেকে আবার আগরতলা হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। এটা এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে হবে।

বাংলাদেশে ঢুকে কসবায় মমতাজ বেগমের বাড়িতে তখনকার অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ওসমানীকে বড় খারাপ অবস্থায় দেখতে পেলাম (শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত)।

সময়টা প্রায় এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হবে। তার ছদ্মবেশ ছিল, মোচ কামানো ছিল। আগে কর্নেল ওসমানীর সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল রাওয়ালপিণ্ডিতে। আমি ওসমানী সাহেবকে ভারতে যাবার প্রস্তাব দিলে তিনি রাজি হতে চাননি। তার ভয় ছিল ভারতীয়রা তাঁকে বন্দী করবে যেহেতু তিনি ১৯৬৫ সনে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। যাহোক তাকে অনেক বুঝালাম—আপনিতো জেনারেল হেডকোয়ার্টার, রাওয়ালণ্ডিতে ডিপুটি ডাইরেক্টর, মিলিটারি অপারেশন ডাইরেকটরেট ছিলেন। যুদ্ধ করেছেন, আমিতো ফ্রন্টে যুদ্ধ করেছি '৬৫-এ, কই আমাকেতো ওরা কিছু বলেনি। সিচুয়েশন এখনতো অন্য রকম। এখনতো আপনি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। শেষে কর্নেল ওসমানী শর্ত দিলেন যে তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে এমএনএ হিসেবে, Mr. Osmani, MNA of Bangladesh.

আমরা দুজনে কসবা দিয়ে পায়ে হেঁটে বর্ডার ক্রস করলাম। সাথে অন্য কেউ ছিল না। যাবার পথে তাকে বিস্তারিতভাবে সব বিষয় বললাম। যখন বললাম Lt Col Reza has crossed over to the border. হঠাৎ তখন উনি বলে বসলেন, তাকে কিছু দেয়া যাবে না। He (Lt Col Reza) was a senior officer at that time. আমি বললাম Why not? তাকেতো অন্তত ট্রেনিং-এর দায়িত্ব দেয়া যায়...।

জিয়াউর রহমানের কথা বললাম। কর্নেল ওসমানী জিজ্ঞাসা করলেন, Which Zia? Is that দালাইলামা? তাকে বললাম, কোনো দালাইলামা টালাইলামা কাউকে চিনিনা, মেজর জিয়াউর রহমান...। পরে জেনেছি যে মেজর জিয়ার (যিনি বর্তমানে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ও আণ্ডারগ্রাউণ্ডে ছিলেন) নাকের গড়নের জন্য ওসমানী তাকে দালাইলামা বলে ডাকতেন।]

আগরতলায় ৯১ বিএসএফ হেডকোয়ার্টারের ব্রিগেডিয়ার ভিসি পাণ্ডের সাথে কর্নেল ওসমানীর পরিচয় করিয়ে দেই একজন বেসামরিক লোক হিসেবে। কারণ তিনি আমাকে তাই বলেছিলেন যে তার যেন কর্নেল হিসেবে পরিচয় না দেই। ব্রিগেডিয়ার পাণ্ডে ইন্টেলিজেন্স-এর অফিসার ছিলেন। দিল্লী থেকে এসেছিলেন আগরতলায় তারা দুজনে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলেন। লম্বা আলাপের পর ব্রিগেডিয়ার পান্ডে বললেন, 'তুমি সেই ওসমানী না যে ১৯৪২ সালে আমার সাথে কোর্স করেছিল?' ওসমানী বুঝলেন লুকানোর আর কিছুই নেই।

যুদ্ধের সময় সবচেয়ে অসুবিধা ছিল যে আওয়ামী লীগের কেউই আর্মি সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানতেন না। ওসমানী যা বলতেন ভাবতেন তাই ঠিক। ওসমানী ছিলেন একমাত্র সামরিক বিষয়ক উপদেষ্টা। তিনি প্রবল ভালোলাগা এবং প্রবল ঘৃণার মানুষ।

আমি মুক্তিযুদ্ধে যাবার আগে মেজর ছিলাম। যেখানে মেজর শফিউল্লা ও মেজর জিয়া মেজর জেনারেল হয়ে গেলেন। বঙ্গবন্ধুর হস্তক্ষেপে আমি লে. কর্নেল পদে উন্নীত হলাম (এপ্রিল ১৯৭৫) এবং বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের খড়গ হস্তের শিকার হলাম [কারণ, যুদ্ধের সময় জিয়া আর শওকত উভয়েই চট্টগ্রামে থাকতে চাইতেন যেহেতু তাদের ট্রুপস চট্টগ্রামে ছিল এবং দুজনের মধ্যে বচসা হয়। কিন্তু ওসমানী একজনকেও চট্টগ্রামে রাখেননি। দুজনকেই সরিয়ে মেজর রফিককে ওখানে

রাখেন। তারপর শওকত কলকাতায় গিয়ে ওসমানীর রাগ ভাঙাতে সক্ষম হন। একাত্তরের অগাস্টের পর জিয়ার হাতে কোনো কাজ ছিল না। দেশ স্বাধীন হবার পর জিয়ারই চীফ অফ স্টাফ হবার কথা কারণ জিয়া শফিউল্লার কোর্স মেট হলেও সিনিয়র ছিলেন। জিয়া খুব মনমরা থাকতেন।

এককথায় যেহেতু আমি সামরিক বাহিনীর কমেণ্ডো ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিলাম সেহেতু আমি বন্দী অবস্থা থেকে পালাতে পেরেছিলাম এবং আল্লাহতালার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই এ কাজ করেছিলাম যার জন্য আমার সব অসুবিধা আল্লাহতালা সহজ করে দিয়েছিলেন।

কর্নেল ওসমানী যাবার পর আরও কিছু রাজনৈতিক নেতা (যেমন, প্রফেসর রেহমান সোবহান, সিরাজুল হক, আবদুল কুদ্দুস মাখন) আগরতলায় চলে গেলেন এবং একটা নিউক্লিয়াস গড়ে উঠল। মেহেরপুরে গভর্নমেন্ট ফর্ম আপ হবার আগেই 1st week of April-এ আগরতলার শালবনে ৯১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের ছত্রছায়ায় আমরা একটা হেডকোয়ার্টার (এসেলন বা সাপোর্টিং বা রিয়ার হেডকোয়ার্টার) তৈরি করে ফেললাম। হেডকোয়ার্টারের ইনচার্জ বানানো হলো কর্নেল রবকে। তাঁর সাথে ছিলেন মেজর আবুল ফাত্তাহ (উনি আগে মেডিকেল ইউনিটের administrative officer ছিলেন)। ৯১ বিএসএফ আমাদের সব fascility দেয়, রাজনীতিকগণ দিল্লি গিয়ে ভারত সরকারের সাথে বুঝাপড়া করে সাহয্যের আশ্বাস পেলেন।

এরপর আমি আমার কাজে লেগে গেলাম অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীর কম্যুনিকেশন ব্যবস্থা ঠিক করা। বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তের ৫টি সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে আগরতলা মুক্তিবাহিনী হেড কোয়ার্টার পর্যন্ত বেতার যোগাযোগ স্থাপন করা হল। এই যোগাযোগের জন্য আমাদের হাতে কোনো বেতার যন্ত্র ছিল না। আর্মি, নেভী ও এয়ারফোর্সের আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সীর বেতার যন্ত্র ছিল সেজন্য একটার সাথে অন্যটার যোগাযোগ সম্ভব ছিল না। অনুরূপভাবে পুলিশ, ইপিআর তাদের বেতার যন্ত্রেরও একই অবস্থা ছিল। যাক ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ নম্বর সেক্টর হেড কোয়ার্টার পর্যন্ত বেতার যোগাযোগ স্থাপন করে আমি কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে শিলং হয়ে ১১ নম্বর সেক্টর হেড কোয়ার্টার, তুরা (মেঘালয়) পৌঁছলাম ও সেখান থেকে জুলাই-এ মুজিনগরে (থিয়েটার রোড) গেলাম। সেখান থেকে ৬, ৭, ৮ ও ৯ নম্বর সেক্টর হেড কোয়ার্টার পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপনে ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

সিগনেল কোর বলতে যা বোঝায় '৭১ সালে তা ছিল না। সিগনেলম্যানদের কোনো সেপারেট এনটিটি ছিল না কারণ সবাই আর্মির লোক না তাই একক কমান্ডের আন্ডারে আনা যায়নি। ইপিআর, আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্স, পুলিশ—যারাই কমিউনিকেশনের ব্যাপারে অভিজ্ঞ, সেট use করতে পারতো we used to take them. আমি তাদের ইনস্ট্রাকশন দিতাম how to work and they worked. তারা যে সেক্টরে থাকতো লজিস্টিক সাপোর্ট ওখান থেকেই পেত। আমাদের ভাল ইক্যুইপমেন্ট, ম্যানপাওয়ার ও ট্রেইণ্ড লোক ছিল না। আমেরিকা থেকে বাঙালিরা কিছু ওয়াকী-টকী দিয়েছিল যার কোন importance ছিল না তাই ইনফেন্ট্রীদের দিয়ে দেওয়া হয়। তবে ইণ্ডিয়ানরা help করেছে প্রচুর।

আরেকটা ব্যাপার, '৭১ সালের ২৫শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৮-১০ জন বাঙালি অফিসার সিগনেল কোরে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে আমরা ৩জন যোগ দেই— আমি, ক্যাপ্টেন হালিম (বর্তমানে কর্নেল) ও ক্যাপ্টেন শহীদুল ইসলাম (বর্তমানে কর্নেল)।

১৩ই ডিসেম্বর আমি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে আসলাম আমার পরিবারের সদস্যদের ফিরে পেলাম। ১৩ই ডিসেম্বর রাতে কলকাতা থেকে আগরতলা আসি। ফ্লাইট লেফটেনেন্ট বদরুল আলম ওয়ান ইঞ্জিন অটার প্লেন চালাচ্ছিলেন। আমরা যখন নারায়ণগঞ্জের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম প্লেন লক্ষ করে নীচ থেকে ক্ষুদ্র অস্ত্রের গুলিকরা হচ্ছিল। আমাদের অবশ্য কোনো ক্ষতি হয়নি।

কুমিল্লা সেনানিবাসে মিলিটারি ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসের (MES) বাঙালি কর্মকতা ও কর্মচারীদের পাকিস্তানিরা হত্যা করেনি। হত্যা করলে পাকিস্তানিদের কাজের অনেক অসুবিধা হতো। MES লোকদের মাধ্যমে আমরা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরের খবরা খবর পেতাম ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান প্রদান করতাম। যেমন আমার wife হয়তো ওদের বাসার কোনো কিছু নষ্ট হয়ে গেছে জানতো। ওরা এলে ওদের হাতে চিঠি দিয়ে দিত। পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গেছে বুঝতে পেরে আমার স্ত্রী মিসেস গাফফার ও অন্যান্য জেসিওদের family ও বাচ্চাদের পুলিশের একটা গাড়িতে বসিয়ে কুমিল্লা টাউনে পাঠিয়ে দেয়।

১৬ই ডিসেম্বর কলকাতা ছিলাম। দেশ স্বাধীনের খবর শুনে তেমন কিছু অনুভূতি হয়নি, তবে তৃপ্তি ছিল।

১৯৭১ সালের ২২শে ডিসেম্বর প্লেনে ঢাকায় ফিরি (মরহুম ক্যাপ্টেন খালেক নিয়ে আসেন)। ঢাকায় এসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠনে আত্মনিয়োগ করলাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় চীফ সিগনেল অফিসার পদে ছিলাম। যুদ্ধের পর সিও আর্মি সিগনেল ব্যাটালিয়ন পদে যোগ দেই। কিন্তু তখন মেজর ইরফান আমার চেয়ে সিনিয়র অফিসার ছিলেন (৭১-এ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে EPCAF এর রিক্রুটিং অফিসার ছিলেন।) তাই তাকে জেনারেল ওসমানীর কাছে নিয়ে গিয়ে ওসমানী সঙ্গে introduced করিয়ে দেই। মেজর ইরফান সিগনেল কোরের দায়িত্ব নেন ও তার অধীনে চাকরি করতে থাকি। আমি ট্রুপসদের অর্গানাইজড করতে থাকি। তখন সবকিছুই বিধ্বস্ত। নতুন করে গড়ে তোলার চিন্তাই সবচেয়ে বড় ছিল।

আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে আমি মুক্তিবাহিনীর প্রধান সিগনেল অফিসার ছিলাম ও কর্নেল ওসমানীর সাথে আমার মিল ছিল না সেহেতু ওসমানী সাহেব আমার কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট খারাপ করে লিখেছিলেন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন আমার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন।

২৯শে মার্চ ১৯৭১ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের যেসব বাঙালি অফিসার ও সিপাহীদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তাদের কথা মনে হলে আল্লাহর কাছে এই কৃতজ্ঞতা জানাই যে তাঁর রহমতে আমি জীবিত আছি এবং স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করছি।

আমাদের সংগ্রাম চলবেই

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম একটা জাতির পবিত্রতম ও গৌরবময় অধ্যায়। আর সেই সাথে এর ইতিহাস সে জাতির ভবিষ্যতের প্রেরণা। আজকের প্রাণোচ্ছল কোনো যুবকের কাছে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘন কুয়াশায় ঢাকা সুদূর শৈশব বা কৈশোরের আবছা কোনো স্মৃতি ছাড়া কিছু নয়। যুদ্ধের প্রকৃত পটভূমিকা ও রূপ সম্পর্কে জানবার সুযোগ তার ন্যায্য অধিকার। মূলতঃ আমরাও এই গোত্রেরই অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশ্নাবলী আমাদের সারাক্ষণই তাড়া করে। সেই সব প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলো অন্তত কিছুটা হলেও লুপ্ত হবে সে জন্যই এই প্রয়াস। তাছাড়া পরবর্তী প্রজন্মকে কিছু একটা দেবার দায়িত্ব তো আছেই কেননা আমরাই বোধ হয় মুক্তিযুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করা সর্বশেষ প্রজন্ম। যদিও বিভিন্ন কিছু স্মৃতি ছাড়া আমাদেরও গর্ব করবার তেমন কিছু নেই।

পাকিস্তানি ও তার সাম্রাজ্যবাদী দোসরদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অগণিত প্রাণের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা নিজেদের স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছি। স্বাধীন দেশের জন্য অর্জন করেছি স্বীয় পতাকা। তবুও কি আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন? এত কিছুর পরেও বোধহয় আমরা মুক্ত হইনি। প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করেছি স্বাবলম্বী শোষণমুক্ত একটা সমাজের জন্য। এখনো আমাদের স্বাধীনতার প্রতি হুমকি আসে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল মহল। এখনো তাই প্রতিনিয়ত আমরা সংগ্রামের সেই দিনের অপেক্ষায় যেদিন 'স্বাধীনতা', 'মুক্তি' শব্দগুলি একান্ত আমাদের হবে। এই সংগ্রামের প্রতি আমরা সবাইতো দায়বদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের এই সব বীরদের সাথে একই কণ্ঠে আমরাও তাই অঙ্গীকার করি— 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই'।

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

আমাদের সংগ্রাম চলবেই— বইটির তথ্যাবলী সংগ্রহেয় কাজ শুরু হয় ১৯৮৫ সালের মধ্য এপ্রিলে। ১৯৮৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। সংগৃহীত ৩৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ২৬ জনকে নিয়ে আমাদের সংগ্রাম চলবেই-এর প্রথম খণ্ড প্রথম পর্ব গত ০৮ ফাল্গুন, ১৩৯৪, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ প্রকাশিত হয়।

উল্লেখিত সময়ে সংগৃহীত ১১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বে আরো ১৮ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা নতুন করে সংযোজিত হল। তবে বলা বাহুল্য, সংগ্রহ নিরবচ্ছিন্নভাবে চালোনো সম্ভব হয়নি। যেহেতু আমরা ছাত্র সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা, পরীক্ষা ইত্যাদি নানা কারণে কাজে ছেদ পরে।

আমরা প্রায় অর্ধ শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ ও মৃত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং প্রত্যেকেই আমাদের একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নমালা দেই। যথাসাধ্য চেষ্টা এবং বারবার তাগাদা দেবার পর তাদের মাত্র অর্ধেকেরও কম বিলম্বে হলেও আমাদের প্রশ্নমালার উত্তর দেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ডা. ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, বীর প্রতীক এর নাম। তিনি স্বতস্ফুর্তভাবে আমাদের সংঘের কার্যালয়ে এসে প্রশ্নমালার উত্তর দিয়ে যান এবং মেজর সৈয়দ মুনিবুর রহমান ও এ.কে. এম রফিকুল হক, বীর প্রতীক এরা দুজনই কোনোরকম তাগাদা ছাড়াই নির্দিষ্ট সময়ে প্রশ্নমালার উত্তর দিয়ে আমাদের কাজ অনেক সহজসাধ্য করেন।

প্রশ্ন নির্বাচনে আমরা চেষ্টা করেছি যেন তা কেবল যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে সামগ্রিকভাবে যুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যদিও তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলা প্রশ্নমালা দেয়া হয়েছিল তবুও কয়েকজনক ইংরেজি ও আংশিক ইংরেজিতে উত্তর দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে ইংরেজিতে দেয়া উত্তর ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে, তরজমা করা হয়নি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের সম্পাদকীয় কলম ও কাঁচির ব্যবহার যথাসম্ভব সংযত রাখার চেষ্টা করেছি যাতে তাদের ব্যক্তিত্ব অবিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়। এবার বিভিন্ন প্রশ্নগুলির প্রাপ্ত উত্তর সম্পর্কে কিছু লেখা প্রাসঙ্গিক মনে করি।

জন্মস্থান এবং জন্ম তারিখ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর জন্মস্থান হিসাবে কয়েকজন পুরোনো পদ্ধতিতে (গ্রাম, থানা-মহকুমা এবং জেলা) উত্তর দিয়েছেন যদিও বাকিরা দিয়েছেন উপজেলা পদ্ধতিতে।

মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব সময়ে রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কিত প্রশ্নটির উত্তর বেশ কয়েকজন দেননি বা 'না' বোধক উত্তর দিয়েছেন। তবে তাদের মধ্যে অনেকেই তৎকালীন প্রধান রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা সদস্য ছিলেন বলে মৌখিক বা লিখিতভাবে আমাদের জানিয়েছেন কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা না ছাপানোর জন্য অনুরোধ করেছেন। আমরা তাদের অনুরোধ রক্ষা করেছি।

'মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত পরিবারের অন্যান্য সদস্য'— এই প্রশ্নের ক্ষেত্রেও কেউ কেউ একইভাবে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

আমরা প্রত্যেককেই অনুরোধ করেছিলাম মুক্তিযুদ্ধে যোগাদানের কারণ ও উল্লেখযোগ্য সব অপারেশনেরই বিস্তারিত বিবরণ দিতে। কয়েকজন আমাদের অনুরোধ রক্ষা করেছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ।

লিখিত ও মৌখিকভাবে অনেকেই রাজাকার (পাকিস্তানপন্থী)-দের বিরুদ্ধে তাদের বিভিন্ন অপারেশন-এর বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তার জন্য তা প্রকাশ না করতে অনুরোধ করেছেন। এছাড়া যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ ছিল যুদ্ধে আহত হবার পর হতে বর্তমান পর্যন্ত তাদের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা বিশেষ করে চিকিৎসার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করার জন্য।

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, শহীদ ও মৃত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যরা যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্যাবলী সরবরাহ করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন, ফলে সঙ্গত কারণেই শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য পর্যাপ্ত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

মুদ্রিত সব বক্তব্যই অক্ষরে অক্ষরে সত্যি এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিগত আক্রোশ, স্বচ্ছ রাজনৈতিক ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টির অভাব ইত্যাদি যে কোনো ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করতে পারে। তবুও মুদ্রিত প্রত্যেকটি বক্তব্যই প্রণিধানযোগ্য। ভবিষ্যত গবেষকের সুক্ষ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই কেবলমাত্র প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হতে পারে।

বইটির সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা অনেকের সাহায্য ও বিপুল উৎসাহ অনুপ্রেরণা পেয়েছি। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা, পরিমার্জন এবং সংশোধনের কাজে কবি শামসুর রাহমানের আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ আমাদেরকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও মরহুম শিল্পাচার্য কামরুল হাসান বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন এবং প্রচ্ছদও এঁকেছিলেন। শিল্পাচার্যের এই স্বতঃস্ফুর্ত সহযোগিতা বইটির মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে।

বইটির প্রথম খণ্ড— প্রথম পর্ব মুদ্রণ এবং প্রকাশের ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার শরণাপন্ন হই। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থার স্বত্বাধিকারীর উত্তর ছিল 'এই সব ইতিহাস টিতিহাসের বই তো কেউ পড়ে না...।' অন্য প্রকাশকেরাও বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাননি। তাই একরকম বাধ্য হয়েই

আমরা প্রকাশনার গুরু দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম। অবশেষে প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় পর্বের প্রকাশনার জন্য জুয়েল ইন্টারনেশনাল লাইব্রেরী, ঢাকা আগ্রহ সহকারে এগিয়ে আসেন। এজন্য আমরা তাদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমাদের সীমিত সামর্থে সংগৃহিত কেবলমাত্র ২৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে *আমাদের সংগ্রাম চলবেই*-এর প্রথম খণ্ড— দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হচ্ছে। এই সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়েই পরবর্তী খণ্ডসমূহ প্রকাশের প্রতিশ্রুতি রইল।

গণঅভ্যুত্থান দিবস
মাঘ ১১, ১৩৯৫
জানুয়ারি ২৪, ১৯৮৯
ঢাকা

—সম্পাদকদ্বয়